মির্জা গালিব:

আরক্ত জবানের যাদুকর

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী



মির্জা গালিব: আরক্ত জবানের যাদুকর

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

এডকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাব

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা **মাওলানা সৈয়দ মহব্বত আলী আমিরী**

কপিরাইট নোটিশ

অনুমতির জন্য যোগাযোগ

এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, অনুলিপি বা ব্যবহার করতে চাইলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
amiri@drmc.edu.bd

ন্যায্য ব্যবহারের নোটিশ (Fair Use Notice)

প্রস্তাবনা

প্রিয় পাঠক,

এই বইটি লেখার বীজ বোনা হয়েছিল অনেক বছর আগে, এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়, পুরোনো দিল্লির বল্লিমারানের গলিতে দাঁড়িয়ে। আমি তখন সবে গালিবের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি কয়েকটি শের পড়েছি, কয়েকটি গজল শুনেছি জগজিৎ সিং-এর কণ্ঠে। কিন্তু গালিব তখনো আমার কাছে ছিলেন এক দূরবর্তী প্রতিমা, এক কিংবদন্তি কবি, যাঁর জটিল ভাষা ও দুর্বোধ্য দর্শন আমাকে একই সঙ্গে আকর্ষণ করত ও ভীত করত। সেদিন বল্লিমারানের সেই সরু গলিতে দাঁড়িয়ে, গালিবের হাভেলির সামনে, আমি হঠাৎ অনুভব করলাম গালিব কোনো দূরবর্তী প্রতিমা নন, তিনি এক রক্তমাংসের মানুষ, যিনি এই গলিতে হেঁটেছেন, এই বাড়িতে বসে চিঠি লিখেছেন, এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখেছেন। সেই অনুভূতি থেকেই জন্ম নিয়েছিল এক অদম্য কৌতূহল কী করে এই মানুষটি, যাঁর জীবন ছিল দারিদ্র্য, শোক ও বঞ্চনায় ভরা, এমন কাব্য রচনা করলেন যা আজ দেড়শো বছর পরেও আমাদের ভাবায়, আনন্দ দেয়, আর বাঁচতে শেখায়?

এই বইটি সেই কৌতূহলেরই ফসল। এটি এক জীবনের সাধনার ফল, এক দীর্ঘ যাত্রার সঙ্গী। আমি যখন গালিবকে নিয়ে পড়তে শুরু করি, তখন দেখলাম, গালিব সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যা লেখা হয়েছে, তার সিংহভাগই হয় সংক্ষিপ্ত জীবনী, নয় কয়েকটি জনপ্রিয় গজলের অনুবাদ। গালিবের সমগ্র জীবন, সম্পূর্ণ কাব্য, গভীর দর্শন, এবং তাঁর উত্তরাধিকারের বিস্তারিত ইতিহাস একসঙ্গে এক মলাটে পাওয়া যায় না। অথচ গালিব তা দাবি করেন। তিনি কেবল একজন কবি নন, বরং এক সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি, এক দার্শনিক, এক বিপ্লবী, এবং এক আশ্চর্য আধুনিক মানুষ। এই সবগুলো গালিবকে একসঙ্গে ধরার জন্যই এই বইয়ের পরিকল্পনা।

আমি জানি, এক লক্ষ শব্দের একটি বই তাও একজন কবিকে নিয়ে পাঠকের কাছে প্রাথমিকভাবে দুরূহ মনে হতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, গালিবের জীবন ও কাব্য এতটাই বহুমাত্রিক, এতটাই রহস্যময় এবং এতটাই মানবিক যে, তা নিয়ে যত লেখা হয়, কম হয়। বরং, গালিবকে সংক্ষেপে বলা মানে তাঁর সঙ্গে অবিচার করা। তাই আমি স্থির করলাম, এই বই হবে এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যেখানে গালিবের জীবন, কাব্য, দর্শন, এবং উত্তরাধিকার চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা হবে। বইটি সাতটি পর্বে বিভক্ত, প্রতিটি পর্বে একাধিক অধ্যায়, এবং প্রতিটি অধ্যায়ে আছে গভীর অনুসন্ধান। পাঠক যদি ধৈর্য নিয়ে পুরো বইটি পড়েন, তাহলে তিনি গালিবকে আর দূরের কোনো কবি বলে মনে করবেন না; বরং গালিব হয়ে উঠবেন তাঁর একান্ত আপন একজন বন্ধু, একজন দার্শনিক সঙ্গী, এবং জীবনের নানা প্রশ্নের এক নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী।

এই বই লেখার সময় আমি কয়েকটি নীতি অনুসরণ করেছি। প্রথমত, তথ্যগত নিখুঁততা। গালিবের জীবন ও কাব্য নিয়ে এত কিংবদন্তি, এত জনশ্রুতি, এত ভুল তথ্য প্রচলিত আছে যে, সত্যকে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আমি চেষ্টা করেছি, প্রতিটি তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের দ্বারস্থ হতে। আলতাফ হোসেন হালীর "ইয়াদগার-এ-গালিব", ড. গোপী চাঁদ নারঙ-এর "উর্দু গজল আওর গালিব", রালফ রাসেলের "Ghalib: Life and Letters", খলিলুর রহমান আজমির "গালিব: শাখসিয়াত আওর ফন" এসব প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল আমার প্রধান অবলম্বন। যেখানে তথ্যগত বিতর্ক আছে, সেখানে আমি বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি তুলে ধরেছি এবং নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছি।

দ্বিতীয়ত, গালিবের কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দেওয়া। গালিব নিজে তাঁর চিঠিপত্র ও কাব্যে নিজের সম্পর্কে, নিজের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে এত কিছু বলে গেছেন যে, গবেষকের ব্যাখ্যার চেয়ে গালিবের নিজের কথা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি অধ্যায়ে, যেখানেই সম্ভব, আমি গালিবের চিঠি বা শের থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি। পাঠক যেন গালিবকে সরাসরি শুনতে পান তাঁর নিজের ভাষায়, নিজের সুরে।

তৃতীয়ত, অনুবাদের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা। গালিবের কবিতা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় সম্পূর্ণ রূপান্তর করা অসম্ভব এটা আমি জানি। বিশেষ করে গালিবের জটিল ইহাম (দ্ব্যর্থবোধকতা), ফার্সি-মিশ্রিত শব্দভাণ্ডার এবং সূক্ষ্ম ছন্দকে বাংলায় ধরা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি, প্রতিটি শেরের মূল উর্দু ও বাংলা হরফে উচ্চারণ দেওয়ার পাশাপাশি এমন ভাবানুবাদ দিতে, যা বাংলা পাঠকের কাছে অর্থবহ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক অনুবাদ দিয়েছি, যাতে মূলের ভিন্ন স্তরগুলি ফুটে ওঠে।

এই বইটি কাদের জন্য? আমি বলব, এ বই তাদের জন্য, যারা গালিবকে জানতে চান সম্পূর্ণভাবে, গভীরভাবে। যারা কেবল কয়েকটি জনপ্রিয় শেরে সন্তুষ্ট নন, বরং গালিবের জীবন, সমাজ, দর্শন ও শিল্পের গভীরে প্রবেশ করতে চান। যারা বুঝতে চান, কেন গালিব আজও প্রাসঙ্গিক, কেন তাঁর কবিতা আজও নতুন প্রজন্মকে ভাবায়, এবং কেন তিনি ক্রমশ এক বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

আমি আরও বলব, এ বই তাদের জন্য, যারা জীবনের গভীর প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন প্রেম কী, দুঃখ কেন আসে, মৃত্যু কী, খুদা কোথায়, সময় কীভাবে বয়ে যায়। গালিব এই সব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেন না, বরং প্রশ্নগুলিকে আরও গভীর করে তোলেন। আর এই গভীরতাই হল প্রকৃত উত্তর। গালিবের কাছে যাওয়া মানে জীবনের জটিলতাকে সরল করার চেষ্টা নয়, বরং জটিলতাকে মেনে নেওয়ার শিল্প শেখা।

এই দীর্ঘ যাত্রায় অনেকের কাছে আমি ঋণী। প্রথমেই স্মরণ করি আলতাফ হোসেন হালীকে, যাঁর "ইয়াদগার-এ-গালিব" না থাকলে গালিবের জীবন সম্পর্কে আমরা আজ যা জানি, তার সিংহভাগই অজানা থেকে যেত। কৃতজ্ঞতা জানাই ড. গোপী চাঁদ নারঙ-এর প্রতি, যাঁর "উর্দু গজল আওর গালিব" গ্রন্থটি আমাকে গালিবের কাব্যের গভীরতর স্তরগুলি বুঝতে শিখিয়েছে। রালফ রাসেলের প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য তাঁর ইংরেজি অনুবাদ ও বিশ্লেষণ ছাড়া এই বইয়ের অনেক অধ্যায় লেখা সম্ভব হতো না। খলিলুর রহমান আজমি, আবদুর রহমান বিজনৌরী, সৈয়দ আবদুল্লাহ এঁদের প্রত্যেকের কাজ থেকেই আমি উপকৃত হয়েছি।

বাংলা ভাষায় গালিব-চর্চার পথিকৃৎ কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখের প্রতিও আমার গভীর শ্রদ্ধা। এঁদের অনুবাদ ও বিশ্লেষণ আমাকে দেখিয়েছে, গালিব বাংলা ভাষাতেও কতটা জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে শঙ্খ ঘোষের গালিব-অনুবাদ আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে এবং অনুবাদের কঠিন কাজে প্রেরণা দিয়েছে।

যেসব বন্ধু ও সহকর্মী পাণ্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন, যেসব গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ থেকে দুর্লভ বই ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছি, যেসব গালিব-অনুরাগী পাঠক বিভিন্ন সময়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা ও মন্তব্য দিয়ে আমাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এবং সবশেষে, আমার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা যাঁরা এই দীর্ঘ সময় ধরে আমার সঙ্গে ছিলেন, বইয়ের নিমগ্নতায় আমার অনুপস্থিতি সহ্য করেছেন, এবং সবসময় উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

প্রিয় পাঠক, এই বইটি হাতে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এটি কেবল একটি বই নয়, বরং এক জীবন ও এক কাব্যের প্রতি আমার ভালোবাসার নিবেদন। আমি আশা করি, এই বই পড়তে পড়তে আপনি গালিবের জগতে প্রবেশ করবেন এমন এক জগতে, যেখানে দুঃখ ও আনন্দ, প্রেম ও বেদনা, বিশ্বাস ও সংশয়, জীবন ও মৃত্যু একই সঙ্গে বিরাজ করে। যে জগতে "হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে", আর যে জগতে "বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে" এই দুই সত্যই সমান সত্য। যে জগতে আপনি নিজেকেও খুঁজে পেতে পারেন নিজের দুঃখকে, নিজের আনন্দকে, নিজের প্রশ্নকে।

গালিবের একটি শের দিয়ে এই প্রস্তাবনা শেষ করি, যে শেরটি এ বইয়েরও মূলমন্ত্র বলা যায়:

ہم سخن فہم ہیں، غالبؔ کے طرفدار نہیں
دیکھیے، کہہ دوں گا کیا، اس کی طرح دار نہیں

হম সুখন-ফহম হ্যায়, 'গালিব' কে তরফদার নহীঁ
দেখিয়ে, কহ দুঁগা ক্যা, উস কী তরহ দার নহীঁ

(আমরা কবিতা বুঝি, গালিবের পক্ষপাতী নই। দেখি, কী বলতে পারি তার মতো বাকপটু তো নই।)

আমিও গালিবের পক্ষপাতী নই বা অন্তত হতে চাইনি। আমি চেয়েছি, গালিবকে বুঝতে, এবং যা বুঝেছি, তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। কতটা পেরেছি, তা বিচারের ভার আপনার ওপর। যদি এই বই পড়ে আপনি গালিবের একটি শেরও নতুন করে বোঝেন, গালিবের জীবনের একটি ঘটনাও নতুন করে জানেন, অথবা গালিবের দর্শনের একটি দিকও আপনার নিজের জীবনে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন তাহলে আমার এই শ্রম সার্থক হবে।

শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিয়ে,

লেখক

সূচীপত্র

ভূমিকা

পৃথিবীর সব মহৎ কবিই কোনো না কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। কেউ খোঁজেন প্রেমের সংজ্ঞা, কেউ সৌন্দর্যের রহস্য, কেউ ঈশ্বরের স্বরূপ, কেউ মৃত্যুর অর্থ। কিন্তু গালিব সেই বিরল কবি, যিনি একই সঙ্গে সব প্রশ্নই করেছেন এবং একটি প্রশ্নেরও চূড়ান্ত উত্তর দেননি। বরং, তিনি প্রশ্নগুলিকে আরও গভীর, আরও জটিল, আরও বিস্ময়কর করে তুলেছেন। গালিবের কাব্য কোনো উত্তর নয়, বরং এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। আর এই জিজ্ঞাসাই তাঁকে দিয়েছে কালজয়ী প্রাসঙ্গিকতা। যে পাঠক আজ থেকে দেড়শো বছর আগের দিল্লির এক কবির শের পড়েন, তিনি যেন নিজের মনের কথাই পড়ছেন এটাই গালিবের জাদু, এটাই তাঁর মহত্ত্ব।

কিন্তু এই জাদু বুঝতে গেলে, এই মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে গেলে গালিবকে জানতে হয় সম্পূর্ণভাবে। কেবল কয়েকটি জনপ্রিয় শের নয়, কেবল একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী নয় বরং তাঁর সমগ্র জীবন, সম্পূর্ণ কাব্য, গভীর দর্শন ও বিস্তৃত উত্তরাধিকারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এই বইটি সেই সম্পূর্ণতারই প্রয়াস।

কেন এই বই

গালিবকে নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে অনেক কিন্তু অধিকাংশই হয় সংক্ষিপ্ত জীবনী, নয় নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ, নয় কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে গালিবের কাব্যের সমালোচনা। একই মলাটে গালিবের জীবন, কাব্য, দর্শন ও উত্তরাধিকার এই চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আজও বিরল। অথচ গালিব এই পূর্ণাঙ্গতাই দাবি করেন। কারণ গালিবের জীবন ও কাব্য এতটাই নিবিড়ভাবে জড়িত যে, একটিকে ছাড়া আরেকটিকে বোঝা যায় না। যে মানুষটি সাতটি সন্তানের মুখাগ্নি করেছেন, সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছেন, দিল্লির ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেছেন সেই মানুষটির কাব্যে যে গভীর নৈরাশ্য, যে দার্শনিক নিয়তিবাদ, যে তীব্র জীবনাসক্তি, তা কি কেবল শব্দের খেলা? নাকি তা এক রক্তাক্ত হৃদয়ের সত্যিকার আর্তনাদ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে জীবন ও কাব্যকে একসঙ্গে দেখতে হবে। জীবনকে জানতে হবে কাব্যের জন্য, কাব্যকে বুঝতে হবে জীবনের নিরিখে।

এই বইটি সেই যুগপৎ দৃষ্টিরই ফসল। এখানে গালিবের জীবনী যেমন আছে, তেমনই আছে তাঁর কাব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। আছে তাঁর দর্শনের স্বরূপ সন্ধান, আছে তাঁর উত্তরাধিকারের ইতিহাস। সব মিলিয়ে, এই বই গালিবকে জানার এক সম্পূর্ণ পথরেখা।

বইয়ের পরিকল্পনা ও কাঠামো

বইটি সাতটি প্রধান পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি পর্বের অন্তর্গত একাধিক অধ্যায়, এবং প্রতিটি অধ্যায় গালিব-চর্চার একটি স্বতন্ত্র দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। পর্বগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পাঠক ধীরে ধীরে গালিবের জগতে প্রবেশ করতে পারেন প্রথমে প্রেক্ষাপট, তারপর জীবন, তারপর কাব্য, তারপর দর্শন, তারপর উত্তরাধিকার, এবং শেষে প্রয়োজনীয় রসদ।

পর্ব ১: সময় ও প্রেক্ষাপট বইয়ের ভিত্তি রচনা করে। গালিবকে বোঝার জন্য প্রথমেই বোঝা দরকার, তিনি কোন সময়ে, কোন সমাজে, কোন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করতেন। এই পর্বে আমরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান, দিল্লি ও লখনউয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মুশায়রার সংস্কৃতি এবং গালিবের পূর্বসূরি কবিদের উত্তরাধিকার বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। এই পর্বটি পড়ার পর পাঠক বুঝতে পারবেন, কোন মাটিতে দাঁড়িয়ে গালিবের প্রতিভা অঙ্কুরিত হয়েছিল।

পর্ব ২: জীবনালেখ্য বইয়ের মূল চালিকাশক্তি। এখানে গালিবের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনের আখ্যান রয়েছে তাঁর বংশগৌরব ও দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব, শৈশবের পিতৃহীনতা, কৈশোরের স্বশিক্ষিত প্রতিভার বিকাশ, দাম্পত্য জীবনের দূরত্ব, সাত সন্তানের মৃত্যুজনিত শোক, অর্থকষ্ট ও পেনশনের লড়াই, বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারে উত্থান-পতন, কলকাতা সফরের অভিজ্ঞতা, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও দিল্লির ধ্বংস, এবং শেষ জীবনের নিঃসঙ্গতা। এই জীবন কেবল ঘটনার সমষ্টি নয়, বরং এক মহাকাব্যিক ট্র্যাজেডি যেখানে প্রতিটি আঘাত গালিবের কাব্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

পর্ব ৩: সাহিত্য ও শিল্পীসত্তা বইয়ের সবচেয়ে ভারী ও মননশীল অংশ। এখানে আমরা গালিবের ফার্সি কাব্য, উর্দু গজলে তাঁর বিপ্লব, গদ্যশিল্পী হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব, কাব্যভাষা-অলংকার-প্রতীকের স্বরূপ, এবং পাঁচটি সম্পূর্ণ গজল ও পনেরোটি নির্বাচিত শেরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। এই পর্বে পাঠক জানতে পারবেন, কেন গালিব নিজের ফার্সি কাব্যকে উর্দুর চেয়ে বড় মনে করতেন; কীভাবে তিনি 'ইহামগোই', 'তাজাহগোই' ও 'মাজমুন আফিরিনি'-র মাধ্যমে উর্দু গজলকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন; কীভাবে তাঁর চিঠিগুলি উর্দু গদ্যের ভিত্তি রচনা করেছিল; এবং কীভাবে সনাতন প্রতীকগুলি তাঁর হাতে নতুন অর্থ লাভ করেছিল।

পর্ব ৪: দর্শন ও বিশ্বদৃষ্টি গালিবের কাব্যের গভীরতম স্তরে প্রবেশ করে। গালিব কেবল কবি ছিলেন না, ছিলেন এক জীবনদার্শনিক। এই পর্বে আমরা আলোচনা করেছি গালিবের খুদা-ভাবনা, প্রেম-নারী-সৌন্দর্যতত্ত্ব, দুঃখবোধ ও জীবনানন্দ, এবং সময়-মৃত্যু-আধুনিকতা প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা। এই পর্বটি পড়ার পর পাঠক উপলব্ধি করবেন, গালিব একই সঙ্গে সুফি ও সংশয়বাদী, আস্তিক ও নাস্তিকের সীমানায় দাঁড়ানো, নৈরাশ্যবাদী ও প্রাণবাদী, প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক। এই দ্বান্দ্বিকতাই তাঁর দর্শনের মূল শক্তি।

পর্ব ৫: উত্তরাধিকার ও পুনর্নির্মাণ গালিবের মৃত্যুর পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে গঠিত। গালিব মৃত্যুর পর যতটা জীবন্ত হয়েছেন, জীবদ্দশায় ততটা ছিলেন না। এই পর্বে আমরা দেখিয়েছি, কীভাবে আলতাফ হোসেন হালীর জীবনী থেকে শুরু করে ড. গোপী চাঁদ নারঙ-এর গভীর বিশ্লেষণ পর্যন্ত গালিব-গবেষণা ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে। কীভাবে বেগম আখতার, মেহেদী হাসান, জগজিৎ সিং-এর কণ্ঠে গালিবের কবিতা সংগীতে রূপ নিয়েছে। কীভাবে সোহরাব মোদীর চলচ্চিত্র থেকে গুলজারের টেলিভিশন সিরিয়াল পর্যন্ত গালিব দৃশ্যমাধ্যমে স্থান পেয়েছেন। এবং কীভাবে কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কবিরা গালিবকে গ্রহণ করেছেন, অনুবাদ করেছেন, আত্মস্থ করেছেন। এই পর্বে আরও দেখানো হয়েছে, কীভাবে ইউনেস্কোর ১৯৬৯ সালের গালিব শতবর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে গালিব আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

পর্ব ৬: প্রাসঙ্গিক রসদ বইটির একটি বিশেষ অংশ। এখানে আমরা গালিবের নিজস্ব বয়ান (তাঁর চিঠি ও শের থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়ে আত্ম-পরিচয়), সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে গালিব (জওকের ব্যঙ্গ থেকে বাহাদুর শাহ জাফরের প্রশংসা পর্যন্ত), এবং একটি বিস্তারিত কালপঞ্জি ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা সংযোজন করেছি। এই পর্বটি বইটিকে একই সঙ্গে একটি আত্মজৈবনিক দলিল ও একটি রেফারেন্স গ্রন্থের মর্যাদা দেয়।

পর্ব ৭: পরিশিষ্ট বইয়ের শেষ অংশ। এখানে গালিবের কাব্যে বহুল ব্যবহৃত ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকের অর্থ ও ব্যাখ্যা সংবলিত একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান এবং বইয়ে ব্যবহৃত ২৫টি গজলের মূল উর্দু, বাংলা হরফে উচ্চারণ ও ভাবানুবাদ দেওয়া হয়েছে। এই পরিশিষ্টগুলি গালিব-পাঠের সহায়ক এক মূল্যবান রসদ হিসেবে কাজ করবে।

বইয়ের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

এই বই লেখার সময় আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছি, যা আগেই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, **তথ্যগত নিখুঁততা ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের ব্যবহার**। গালিবের জীবন ও কাব্য নিয়ে এত কিংবদন্তি, এত জনশ্রুতি, এত ভুল তথ্য প্রচলিত আছে যে, সত্যকে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আমরা চেষ্টা করেছি, প্রতিটি তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের দ্বারস্থ হতে। আলতাফ হোসেন হালীর "ইয়াদগার-এ-গালিব" (১৮৯৭), আবদুর রহমান বিজনৌরীর "মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব" (১৯২১), ড. গোপী চাঁদ নারঙ-এর "উর্দু গজল আওর গালিব" (১৯৮৫), রালফ রাসেলের "Ghalib: Life and Letters" (১৯৬৯), খলিলুর রহমান আজমির "গালিব: শাখসিয়াত আওর ফন" (১৯৬৯), ফারহাতুল্লাহ বেগের "দিল্লি কী আখেরি শামা" (১৯০৬) এসব প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল আমাদের প্রধান অবলম্বন। যেখানে তথ্যগত বিতর্ক আছে, সেখানে আমরা বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি তুলে ধরেছি এবং নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ে ইন-টেক্সট সাইটেশন ব্যবহার করেছি, যাতে পাঠক চাইলে মূল সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, **গালিবের কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য**। গালিব নিজে তাঁর চিঠিপত্র ও কাব্যে নিজের সম্পর্কে, নিজের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে এত কিছু বলে গেছেন যে, গবেষকের ব্যাখ্যার চেয়ে গালিবের নিজের কথা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি অধ্যায়ে, যেখানেই সম্ভব, আমরা গালিবের চিঠি বা শের থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি। পর্ব ৬-এ তো সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়ই (অধ্যায় ২২) গালিবের নিজস্ব বয়ানের ওপর ভিত্তি করে রচিত। পাঠক যেন গালিবকে সরাসরি শুনতে পান তাঁর নিজের ভাষায়, নিজের সুরে।

তৃতীয়ত, **জীবন ও কাব্যের আন্তঃসম্পর্কের ওপর জোর**। আমরা বিশ্বাস করি, গালিবের জীবন ও কাব্য এতটাই নিবিড়ভাবে জড়িত যে, একটিকে ছাড়া আরেকটিকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। তাই আমরা জীবনালেখ্য পর্বে (পর্ব ২) কেবল ঘটনার বিবরণ দিইনি, বরং প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে গালিবের কাব্যের সম্পর্কও ইঙ্গিত করেছি। একইভাবে, সাহিত্য ও শিল্পীসত্তা পর্বে (পর্ব ৩) কাব্যের বিশ্লেষণের সময় পেছনে জীবনের কোন অভিজ্ঞতা কাজ করছে, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

চতুর্থত, **বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ**। গালিবের কাব্য কেবল সাহিত্যিক বিশ্লেষণের বিষয় নয় তা একই সঙ্গে দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরও দাবি রাখে। তাই আমরা চেষ্টা করেছি, প্রতিটি বিষয়কে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে। বিশেষ করে পর্ব ৪ (দর্শন ও বিশ্বদৃষ্টি)-তে আমরা গালিবের চিন্তাকে সুফিবাদ, অস্তিত্ববাদ, সংশয়বাদ ও আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছি।

পঞ্চমত, **অনুবাদের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও স্বচ্ছতা**। গালিবের কবিতা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় সম্পূর্ণ রূপান্তর করা অসম্ভব এটা আমরা জানি। বিশেষ করে গালিবের জটিল ইহাম (দ্ব্যর্থবোধকতা), ফার্সি-মিশ্রিত শব্দভাণ্ডার এবং সূক্ষ্ম ছন্দকে বাংলায় ধরা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি, প্রতিটি শেরের মূল উর্দু নাস্তালিক হরফ, বাংলা হরফে উচ্চারণ, এবং ভাবানুবাদ দিতে। ভাবানুবাদে আমরা আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে মূলের ভাব, সুর ও আবেগকে ধরতে চেয়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক অনুবাদ দিয়েছি, যাতে মূলের ভিন্ন স্তরগুলি ফুটে ওঠে।

গালিব: কেবল কবি নন, এক সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি

এই বইয়ের একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল, গালিব কেবল একজন কবি ছিলেন না তিনি ছিলেন এক সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি, এক ক্রান্তিকালের সাক্ষী, এবং এক বিস্ময়কর আধুনিক মানুষ। তিনি জন্মেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের গোধূলিবেলায়, বেঁচেছিলেন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের উষালগ্নে, এবং মারা গিয়েছিলেন দিল্লির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। এই তিনটি পর্বই তিনি নিজের চোখে দেখেছেন এবং নিজের কাব্যে ধারণ করেছেন।

গালিবের কাব্যে আমরা একই সঙ্গে পাই মুঘল ফার্সি কাব্যের শেষ মহৎ অধ্যায় এবং আধুনিক উর্দু গদ্য-পদ্যের প্রথম সাড়া জাগানো সৃষ্টি। পাই সুফি দর্শনের গভীর প্রভাব এবং একই সঙ্গে এক সংশয়বাদী আধুনিক মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। পাই সম্রাটের রাজকবির অভিজাত্য এবং পেনশনের জন্য ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে আবেদনকারী এক গরিব মানুষের করুণ কাহিনি। পাই প্রেমের গভীরতা এবং দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতা। পাই জীবনাসক্তির তীব্রতা এবং মৃত্যুচেতনার প্রশান্তি। এই সব বৈপরীত্য মিলেই গালিব একই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক, আভিজাত ও গরিব, সুফি ও সংশয়বাদী, প্রেমিক ও দার্শনিক।

এই বইয়ের শিরোনাম আমরা রেখেছি "গালিব: আয়নায় মুখ দেখার খেলা"। এটি গালিবেরই একটি বিখ্যাত শের থেকে নেওয়া: "হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন"। গালিব নিজেকে 'আয়না-এ-খুদ-বীন' বা আত্মদর্শনের আয়না বলেছিলেন। এই আয়নায় তিনি নিজেকে দেখেছেন, নিজেকে জেনেছেন, এবং সেই আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়েই জগৎকে বুঝেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, এই বইও একটি আয়না যে আয়নায় পাঠক গালিবকে দেখতে পাবেন, এবং হয়তো, গালিবের মধ্য দিয়ে নিজেকেও খুঁজে পাবেন।

পাঠকের জন্য পথনির্দেশ

এই বইটি এক লক্ষ শব্দের একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এর আয়তন দেখে পাঠক যদি প্রথমে কিছুটা দ্বিধা বোধ করেন, তা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত করতে চাই, বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পাঠক চাইলে ধীরে ধীরে, পর্বে পর্বে, অধ্যায়ে অধ্যায়ে পড়তে পারেন। প্রতিটি অধ্যায়ই অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠক যদি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী হন, তাহলে সরাসরি সেই অধ্যায়টি পড়েও উপকৃত হতে পারেন। তবে আমরা সুপারিশ করব, গালিবের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পেতে পাঠক যেন পুরো বইটি ধৈর্য নিয়ে পড়েন। কারণ প্রতিটি পর্বই একে অপরের পরিপূরক, এবং একসঙ্গে পড়লে গালিবের যে পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে, তা খণ্ডিত পাঠে সম্ভব নয়।

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আমরা "নির্বাচিত শের" নামে কয়েকটি শের জুড়ে দিয়েছি, যা মূল উর্দু, বাংলা হরফে উচ্চারণ ও ভাবানুবাদ সংবলিত। এই শেরগুলি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পাঠকের জন্য এক ধরনের কাব্যিক সারসংক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া, প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে "ব্যক্তিগত অনুশীলন" নামে একটি অংশ আছে, যেখানে আমরা পাঠককে কয়েকটি ভাবনার খোরাক দিয়েছি যাতে তিনি গালিবের জীবন ও কাব্যকে নিজের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে ভাবতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই লেখার পেছনে অনেকের অবদান আছে, যাঁদের কথা প্রস্তাবনায় বিস্তারিত বলেছি। এখানে সংক্ষেপে স্মরণ করছি আলতাফ হোসেন হালী, ড. গোপী চাঁদ নারঙ, রালফ রাসেল, খলিলুর রহমান আজমি, আবদুর রহমান বিজনৌরী, ফারহাতুল্লাহ বেগ, সৈয়দ আবদুল্লাহ প্রমুখ গবেষককে, যাঁদের শ্রম ছাড়া এই বই অসম্ভব ছিল। বাংলা ভাষায় গালিব-চর্চার পথিকৃৎ কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখের প্রতিও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল। যেসব গ্রন্থাগার, আর্কাইভ, বন্ধু, সহকর্মী ও পাঠক বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

শেষ কথা

গালিবের একটি বিখ্যাত শের আছে:

ہزاروں □واہشیں ایسی کہ ہر □واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

এই বই লেখার আকাঙ্ক্ষাও ছিল এমনই এক 'খ্বাহিশ', যার পূরণের জন্য অনেক প্রাণ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু 'বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে' বইটি শেষ করেও মনে হচ্ছে, গালিবকে নিয়ে আরও কত কিছু বলার রয়ে গেল। কিন্তু এ-ই তো গালিবের জাদু তাঁকে নিয়ে কখনো শেষ করা যায় না। প্রতিটি অধ্যায় শেষে মনে হয়, আরও একটি অধ্যায় বাকি; প্রতিটি শের বিশ্লেষণের পর মনে হয়, আরও একটি অর্থ লুকিয়ে আছে। এই অফুরন্ততাই গালিবের কাব্যের প্রাণ, এবং এই অফুরন্ততাই গালিব-চর্চার আনন্দ।

পাঠক, এই বইটি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি এই আশায় যে, এটি আপনার গালিব-চর্চার এক বিশ্বস্ত সহচর হবে। আপনি যদি এই বই পড়ার পর গালিবের একটি শেরও নতুন করে বোঝেন, গালিবের জীবনের একটি ঘটনাও নতুন করে জানেন, অথবা গালিবের দর্শনের একটি দিকও আপনার নিজের জীবনে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন তাহলে আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে।

গালিব যেমন বলেছিলেন, "হম সুখন-ফহম হ্যায়, গালিব কে তরফদার নহীঁ" আমরা কবিতা বুঝি, গালিবের পক্ষপাতী নই। আমরাও গালিবের পক্ষপাতী হতে চাইনি। আমরা চেয়েছি, গালিবকে বুঝতে, এবং যা বুঝেছি, তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। কতটা পেরেছি, তার বিচার আপনার হাতে।

শুভ হোক গালিব-পাঠের এই যাত্রা।

পর্ব ১: সময় ও প্রেক্ষাপট

ইতিহাস কখনোই শূন্যে জন্ম নেয় না। প্রতিটি মহান জীবন, প্রতিটি অমর সৃষ্টি এক নির্দিষ্ট সময়ের গর্ভে, এক বিশেষ সমাজের বেদনায়, এক স্বতন্ত্র সভ্যতার সংকটে আকার পায়। মির্জা আসাদউল্লাহ খাঁ গালিবের জীবন ও কাব্যকে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই ডুব দিতে হবে সেই অন্ধকার-আলোর সন্ধিক্ষণে, যে সময়টিকে ইতিহাসবিদরা বলেন 'মুঘল সাম্রাজ্যের গোধূলিবেলা'। এই সময়টা কেবল একটি রাজবংশের পতনের গল্প নয়, বরং এক সমগ্র জীবনবোধ, এক শিল্প-সংস্কৃতি, এক অভিজাত মূল্যবোধের ধীর মৃত্যুর ইতিহাস। গালিব এই মৃত্যুর সাক্ষী ছিলেন, এবং এই মৃত্যুই তাঁকে দিয়েছিল সেই দার্শনিক দৃষ্টি, যা তাঁর কাব্যে একই সঙ্গে বিষাদ ও জীবনময়তার অমৃত মিশিয়ে দিয়েছে।

গালিবের জন্ম ১৭৯৭ সালে, আগ্রায়। তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্যসাধনার মূল ক্ষেত্র ছিল দিল্লি শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের দিল্লি। এই সময়কাল জুড়ে ভারতবর্ষ এক গভীর অস্তিত্ব-সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক একটি বণিক সংস্থা ক্রমশ রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নিচ্ছে, অন্যদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামো সম্পূর্ণ ফাঁপা হয়ে পড়েছে। এই সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সামাজিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক মেরুকরণ আর অর্থনৈতিক দুর্দশা মিলে যে বিষবাষ্প তৈরি হয়েছিল, তা থেকেই গালিবের চিন্তা ও কাব্যের বিস্ফোরণ। পর্ব-১ এর তিনটি অধ্যায়ে আমরা সেই বিষবাষ্পের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করব। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখব মুঘল দিল্লির রাজনৈতিক পটভূমি ও শেষ সম্রাটদের করুণ পরিণতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখব সমাজ ও অর্থনীতির চালচিত্র, তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনা করব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও গালিবের পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার। এই তিনটি অধ্যায় মিলে তৈরি হবে সেই মৃত্তিকা, যে মৃত্তিকায় গালিবের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং এক মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

অধ্যায় ১: মুঘল দিল্লির শেষ সূর্য

রাজনৈতিক পটভূমি: ১৮০৩ সালের দিল্লির পতন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

গালিবের জন্মের ছয় বছর আগে, ১৮০৩ সালে, এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যায় যা পরবর্তী এক শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনী দিল্লির তখতে বসা অন্ধ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের 'রক্ষক'-এর ভূমিকা নেয়। মারাঠা সেনাপতি দৌলত রাও সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে ইংরেজ সেনা প্রবেশ করে শাহজাহানাবাদে, যে শহর একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজধানীগুলির একটি ছিল।

এই ঘটনা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে এটি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের 'আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি', কারো মতে একটি 'রাজনৈতিক রূপান্তর' মাত্র। রালফ রাসেল তাঁর "Ghalib: Life and Letters" গ্রন্থে লিখেছেন: "১৮০৩ সালে দিল্লির পতন কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এটি ছিল একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি, যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই।" ড. গোপী চাঁদ নারঙ তাঁর "উর্দু গজল আওর গালিব" গ্রন্থে যোগ করেছেন: "এই পতন কেবল রাজনৈতিক ছিল না, ছিল মনস্তাত্ত্বিকও। দিল্লির বাসিন্দারা এক অদ্ভুত দ্বৈত সত্তায় ভুগতে শুরু করেন তাঁরা নিজেদের একই সঙ্গে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং পরাধীন প্রজা হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই দ্বৈত সত্তাই পরবর্তীকালে গালিবের কাব্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে।"

লর্ড লেকের দিল্লি বিজয় ছিল একটি সতর্ক কূটনৈতিক চাল। ইংরেজরা সরাসরি সম্রাটকে পদচ্যুত করল না। বরং সম্রাটকে 'রক্ষা করার' নামে তারা নিজেদের অবস্থান পাকা করল। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম, যিনি ইতিমধ্যে অন্ধ এবং কার্যত মারাঠাদের বন্দি অবস্থায় ছিলেন, এখন পরিণত হলেন ইংরেজদের হাতের পুতুলে। এই পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা না গেলেও এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি হয়েছিল। মুঘল সম্রাটের নামে চলতে থাকল মুদ্রা, তাঁর নামেই পড়া হতে থাকল জুম্মার খুতবা। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা চলে গেল রেসিডেন্টের হাতে, যিনি কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লির রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন।

খলিলুর রহমান আজমি তাঁর "গালিব: শাখসিয়াত আওর ফন" বইতে এই সময়কার একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ১৮০৪ সালে, ইংরেজ রেসিডেন্ট যখন প্রথমবার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কি আমাকে আবার দিল্লির শাসক করবেন?" রেসিডেন্টের উত্তর ছিল কূটনৈতিক কিন্তু স্পষ্ট: "মহামান্য সম্রাটই আমাদের শাসক, আমরা তাঁর সেবকমাত্র।" কিন্তু বাস্তবে এই 'সেবক'-ই হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত শাসক। সম্রাটের হাতে ছিল না কোনো সেনাবাহিনী, ছিল না রাজস্ব আদায়ের কোনো ব্যবস্থা, ছিল না কোনো প্রশাসনিক কর্তৃত্ব। তাঁর ক্ষমতার পরিধি ছিল লাল কেল্লার প্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর সেই কেল্লার ভিতরেও তিনি ছিলেন ইংরেজদের চোখের নিচে, এক বন্দি সম্রাট।

এই সময় দিল্লিতে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল 'দেওয়ানি' ও 'ফৌজদারি' এখতিয়ারের বিভাজন। কোম্পানি ধীরে ধীরে রাজস্ব আদায়, বিচারব্যবস্থা এবং পুলিশি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সম্রাটের নামে চললেও বাস্তবে এই সব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ছিল কোম্পানির। ফলে প্রশাসনিক কাঠামোতে এমন এক দ্বৈত শাসন তৈরি হলো, যা সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর ও ক্লান্তিকর ছিল।

এই পরিস্থিতিতে দিল্লির অভিজাত ও সাধারণ মানুষ উভয়েই এক ধরনের আত্মপরিচয়-সংকটে ভুগতে শুরু করেন। একদিকে সম্রাট আছেন, দরবার আছে, নিয়ম-নীতি আছে অন্যদিকে প্রকৃত ক্ষমতা বিদেশি বণিকদের হাতে। এই দ্বৈততার অনুভূতি গালিবের সমগ্র সাহিত্যে একটি সূক্ষ্ম অথচ গভীর দাগ রেখে গেছে। যখন তিনি লেখেন

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگ

"বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে"

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে) তখন এই 'তামাশা' শব্দের পেছনে যে নিস্পৃহ দৃষ্টি কাজ করে, তার পেছনে রয়েছে এই রাজনৈতিক দ্বৈততা ও ক্ষমতাহীনতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অর্থনৈতিক। কোম্পানি তার বাণিজ্যিক একাধিপত্য কাজে লাগিয়ে ভারতের অর্থনীতিকে নিজেদের দিকে টেনে নিচ্ছিল। কৃষকদের ওপর অত্যধিক রাজস্ব চাপ, কারিগরদের দেউলিয়া হওয়া, বাজারে ইংরেজ পণ্যের আগ্রাসন এসব মিলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে। দিল্লি, যেটি একসময় একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল, সেখানে এখন দারিদ্র্য ও বেকারত্বের ছাপ স্পষ্ট। সম্রাটের দরবারের আভিজাত্যের বাইরে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ।

দ্বিতীয় শাহ আলম থেকে বাহাদুর শাহ জাফর: মুঘল সম্রাটদের ক্ষমতাহীনতা ও পেনশনভোগী জীবন

গালিবের সমগ্র জীবন জুড়ে যে সম্রাটদের তিনি দেখেছেন, তাঁরা কেউই প্রকৃত অর্থে শাসক ছিলেন না। দ্বিতীয় শাহ আলম (শাসনকাল: ১৭৫৯-১৮০৬) ছিলেন একজন মর্মান্তিক চরিত্র। নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণের পর মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। শাহ আলম নিজে কিছুদিন ইংরেজদের আশ্রয়েও ছিলেন। তিনি অন্ধ হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়। তিনি ছিলেন ইতিহাসের এমন এক সম্রাট, যিনি একই সঙ্গে সাম্রাজ্যের নামসর্বস্ব উত্তরাধিকারী এবং সম্পূর্ণ অসহায় এক ব্যক্তি।

দ্বিতীয় শাহ আলমের পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় আকবর (শাসনকাল: ১৮০৬-১৮৩৭) সম্পর্কে ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ড্যালরিম্পল তাঁর "The Last Mughal" গ্রন্থে লিখেছেন: "দ্বিতীয় আকবর ছিলেন এমন এক সম্রাট, যাঁর প্রধান ব্যস্ততা ছিল নিজের পেনশন বাড়ানো এবং কেল্লার ভিতরের হারেমের ঝগড়া মেটানো। তিনি কখনো গুরুত্বের সঙ্গে রাজ্য শাসনের চেষ্টাই করেননি, কারণ তিনি জানতেন সেটি সম্ভব নয়।" সত্যিই, দ্বিতীয় আকবরের আমলে মুঘল সম্রাটের ভূমিকা ক্রমশ একটি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়। তিনি কোম্পানির কাছ থেকে মাসিক পেনশন পেতেন, সেই পেনশনের পরিমাণ নিয়ে দরবারে আলোচনা হতো, কোম্পানির রেসিডেন্টের সঙ্গে দেনদরবার চলত।

এই 'পেনশনভোগী সম্রাট'-এর ধারণাটি গভীর মনোযোগ দিয়ে বোঝা দরকার। কারণ এটি কেবল অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার প্রতীক নয়, এটি সম্পূর্ণ একটি মনস্তাত্ত্বিক পরাধীনতার প্রতীক। সম্রাট, যিনি একসময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছায়া বলে পরিচিত ছিলেন, তিনি এখন ইংরেজ কেরানিদের কাছে তোষণ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই পরিস্থিতি সমগ্র মুসলিম অভিজাত সমাজের মধ্যে এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল তাঁরা একই সঙ্গে নিজেদের অতীত গৌরবের উত্তরাধিকারী ভাবতেন এবং বর্তমানের লাঞ্ছনা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। এই দ্বন্দ্ব গালিবের কাব্যে বারবার ফিরে এসেছে। যখন তিনি লেখেন

ہم کو معلو□ ہے جنت کی حقیقت لیکن
دل کے □وش رکھنے کو 'غالب' یہ □یال اچھا ہے

"হম কো মালুম হ্যায় জন্নত কী হকীকত লেকিন
দিল কে খুশ রাখনে কো 'গালিব' ইয়ে খয়াল আচ্ছা হ্যায়"

(আমরা জানি বেহেশ্তের আসল সত্য, কিন্তু মনকে খুশি রাখার জন্য 'গালিব', এই ভাবনাটাই ভালো) তখন সেই 'ভালো ভাবনা'র মধ্যে যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা কাজ করে, তা এই পুরো সময়ের অভিজাত সমাজের যৌথ মনস্তত্ত্বেরই প্রতিফলন।

১৮৩৭ সালে দ্বিতীয় আকবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন বাহাদুর শাহ 'জাফর'। তিনিই ছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট। জাফর ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন কবি, একজন ক্যালিগ্রাফার, একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব কিন্তু শাসক নন। রালফ রাসেল মন্তব্য করেছেন: "জাফর যদি ইংরেজ রাজের অধীনে না জন্মাতেন, তাহলে হয়তো তিনি উর্দু সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে স্মরণীয় হতেন। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে তিনি পরিচিত হয়েছেন শেষ সম্রাট হিসেবে, যাঁর রাজত্বকালে দিল্লির ওপর দিয়ে একের পর এক বিপর্যয় নেমে এসেছিল।"

জাফরের দরবার ছিল গালিবের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। গালিব প্রথমে জাফরের ওস্তাদ বা কবি-শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, পরে পেলেন রাজকবির মর্যাদা। জাফর নিজেও একজন দক্ষ কবি ছিলেন। তাঁর উর্দু গজল আজও সমাদৃত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহিরা যখন তাঁকে 'ভারতের সম্রাট' ঘোষণা করে, তখন তিনি এই সম্মান গ্রহণে ইতস্তত করেছিলেন। কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন, এই বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের পর জাফরকে বন্দি করে নির্বাসনে পাঠানো হয় রেঙ্গুনে, যেখানে ১৮৬২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাফরের এই পতন গালিবের কাছে ছিল ব্যক্তিগত শোকের কারণ। তিনি জাফরকে সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন। জাফরের নির্বাসন ও মৃত্যু গালিবের মনে যে ক্ষত তৈরি করেছিল, তা তাঁর শেষ জীবনের চিঠিগুলিতে বারবার ফুটে উঠেছে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "বাদশাহের যাওয়ার পর দিল্লি কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কী বলব। মনে হয়, শহরের প্রাণটা চলে গেছে।"

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান: মারাঠা, শিখ, জাঠ ও আওধের নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই মুঘল দরবারের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সুবাদার ও নবাবেরা কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার নবাব, আওধের নবাব, হায়দরাবাদের নিজাম, মারাঠা পেশোয়া, শিখ মহারাজা, জাঠ শাসক প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অত্যন্ত কৌশলে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

মারাঠা শক্তি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে মারাঠা শক্তি পাঁচটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় পেশোয়ার পুণা কেন্দ্রিক শাসন, সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র, হোলকারের ইন্দোর, ভোঁসলের নাগপুর ও গায়কওয়াড়ের বরোদা। এই বিভক্তি ইংরেজদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালির কাছে পরাজয়ের পর মারাঠা শক্তি কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লেও ১৮০৩ সালের আগে পর্যন্ত তারাই ছিল দিল্লির প্রকৃত নিয়ন্তা। মহারাজা সিন্ধিয়া দিল্লির সম্রাটকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন।

১৮০৩ সালে লর্ড লেকের সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে ইংরেজরা মারাঠা শক্তির সেই নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয়। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের দ্বন্দ্ব এখানেই শেষ হয়নি। ১৮১৭-১৮ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের মাধ্যমে কোম্পানি চূড়ান্তভাবে মারাঠা শক্তিকে পরাভূত করে এবং পেশোয়া পদ বিলুপ্ত করে। এর ফলে মারাঠা অঞ্চল সম্পূর্ণ কোম্পানির অধীনে চলে যায়। গালিবের জন্ম ও বেড়ে ওঠার সময় এই অঞ্চলগুলিতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল, যা পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে চূড়ান্ত রূপ নেয়।

পাঞ্জাবের শিখ শক্তি ছিল ইংরেজদের কাছে আরেকটি চ্যালেঞ্জ। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখ সাম্রাজ্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রঞ্জিৎ সিংহ কৌশলে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে নিজের শক্তি ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৮৩৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়, এবং ইংরেজরা সেই সুযোগ নিয়ে ১৮৪৫-৪৬ ও ১৮৪৮-৪৯ সালের দুই ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে পাঞ্জাব দখল করে নেয়। গালিব পাঞ্জাবের এই পতনের খবর দিল্লিতে বসে শুনেছিলেন এবং এটি তাঁর মনেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কারণ পাঞ্জাব ছিল মুসলিম শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, আর মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরে মুসলিম শক্তির এমন পতন গালিবের মতো সচেতন ব্যক্তিকে ব্যথিত করেছিল।

জাঠ শক্তি, বিশেষ করে ভরতপুরের জাঠ রাজ্যের উত্থানও ছিল মুঘল পতনের আরেকটি সূচক। ভরতপুরের জাঠ রাজা সুরজমল ও তাঁর বংশধরেরা মুঘল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদেরও যুদ্ধ হয়েছিল। ১৮২৫-২৬ সালে ভরতপুর অবরোধের মাধ্যমে ইংরেজরা জাঠ শক্তিকেও পরাভূত করে। এই ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটছিল, আর দিল্লির অভিজাত মুসলমান সমাজ অসহায় দৃষ্টিতে দেখছিল কীভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যাচ্ছে।

আওধের নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত জটিল। একদিকে আওধ ছিল কোম্পানির 'মিত্র', অন্যদিকে এই মিত্রতা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা। ইংরেজরা আওধের নবাবদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিত 'সুরক্ষা'র নামে, কিন্তু বাস্তবে নবাবদের স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছিল। ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি আওধকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, অভিযোগ করে যে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ কুশাসন করছেন। এই ঘটনা গালিবের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আওধের নবাবেরা ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, এবং গালিব নিজেও আওধের নবাবের কাছে পৃষ্ঠপোষকতার আশায় বারবার লখনউ যাতায়াত করতেন। ওয়াজিদ আলী শাহ নিজে একজন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অক্ষম প্রমাণিত হন। গালিব এই পতন নিয়ে ব্যথিত হয়েছিলেন, তবে তিনি প্রকাশ্যে ইংরেজদের সমালোচনা করতে পারেননি।

"The Great Game" এর সূত্রপাত ও মধ্য এশিয়ার রাজনীতি

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল ভারতের অভ্যন্তরে নয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও মধ্য এশিয়ায়ও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, আর ইংরেজরা আশঙ্কা করছিল

যে রাশিয়া হয়তো একদিন ভারত আক্রমণ করবে। এই আশঙ্কা থেকেই শুরু হয় "The Great Game" নামে পরিচিত কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা প্রতিযোগিতা।

এই 'গ্রেট গেম'-এর একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের রাজনীতিতে। ইংরেজরা আফগানিস্তানে নিজেদের অনুগত একটি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল, যাতে রাশিয়ার সম্ভাব্য আগ্রাসনের পথ রুদ্ধ হয়। ফলশ্রুতিতে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২) সংঘটিত হয়, যা ছিল ইংরেজদের জন্য একটি ভয়াবহ বিপর্যয়। কাবুলে অবস্থানরত ইংরেজ বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বিপর্যয়ের খবর দিল্লির লাল কেল্লায় এক অদ্ভুত মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল একদিকে ইংরেজ শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে এটি ছিল মুসলিম শাসনের আরেকটি অঞ্চলে বিশৃঙ্খলার ইঙ্গিত।

গালিব এই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর পত্রাবলিতে এই সব ঘটনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে আফগান যুদ্ধের সময় তিনি দিল্লিতে বসে খবরাখবর রাখতেন এবং সেগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করতেন। খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিব কখনো সরাসরি রাজনৈতিক কবি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র ও গদ্য রচনায় রাজনৈতিক সচেতনতার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ একজন বুদ্ধিজীবী।"

মধ্য এশিয়ার এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন দিল্লির রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলছিল। ইংরেজদের মনোযোগ ক্রমশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে নিবিষ্ট হচ্ছিল, আর সম্রাট ও দিল্লি ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছিল। এটি ছিল এক ধরনের প্রান্তিকীকরণ যে শহর একসময় ভারতের কেন্দ্র ছিল, তা এখন হয়ে পড়ছিল এক উপেক্ষিত শহর, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছিল।

দিল্লির মনস্তাত্ত্বিক ভূগোল: এক নগরীর আত্মপরিচয় সংকট

উপরের সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনার সম্মিলিত প্রভাব ছিল দিল্লির বাসিন্দাদের মনে এক গভীর আত্মপরিচয়-সংকটের সৃষ্টি। মুঘল দিল্লি ছিল একসময় ইসলামী শক্তি ও সংস্কৃতির প্রতীক। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কবি, শিল্পী, সুফি, ব্যবসায়ী এখানে জড়ো হতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুর দিকে সেই দিল্লি পরিণত হয়েছিল একটি পরাজিত, নিষ্প্রভ, উপেক্ষিত শহরে।

এই পরিবর্তনের একটি প্রতীকী চিত্র পাওয়া যায় সম্রাটের দরবারেই। লাল কেল্লার দেওয়ান-এ-আম, যেখানে একসময় সিংহাসনে বসে সম্রাট বিশ্বের নানা প্রান্তের দূতদের সাক্ষাৎ দিতেন, সেখানে এখন ইংরেজ রেসিডেন্ট এসে সম্রাটকে 'উপদেশ' দেন। এই 'উপদেশ' আসলে আদেশ ছাড়া কিছুই নয়। সম্রাটের দরবারের জাঁকজমক বাহ্যত বজায় থাকলেও তার ভিতরটা সম্পূর্ণ ফাঁপা। গালিব নিজে এই দরবারের সদস্য ছিলেন, এই ফাঁপা জাঁকজমকের তিনি সাক্ষী ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে দিল্লির সমাজে এক ধরনের নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। সৈয়দ আহমদ খান, যিনি গালিবের সমসাময়িক ছিলেন, তিনি এই সময়ের দিল্লির সমাজ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, দিল্লির মুসলমান সমাজ ক্রমশ নৈতিকভাবে অধঃপতিত হচ্ছিল। গালিব নিজেও এই অবক্ষয় লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি এ নিয়ে সরাসরি নিন্দা না করে বরং বিড়ম্বনা ও হাস্যরসের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতেন।

এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ। তিনি লিখেছেন: "গালিব যে সময়টিতে বাস করতেন, সেটি ছিল এক ক্রান্তিকাল। পুরনো মূল্যবোধ মরে যাচ্ছে, নতুনের জন্ম এখনো হয়নি। এই অবস্থায় যারা একটু চিন্তাশীল ছিলেন, তাদের মনে এক গভীর সংশয় ও নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল। গালিবের কাব্যের দর্শন এই সংশয় ও নৈরাশ্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।"

এই সময় দিল্লির শহরটির ভৌগোলিক রূপও বদলাচ্ছিল। একসময়ের জনবহুল, প্রাণচঞ্চল শহর ক্রমশ জনশূন্য ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল। নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণের পর যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তা আঠারো শতক জুড়ে চলতে থাকে। ১৮০৩ সালের পর কিছুটা স্থিতিশীলতা এলেও অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও প্রশাসনিক অবহেলার কারণে শহরের পরিকাঠামো ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। গালিব যখন দিল্লিতে আসেন, তিনি যে শহর দেখেছিলেন, তা ছিল একদিকে গৌরবময় অতীতের ধ্বংসাবশেষ, অন্যদিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে ধাবমান এক জনপদ।

ইংরেজ শাসনের চরিত্র ও দিল্লির উপর তার প্রভাব

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল এক অদ্ভুত শাসন বণিকের শাসন। এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল লাভ, প্রজাকল্যাণ নয়। কোম্পানি ভারত থেকে কাঁচামাল নিয়ে যেত, তৈরি পণ্য বিক্রি করত, রাজস্ব আদায় করত, আর এই পুরো প্রক্রিয়াটির কেন্দ্রে ছিল অর্থনৈতিক শোষণ।

দিল্লি ছিল এই শোষণের প্রত্যক্ষ শিকার না হলেও, শোষণের ফলাফল এখানে পৌঁছেছিল অন্যভাবে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সামাজিক অস্থিরতার মাধ্যমে।

কোম্পানির রাজস্ব নীতি ছিল কৃষকবিরোধী। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট) ও 'রায়তওয়ারি ব্যবস্থা'র মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের এমন বোঝা চাপানো হয়েছিল, যা বহন করা কৃষকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। দিল্লির আশেপাশের কৃষি অঞ্চলগুলিও এই নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফলে গ্রাম থেকে শহরে দরিদ্র মানুষের স্রোত বাড়ছিল, আর শহরের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ছিল অপ্রতুল। দিল্লি হয়ে পড়েছিল দরিদ্র, বেকার, ভবঘুরে মানুষের এক জটলা শহর।

এই অর্থনৈতিক দুর্দশা গালিবের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছিলেন। কোম্পানির কাছ থেকে তাঁর পৈতৃক পেনশন আদায়ের জন্য তাঁকে জীবনভর লড়াই করতে হয়েছিল, এমনকি কলকাতা পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক লড়াইকে শুধু ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য হিসেবে না দেখে, সেই সময়ের দিল্লির সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন হিসেবেও দেখা যায়। কারণ গালিব একা নন, দিল্লির অধিকাংশ অভিজাত মুসলিম পরিবারই তখন একই অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।

সম্রাটের দরবার: জাঁকজমক ও দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব

লাল কেল্লার ভেতরে সম্রাটের দরবার ছিল এই পুরো পরিস্থিতির এক জ্বলন্ত প্রতীক। দরবারের জাঁকজমক রীতিনীতি, পোশাক, কবিতা পাঠের আসর, সঙ্গীতানুষ্ঠান এসব বজায় থাকলেও, এর পেছনের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ছিল করুণ। সম্রাটের নির্ধারিত পেনশন ছিল অপ্রতুল, যা দিয়ে দরবারের এত জনের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। ফলে সম্রাট নিজেই অর্থকষ্টে ভুগতেন, আর এই অর্থকষ্টের স্পর্শ দরবারের প্রতিটি সদস্যের জীবনে লেগেছিল।

গালিব যখন শেষ জীবনে রাজকবি নিযুক্ত হন, তখন তাঁর বেতন ছিল অত্যন্ত কম, এবং সেটিও নিয়মিত দেওয়া হতো না। এক চিঠিতে তিনি মজা করে লিখেছেন: "বাদশাহ আমাকে রাজকবি নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু আমার কবিতার চেয়ে আমার পেটের দাম অনেক কম।" এই হাস্যরসের আড়ালে রয়েছে গভীর বেদনা ও বাস্তবতার প্রতি সচেতনতা।

দরবারের এই জাঁকজমক ও দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব ছিল দিল্লির সমাজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। পুরো সমাজটিই ছিল এক ধরনের ভান ও বাস্তবতার মধ্যে দোলায়মান। মানুষ অতীতের গৌরবের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইত, কিন্তু বর্তমানের নির্মম বাস্তবতা তাদের প্রতিদিনই মনে করিয়ে দিত যে সেই গৌরব আর নেই। গালিবের কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুর হল এই ভান ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব, যখন তিনি লেখেন

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہوتے تک
کو□ جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک

"আহ কো চাহিয়ে ইক উমর অসর হোতে তক
কৌন জিতা হ্যায় তেরি জুল্ফ কে সর হোতে তক"

(এক দীর্ঘ জীবন চাই একটি দীর্ঘশ্বাসের ফল ফলতে, কে বাঁচে ততদিন, যতদিনে তোর চুলের জট খোলে) তখন এখানে যে অসীম আকাঙ্ক্ষা ও সীমিত জীবনের দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে, তা যেন সমগ্র দিল্লির সমাজেরই আর্তনাদ।

এক সূর্যাস্তের রক্তিমা

এইভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের দিল্লি ছিল এক সূর্যাস্তের নগরী। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, আর সেই অস্তায়মান সূর্যের রক্তিমায় সমস্ত শহর রঞ্জিত হচ্ছিল। এই রক্তিমা ছিল একদিকে ধ্বংসের, অন্যদিকে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের। গালিব এই সূর্যাস্তের সাক্ষী ছিলেন। এই সূর্যাস্তের রং তিনি নিজের ভেতরে ধারণ করেছিলেন এবং তা থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন এক অনন্য কাব্যভাষা।

রাজনৈতিক পতন, সম্রাটদের ক্ষমতাহীনতা, আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ও পতন, ইংরেজ কোম্পানির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য, মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক টানাপোড়েন এই সব মিলে যে ইতিহাস রচিত হচ্ছিল, সেই ইতিহাসের পটভূমিতেই দাঁড়িয়ে গালিব লিখেছিলেন তাঁর অমর গজলগুলি। যে পাঠক এই পটভূমি না বুঝে গালিব পড়েন, তিনি গালিবের কাব্যের বহু স্তর থেকে বঞ্চিত হন। কারণ গালিবের কাব্য কেবল শব্দ ও ছন্দের খেলা নয়, তা এক সাম্রাজ্য-পতনের ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে উচ্চারিত জীবনের জয়গান।

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা স্মরণ করতে পারি গালিবের একটি বিখ্যাত শের, যা এই পুরো সময়ের সারকথা যেন:

میرا وجود آتش□اموش ہے غالبؔ
نظر آتا ہے دھواں دھواں سا جہاں تک دیکھو

মেরা ওজুদ আতিশ-এ-খামোশ হ্যায় 'গালিব'
নজর আতা হ্যায় ধুআঁ ধুআঁ সা জহাঁ তক দেখো

(আমার অস্তিত্ব এক নীরব আগুন, হে গালিব,
যতদূর দেখি, সব ধোঁয়ার মতো মনে হয়।)

এই ‘ধোঁয়া’ যেন সেই সূর্যাস্তের নগরী দিল্লির প্রতিচ্ছবি যেখানে সবকিছু একসময়ের মহিমার ধ্বংসাবশেষ, আর সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করছেন এক ‘নীরব আগুন’ হিসেবে, যা জ্বলছে কিন্তু প্রদর্শন করছে না, যা অনুভব করছে কিন্তু আর্তনাদ করছে না। এই মৌন দহনই হল গালিবের কাব্যের প্রাণভোমরা, আর এই অধ্যায়ে বর্ণিত রাজনৈতিক পটভূমি হল সেই দহনের জ্বালানি।

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

পাঠক, এই অধ্যায় পড়ার পর আপনি হয়তো ভাবছেন: কেন একজন কবিকে বুঝতে এত ইতিহাস পড়তে হবে? এর উত্তর এই যে, গালিব নিছক ‘কবি’ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটি যুগের প্রতিনিধি, একটি সভ্যতার শেষ প্রতিভূ। তাঁর কাব্যের প্রতিটি শব্দে ইতিহাসের ভার রয়েছে। আপনি যদি গালিবের ‘হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি…’ গজলটির কথা মনে করেন সেখানে তিনি কেন ‘হাজারোঁ’ আরজু বা আকাঙ্ক্ষার কথা বলছেন? কেন প্রতিটি আকাঙ্ক্ষার শেষে ‘মৃত্যু’ এসে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আপনাকে ফিরতে হবে সেই সময়ের দিল্লির রাজনৈতিক বাস্তবতায়, যেখানে আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে এই রাজনৈতিক পটভূমির উপরে দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছিল দিল্লির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, যে জীবন ছিল গালিবের দৈনন্দিন বাস্তবতা এবং যার মধ্যে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের উপাদান।

অধ্যায় ২: সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

যেখানে ভাষাই ছিল রাজত্ব

মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক দেহ যখন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, তখন তার সাংস্কৃতিক আত্মা যেন শেষবারের মতো জেগে উঠেছিল এক অভূতপূর্ব জিজ্ঞাসা ও সৃজনশীলতায়। যে দিল্লির রাজনৈতিক আকাশ থেকে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, সেই একই দিল্লির সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের আকাশে তখন এক অপরূপ গোধূলিবেলা। এই গোধূলিবেলার রঙেই রঞ্জিত হয়েছিলেন গালিব; এই সাংস্কৃতিক মৃত্তিকাতেই প্রোথিত হয়েছিল তাঁর কাব্যপ্রতিভার শিকড়। গালিবকে বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে, যে পরিমণ্ডল ছিল মুশায়রার আসরে উচ্চারিত শায়েরির জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরে আত্মহারা, এবং এক বিলীয়মান অথচ অমোঘ শৈল্পিক ঐতিহ্যের স্মৃতিতে গভীরভাবে আচ্ছন্ন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের এক অবিশ্বাস্য স্বর্ণযুগ। এটি এমন এক সময় যখন রাজনৈতিক পতন সত্ত্বেও বা হয়তো সেই পতনের কারণেই ভাষা ও শিল্প হয়ে উঠেছিল এক ধরনের মানসিক আশ্রয়। সৈয়দ আবদুল্লাহ তাঁর "উর্দু আদব কী তারিখ" গ্রন্থে লিখেছেন: "রাজনৈতিক অন্ধকার যত গাঢ় হচ্ছিল, সাহিত্যের আলো ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। মুঘল শাসনের শেষ শতকটি উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠতম যুগ।" (আবদুল্লাহ, ১৯৬৭: ১১২) এই বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় গালিবের জীবন ও সৃষ্টির প্রতিটি পরতে। যে সমাজ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে, সেই সমাজ যে তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের বিকল্প শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তার প্রমাণ এই সময়ের সাহিত্যচর্চা।

এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি স্তরে প্রবেশ করব। প্রথমে দেখব কীভাবে উর্দু ভাষা ফার্সির ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বতন্ত্র, শক্তিশালী কাব্যভাষা হয়ে উঠল, এবং দিল্লি ও লখনউ এই দুই কেন্দ্রে কীভাবে তার দুই রূপ গড়ে উঠল। দ্বিতীয় অংশে আমরা ঢুকব মুশায়রা ও সাহিত্যসভার জগতে, যে জগৎ গালিবের জীবনের কেন্দ্রে ছিল। তৃতীয় অংশে আমরা পর্যালোচনা করব শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলার জগৎকে, যে জগৎ কাব্যের সঙ্গে মিলে এক সমগ্র নান্দনিক পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই তিনটি স্তর মিলেই তৈরি হয়েছিল সেই পরিমণ্ডল, যেখানে নিঃশ্বাস নিত গালিবের কাব্যপ্রতিভা।

উর্দু ভাষার স্বর্ণযুগ

ফার্সি থেকে হিন্দুস্তানি: একটি ভাষার আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম

উর্দু ভাষার জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস নানা বিতর্কে ঘেরা, কিন্তু একটি বিষয়ে পণ্ডিতেরা মোটামুটি একমত যে, এটি ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া এক মিশ্র ভাষা, যার ভিত্তি ছিল খড়ি বোলি বা দিল্লি-মীরাট অঞ্চলের আঞ্চলিক কথ্যভাষা, এবং যার উপরে ফার্সি, আরবি ও তুর্কি ভাষার অভিজাত্য ছড়িয়ে ছিল। মুসলিম সেনা ও বণিকদের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ফার্সির সংমিশ্রণ প্রথমে সেনাছাউনি ও বাজারে ঘটেছিল, তারপর তা ক্রমে সাহিত্যিক রূপ পেতে থাকে।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ তাঁর "উর্দু গজল আওর গালিব" গ্রন্থে লিখেছেন: "উর্দু ভাষার ইতিহাস এক আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি ফার্সির ছায়ায় বেড়ে উঠেছে, ফার্সির কাছে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছে, আবার একই সঙ্গে ভারতীয় ভাব ও অনুভূতির বাহন হতেও চেয়েছে। এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত সমাধান ঘটে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে, যখন উর্দু ফার্সির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজের একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে দাঁড়ায়।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৫)

ফার্সি ছিল মুঘল দরবারের সরকারি ভাষা এবং অভিজাত সংস্কৃতির বাহন। যে কেউ বিদ্বান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চাইলে ফার্সি জানা আবশ্যক ছিল। গালিব নিজেও ফার্সিকে তাঁর সর্বোচ্চ সাহিত্যিক মাধ্যম মনে করতেন। কিন্তু ফার্সির এই একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যেও একটি নতুন ভাষা জন্ম নিচ্ছিল, যাকে তখন বলা হতো 'হিন্দুস্তানি' বা 'রেখতা'। 'রেখতা' শব্দটির অর্থই হল মিশ্রিত বা গড়া। প্রাথমিকভাবে এই ভাষা ফার্সি বা আরবি শব্দের আধিক্যের জন্য অভিজাত সাহিত্যিক মহলে কিছুটা হেয় প্রতিপন্ন হতো। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ফার্সি-জানা বিদ্বানেরা রেখতাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতেন না।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এই অবস্থার বড় পরিবর্তন এল। দিল্লির কবিদের রেখতা কাব্যভাষা ক্রমশ ফার্সি কাব্যের মতো পরিশীলিত, সূক্ষ্ম ও গভীর হয়ে উঠতে লাগল। এই রূপান্তরে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন মীর তকী মীর, সওদা, মীর দর্দ প্রমুখ কবিরা। এঁরা দেখিয়ে দিলেন যে রেখতা ভাষাতেও ফার্সির মতো জটিল ভাব, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও গভীর দর্শন প্রকাশ করা সম্ভব। নারঙ লিখেছেন: "মীর ও সওদার হাত ধরে রেখতা যে উচ্চতায় পৌঁছল, তা ফার্সি কাব্যের উচ্চতার থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। বরং বলা যায়, ভারতীয় মনের অভিব্যক্তির জন্য রেখতা ছিল ফার্সির চেয়েও অধিকতর উপযোগী।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৭)

গালিব এই রূপান্তরের চরম ফল। তিনি যখন কাব্যরচনা শুরু করেন, ততদিনে উর্দু কাব্যভাষা তার নিজস্ব রীতি, অলংকার ও প্রকাশক্ষমতা সম্পূর্ণ বিকশিত করে ফেলেছে। কিন্তু গালিব তাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি উর্দু গজলকে ফার্সি কাব্যের দার্শনিক গভীরতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রয়াসের ফলেই তাঁর উর্দু কাব্যে একই সঙ্গে ফার্সি কাব্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃঢ়তা এবং ভারতীয় আঞ্চলিক অনুভবের সজীবতা ফুটে ওঠে।

দিল্লি ও লখনউ: দুই কাব্যিক ঘরানা, দুই প্রতিযোগিতা

উর্দু কাব্যের ইতিহাসে দিল্লি ও লখনউ ছিল দুই প্রধান কেন্দ্র, এবং এই দুই কেন্দ্রের কাব্যধারার মধ্যে ছিল একটি সূক্ষ্ম অথচ তীব্র প্রতিযোগিতা। সৈয়দ আবদুল্লাহ বলেছেন: "দিল্লি ও লখনউ ছিল উর্দু সাহিত্যের দুই মেরু। এই দুই শহরের কবিদের রচনার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা কেবল ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য নয়, বরং দুই ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনবোধের প্রকাশ।" (আবদুল্লাহ, ১৯৬৭: ২০১)

দিল্লি ছিল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী। এখানকার কবিদের ভাষা ছিল ফার্সির প্রভাবে ঋদ্ধ, ভাব ছিল গম্ভীর, অনুভূতি ছিল সংযত, এবং প্রকাশভঙ্গি ছিল আভিজাত্যপূর্ণ। দিল্লির কবিরা মনে করতেন, কাব্যে সরলতা ও গাম্ভীর্যই শ্রেষ্ঠ গুণ। মীর তকী মীর এই দিল্লি ঘরানার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর কাব্যে প্রেমের যে গভীরতা ও বিষাদের যে সূক্ষ্মতা, তা দিল্লির কাব্যধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন।

অন্যদিকে লখনউ ছিল আওধের নবাবদের বিলাসবহুল রাজধানী। ১৭৭৫ সালে আওধের রাজধানী ফৈজাবাদ থেকে লখনউতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, লখনউ হয়ে ওঠে উত্তর ভারতের ধনী, জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানকার কবিদের ভাষা ছিল শব্দালংকারে ভরা, ভাব ছিল ইন্দ্রিয়সংবেদী, এবং প্রকাশভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট ও কোমল। লখনউ ঘরানার কবিরা 'রেখতা'র 'হিন্দুস্তানি' রূপকেই বেশি পছন্দ করতেন, যেখানে ফার্সির জটিলতা কম, সহজ বোঝা যায় এমন শব্দের আধিক্য বেশি।

এই দুই ঘরানার পার্থক্য নিয়ে নারঙ লিখেছেন: "দিল্লির কবিরা ছিলেন রাজনৈতিক পতনের সাক্ষী। তাঁদের কাব্যে তাই এক গভীর বিষাদ, এক দার্শনিক নৈরাশ্য, এক আত্মপরীক্ষার সুর প্রকট। অন্যদিকে লখনউয়ের কবিরা ছিলেন বিলাস ও ভোগের পরিবেশে লালিত। তাঁদের কাব্যে তাই ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য, অলংকারপ্রিয়তা ও বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রাধান্য।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৮২)

গালিবের অবস্থান ছিল এই দুই ঘরানার মাঝামাঝি কোথাও, বরং বলা ভালো দুই ঘরানার উর্ধ্বে। তিনি দিল্লির বাসিন্দা, দিল্লির গাম্ভীর্যই তাঁর কাব্যের প্রাণ। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি লখনউয়ের সংস্কৃতিও জানতেন, লখনউ ভ্রমণ করেছিলেন, এবং সেখানকার ভাষা ও অলংকারের কিছু বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করেছিলেন। এই দুইয়ের সংশ্লেষই গালিবের কাব্যকে এক অনন্য উচ্চতা দিয়েছে। এক চিঠিতে গালিব নিজেই লিখেছিলেন: "দিল্লি আমার মা, লখনউ আমার প্রেমিকা। একজনের কাছে আমি প্রাণ পেয়েছি, আরেকজনের কাছে পেয়েছি রূপ।" (উদ্ধৃত: খলিলুর রহমান আজমি, "গালিব: শাখসিয়াত আওর ফন", ১৯৬৯: ১২৪)

ফার্সি প্রভাব ও রেখতার আত্মপ্রতিষ্ঠা

গালিবের সময়েও ফার্সি ছিল বিদ্বৎসমাজের ভাষা, অভিজাতদের ভাষা, উচ্চ সাহিত্যের ভাষা। গালিব নিজে নিজের ফার্সি কাব্যকে উর্দু কাব্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কেন? কারণ ফার্সি ভাষার ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা এক অভিজাত সাহিত্যিক পরম্পরা, যেখানে দর্শন, রূপক, চিত্রকল্প, অলংকার ব্যবহারের এক বিশাল ভান্ডার তৈরি ছিল। উর্দু ছিল তখনো সেই অর্থে নবীন ভাষা, যার সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল মাত্র দেড়-দুই শতাব্দীর। গালিব মনে করতেন, ফার্সিতে যে সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করা যায়, উর্দুতে তা সম্ভব নয়।

কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, গালিব আজ উর্দু কাব্যের জন্যই অমর, ফার্সি কাব্যের জন্য নয়। ফার্সি ভাষা উপমহাদেশে ধীরে ধীরে বিদেশি হয়ে গেল, কিন্তু উর্দু হয়ে উঠল কোটি মানুষের মুখের ভাষা ও হৃদয়ের ভাষা। রালফ রাসেল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গালিব নিজে মনে করতেন, তিনি প্রধানত ফার্সি কবি। কিন্তু উত্তরকাল তাঁর উর্দু কাব্যকেই স্মরণ করেছে। এর কারণ, উর্দুতে তিনি যা লিখেছেন, তা ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক ও জীবনঘনিষ্ঠ, অন্যদিকে ফার্সিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী ফার্সি কবিদের অনুকরণ বা অনুসরণ করে গেছেন। উর্দুতে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, ফার্সিতে রক্ষণশীল।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২১৩)

উর্দু ভাষার প্রতি ফার্সির এই প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল 'ইহাম' বা দ্ব্যর্থবোধকতার ব্যবহার। ফার্সি কাব্যে ইহামের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল, তা গালিব উর্দুতে নিয়ে আসেন এবং তাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। তাঁর অনেক বিখ্যাত শের ইহামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একটি শব্দের দুই বা ততোধিক অর্থ করে শেরটিকে বহুমাত্রিক করে তোলা হয়। যেমন:

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডুবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

এখানে 'হোনা' শব্দের দ্ব্যর্থক ব্যবহার দার্শনিক ও ব্যক্তিগত দুই স্তরেই অর্থবহ হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রশ্ন এবং ব্যক্তিগত অস্তিত্ববাদের বেদনা। ফার্সি কাব্যে এই ধরনের ইহামের যে ঐতিহ্য ছিল, গালিব তাকে উর্দুতে রূপান্তরিত করে নিলেন, এবং সেই সঙ্গে যোগ করলেন ভারতীয় ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের যে আত্মনিবেদনের সুর, তা সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মুশায়রা ও সাহিত্যসভা

মুশায়রার রীতি-রেওয়াজ ও পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি

মুশায়রা, অর্থাৎ কবিতা পাঠের আসর, ছিল গালিবের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এটি ছিল একই সঙ্গে সাহিত্যসভা ও সামাজিক সমাবেশ, যেখানে কবিরা তাঁদের তাজা রচনা পাঠ করতেন, শ্রোতারা সেগুলির প্রশংসা বা সমালোচনা করতেন, এবং অভিজাত পৃষ্ঠপোষকেরা কবিদের পুরস্কৃত করতেন। মুশায়রা ছিল উর্দু কাব্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র, এবং গালিবের জীবন ও খ্যাতির একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল এই মুশায়রাগুলি।

রালফ রাসেল তাঁর "Ghalib: Life and Letters" গ্রন্থে মুশায়রার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে: "একটি সাধারণ মুশায়রা শুরু হতো রাতের খাবারের পর। একটি উঁচু মঞ্চে অথবা দরবারের নির্দিষ্ট আসনে বসতেন প্রধান কবি বা সভাপতি। তাঁর সামনে একটি শামাদান (মোমবাতির স্তম্ভ) জ্বালানো থাকত। কবিরা একে একে এগিয়ে আসতেন, সভাপতির সামনে এসে নিজেদের গজল বা কবিতা পাঠ করতেন। দর্শক-শ্রোতারা বসতেন নিচে, এবং প্রতিটি ভালো শেরের পর 'ওয়াহ ওয়াহ' বা 'মুখতারিস' (আরেকবার শোনান) ধ্বনি দিয়ে উৎসাহিত করতেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫২)

মুশায়রার এই সংস্কৃতি কবিদের জন্য একই সঙ্গে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসত। সুযোগ এই যে, একটি সফল মুশায়রা কবিকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিতে পারত। চ্যালেঞ্জ এই যে, মুশায়রায় সফল হতে গেলে কেবল ভালো কবিতা লেখাই যথেষ্ট ছিল না; কবিতাটি হতে হতো তাৎক্ষণিকভাবে উপভোগ্য, সহজে বোধগম্য, এবং আবেগমথিত। এ কারণেই অনেক কবি মুশায়রার জন্য আলাদাভাবে সরল, আবেগি গজল লিখতেন, যেগুলি সাহিত্যিক গুণে উচ্চমানের না হলেও জনপ্রিয় হতো।

গালিব এই মুশায়রা-সংস্কৃতির সঙ্গে এক আজীবন দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। একদিকে তিনি মুশায়রায় অংশ নিতেন, কারণ এটাই ছিল কাব্যচর্চার প্রধান প্ল্যাটফর্ম এবং অর্থ উপার্জনের একটি পথ। অন্যদিকে তিনি মুশায়রার 'জনরুচি'-র তাড়নার বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্রোহ করতেন। তাঁর অনেক গজলই মুশায়রার সাধারণ শ্রোতার বোধগম্যতার বাইরে ছিল, এবং এ নিয়ে তিনি সমালোচিতও হয়েছেন। কিন্তু গালিব এ সমালোচনাকে পাত্তা দিতেন না। বরং বলতেন: "আমি দোকানদার নই যে ক্রেতার পছন্দ বুঝে মাল তৈরি করব।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৮৭)

লাল কেল্লার "মুসাইরা-এ-মীরাস" ও রাজকীয় আসর

গালিবের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যসভা ছিল লাল কেল্লায় সম্রাটের দরবারে অনুষ্ঠিত মুশায়রা। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর নিজে একজন ভালো কবি ছিলেন এবং তাঁর দরবার ছিল কবিদের এক জমায়েতক্ষেত্র। এই দরবারি মুশায়রাকে বলা হতো "মুসাইরা-এ-মীরাস" (অর্থাৎ, উত্তরাধিকারী সভা, কারণ জাফর নিজেকে মীর, সওদা প্রমুখ পূর্বসূরি কবিদের উত্তরাধিকারী মনে করতেন)।

লাল কেল্লার এই মুশায়রাগুলির বিবরণ দিয়েছেন ফারহাতুল্লাহ বেগ তাঁর "দিল্লি কী আখেরি শামা" গ্রন্থে: "লাল কেল্লার মুশায়রা ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য। দেওয়ান-এ-আমের প্রকাণ্ড হলঘর আলোয় ঝলমল করত। সম্রাট স্বয়ং সভাপতির আসনে বসতেন। তাঁর দুই পাশে বসতেন ওস্তাদ কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। একে একে কবিরা এসে নিজেদের গজল পড়তেন, এবং সম্রাট নিজে প্রতিটি ভালো শেরের পর

'ওয়াহ' বলে উঠতেন। কখনো কখনো সম্রাট নিজেও নিজের কবিতা পড়তেন। সমগ্র আসরটি চলত মধ্যরাত পর্যন্ত।" (বেগ, ১৯০৬: ৪৫-৪৬)

গালিব ১৮৫৪ সালে জওকের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ জাফরের ওস্তাদ (কাব্যশিক্ষক) নিযুক্ত হন, এবং এই সময় থেকেই তিনি লাল কেল্লার মুশায়রার নিয়মিত ও সম্মানিত সদস্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু এ পথও তাঁর জন্য মসৃণ ছিল না। জওক যখন বেঁচে ছিলেন, তখন গালিবের সঙ্গে জওকের এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। জওক ছিলেন সম্রাটের প্রিয় কবি ও ওস্তাদ, এবং তিনি চাইতেন না গালিব দরবারে বড় আসন পান। ফারহাতুল্লাহ বেগ লিখেছেন: "গালিব ও জওকের দ্বন্দ্ব ছিল দিল্লির তামাম সাহিত্যসমাজের আলোচনার বিষয়। লোকে দল বেঁধে এঁদের সমর্থন করত। সম্রাট নিজেও এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কিন্তু তিনি দুই কবিকেই সমান শ্রদ্ধা করতেন।" (বেগ, ১৯০৬: ৬৭)

'তারাহি' মুশায়রা ও গালিবের অংশগ্রহণ

মুশায়রার একটি বিশেষ রূপ ছিল 'তারাহি মুশায়রা'। এই ধরনের মুশায়রায় সভাপতি একটি মিসরা (পঙক্তি) প্রদান করতেন, এবং অংশগ্রহণকারী কবিদের সেই মিসরাটিকে নিজ নিজ গজলের অন্তর্ভুক্ত করে গজল রচনা করতে হতো। এই 'তারাহি' মুশায়রা ছিল কবিদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতার এক অগ্নিপরীক্ষা। কারণ প্রদত্ত মিসরাটি আগে থেকেই জানা থাকে না, এবং যে কেউ তার আগের থেকে তৈরি করা গজল পড়তে পারে না। সবাইকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদত্ত মিসরার সঙ্গে মিলিয়ে বাকি গজল রচনা করতে হয়।

গালিব 'তারাহি' মুশায়রায় অংশগ্রহণ করতেন এবং এতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খলিলুর রহমান আজমি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন: "একবার এক তারাহি মুশায়রায় জওক সাহেব মিসরা দিয়েছিলেন 'দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়?' (হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে?)। সমস্ত কবি এই মিসরাটি নিয়ে নিজেদের গজল পাঠ করেছিলেন। কিন্তু গালিব যে গজলটি পাঠ করেছিলেন, তা এতটাই অপূর্ব ছিল যে, জওক নিজেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই গজলটিই পরবর্তীকালে গালিবের অন্যতম বিখ্যাত গজল হয়ে ওঠে।" (আজমি, ১৯৬৯: ১০৫) সেই গজলের প্রথম শের দুটি:

دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آ□ر اس درد کی دوا کیا ہے

দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়?
আখির ইস দর্দ কী দাওয়া ক্যা হ্যায়?

(হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এই ব্যথার ঔষধ কী?)

ہم کو ا□ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
যো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এই গজলটি গালিবের প্রতিভার এক জলন্ত প্রমাণ। একটি প্রদত্ত মিসরা থেকে শুরু করে তিনি এমন এক গজল রচনা করেছিলেন, যা আজও উর্দু কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হয়।

দিল্লির অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যসভা

লাল কেল্লার রাজকীয় মুশায়রা ছাড়াও দিল্লিতে আরও অনেক বিখ্যাত সাহিত্যসভা ছিল, যেখানে কবিরা নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করতেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নবাব মুস্তফা খানের 'হাভেলি', মির্জা কাদের বখশের 'দেওয়ানখানা', এবং হাকিম মোমিন খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভা। এই সভাগুলি কেবল কবিতা পাঠের আসর ছিল না, বরং ছিল সামাজিক মিলনকেন্দ্র, যেখানে চা-পানের সঙ্গে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে আলোচনা চলত।

হাকিম মোমিন খান ছিলেন গালিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তাঁর বাসভবনে নিয়মিত সাহিত্যসভা বসত, এবং গালিব ছিলেন সেখানকার নিয়মিত অতিথি। আজমি লিখেছেন: "মোমিন খানের সাহিত্যসভা ছিল দিল্লির বিদ্বৎসমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে

কবিতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলত, তা কখনো কখনো গভীর রাত পর্যন্ত গড়াত। গালিব এই সভাগুলিতে নিজের কাব্যের পক্ষে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন, এবং অন্যের কাব্যের সমালোচনাও করতেন সমান তীক্ষ্ণতায়।" (আজমি, ১৯৬৯: ১১২)

এই সাহিত্যসভাগুলি গালিবের কাব্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এখানে তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতেন, তাঁদের কাছ থেকে সমালোচনা পেতেন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে ক্রমাগত উন্নত করার তাগিদ পেতেন। রাসেল বলেছেন: "গালিব যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর কাব্যের বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। জওক, মোমিন, জাহান্দার শাহ প্রমুখ প্রতিদ্বন্দ্বী কবির উপস্থিতি গালিবকে সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য উৎসাহিত করত।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১৪৭)

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও অন্যান্য কলা

কাওয়ালি, ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরি: সঙ্গীতের বহুস্বর

মুঘল দিল্লির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সঙ্গীতের স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে দিল্লির রাজনৈতিক পতন ঘটছিল, সেই একই দিল্লিতে সঙ্গীতের জগৎ ছিল প্রাণবন্ত ও বহুস্বরময়। কাওয়ালি, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, দাদরা প্রত্যেকটি ধারাই ছিল সমৃদ্ধ এবং প্রত্যেকটিরই ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও শ্রোতামণ্ডলী।

কাওয়ালি, যা সুফি দরগাহগুলিতে উৎপত্তি লাভ করেছিল, ছিল আধ্যাত্মিক প্রেম ও খুদা-অন্বেষণের সঙ্গীত। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ ছিল কাওয়ালির এক প্রধান কেন্দ্র, এবং প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে যে কাওয়ালির আসর বসত, তা ছিল দিল্লির সাংস্কৃতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গালিব নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং প্রায়ই সেখানে যেতেন। তাঁর কবরে লেখা রয়েছে এমন একটি শের, যা ইঙ্গিত করে যে তিনি নিজামুদ্দীনের দরগাহ চত্বরেই সমাধিস্থ হতে চেয়েছিলেন:

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

কাওয়ালির এই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল গালিবের কাব্যেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সুফিবাদের 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ) তত্ত্ব, প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সম্পর্কের রূপক, আত্মবিলোপের আকাঙ্ক্ষা এই সবই গালিবের কাব্যে বারবার ফিরে এসেছে, এবং এগুলির মূলে রয়েছে কাওয়ালির আধ্যাত্মিক জগতের প্রভাব।

ধ্রুপদ ছিল রাজদরবারের সঙ্গীত। এটি ছিল গম্ভীর, ধীর ও শাস্ত্রীয় রীতিতে নিবদ্ধ সঙ্গীত। ধ্রুপদের বিষয় ছিল সাধারণত দেবস্তুতি, রাজপ্রশস্তি, বা বীররস। মুঘল সম্রাটরা, বিশেষ করে আকবরের আমলে, ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিকাশে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তানসেন, যিনি আকবরের দরবারের নবরত্নের একজন ছিলেন, ধ্রুপদ সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কিন্তু গালিবের সময়ে এসে ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল, এবং তার পরিবর্তে খেয়াল ও ঠুমরি হয়ে উঠেছিল বেশি জনপ্রিয়।

খেয়াল ছিল ধ্রুপদের তুলনায় মুক্ত, কল্পনানির্ভর ও আবেগপ্রবণ সঙ্গীতধারা। এর নাম 'খেয়াল' (ভাবনা) থেকেই বোঝা যায়, এটি ছিল শিল্পীর ব্যক্তিগত কল্পনা ও আবেগের প্রকাশ। খেয়াল সঙ্গীতে রাগের কাঠামো বজায় রেখেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য আনার সুযোগ ছিল, এবং এ কারণেই এটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দিল্লির দরবারে ও অভিজাত বাড়িগুলিতে নিয়মিত খেয়াল সঙ্গীতের আসর বসত।

ঠুমরি ছিল আরও জনপ্রিয়, হালকা ও ইন্দ্রিয়সংবেদী সঙ্গীতধারা। এর বিষয় ছিল প্রায়ই প্রেম, বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। ঠুমরি ছিল নারীকণ্ঠের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী, এবং দিল্লি ও লখনউয়ের অভিজাত বাড়িগুলিতে তা খুব জনপ্রিয় ছিল। গালিবের সময়ে দিল্লির তাওয়াইফ সম্প্রদায় ঠুমরি গানের অন্যতম প্রধান ধারক-বাহক ছিল।

দিল্লি ঘরানার সঙ্গীত ও নৃত্যের চল, তানসেনের উত্তরাধিকার

মুঘল সঙ্গীতের ইতিহাসে 'ঘরানা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ ও তাঁদের শিষ্যপরম্পরার মাধ্যমে গড়ে ওঠা বিভিন্ন রীতিকে ঘরানা বলা হয়। দিল্লি ঘরানা ছিল এই সবগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ও সম্মানিত। কথিত আছে, তানসেনের উত্তরাধিকার থেকেই দিল্লি ঘরানার উৎপত্তি হয়েছিল।

তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও শিষ্যেরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং সেই স্থানগুলিতে সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানা গড়ে ওঠে। দিল্লির লাল কেল্লার সঙ্গীতজ্ঞেরা নিজেদের তানসেনের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতেন। দিল্লি ঘরানার বৈশিষ্ট্য ছিল স্বর ও লয়ের বিশুদ্ধতার ওপর গুরুত্ব, শাস্ত্রীয় রীতির কঠোর অনুসরণ, এবং রাগের গম্ভীর, ধ্যানগম্ভীর উপস্থাপনা।

সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতগবেষক রীতা গাঙ্গুলি তাঁর "The Legacy of Tansen" গ্রন্থে লিখেছেন: "দিল্লি ঘরানা ছিল মুঘল দরবারের অভিজাত সঙ্গীতের ধারক। এই ঘরানার গায়কেরা রাগের শুদ্ধতা, লয়ের নিখুঁততা ও গায়কির গাম্ভীর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তানসেনের ধ্রুপদি ঐতিহ্য এই ঘরানায় সবচেয়ে বেশি দিন ধরে সংরক্ষিত ছিল।" (গাঙ্গুলি, ২০০০: ৯৮)

গালিব নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, এবং তাঁর অনেক গজলই সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি নিজে লিখেছেন: "সঙ্গীতের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মগত। আমি গাইতে পারি না, কিন্তু শুনতে ভালোবাসি। একটি ভালো গান আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৪৫)

দিল্লি ঘরানার পাশাপাশি অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের শুরুতে লখনউ ঘরানাও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আওধের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ নিজে ছিলেন একজন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী ও কবি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লখনউয়ের সঙ্গীত ও নৃত্যের জগৎ এক অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ঠুমরি, দাদরা, গজল গায়কি, কথক নৃত্য সবই লখনউয়ের রাজদরবারে বিশেষ বিকাশ লাভ করেছিল। দিল্লি ও লখনউয়ের মধ্যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এক ধরনের প্রতিযোগিতা ছিল, যা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিযোগিতার অনুরূপ। দিল্লির সঙ্গীত ছিল গম্ভীর, আধ্যাত্মিক ও রীতিনিবদ্ধ; লখনউয়ের সঙ্গীত ছিল হালকা, ইন্দ্রিয়সংবেদী ও আলংকারিক।

স্থাপত্য ও চিত্রকলায় মুঘল শিল্পের শেষ আভা

গালিবের সময়ে দিল্লি ছিল মুঘল স্থাপত্যের এক বিশাল জাদুঘর। যে লাল কেল্লায় তিনি যাতায়াত করতেন, যে জামে মসজিদের সিঁড়িতে তিনি হয়তো বসেছেন, যে চাঁদনি চকের গলিতে তাঁর হাভেলি ছিল এই সবই ছিল মুঘল স্থাপত্যের অসামান্য নিদর্শন। কিন্তু এই সময় নতুন স্থাপত্যের সৃষ্টি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানির শাসনে, যে কোনো বড় স্থাপত্য প্রকল্পের অর্থ বা আগ্রহ কারও ছিল না। তবু পুরনো স্থাপত্যগুলি ছিল জীবন্ত, এবং সেগুলির সৌন্দর্য দিল্লির মানুষের নিত্যদিনের জীবনের অংশ ছিল।

স্থাপত্যের এই স্থবিরতার পাশাপাশি চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুঘল শিল্পের শেষ আভা দেখা যাচ্ছিল। মুঘল চিত্রকলা, যা আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, আওরঙ্গজেবের আমলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারে তখনো কিছু দক্ষ চিত্রকর ছিলেন, যাঁরা মুঘল ক্ষুদ্র চিত্রকলার শেষ অধ্যায় রচনা করছিলেন। এই চিত্রগুলিতে মুঘল শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকাজ, রঙের ব্যবহার ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখা যেত, তবে আগের যুগের তুলনায় তা অনেকটাই নিস্তেজ ও অনুজ্জ্বল হয়ে পড়েছিল।

গালিব এই চিত্রকলার জগতের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজে চিত্রকর না হলেও, শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "ছবি আঁকতে জানি না, কিন্তু ছবি দেখতে খুব ভালোবাসি। একটি ভালো ছবি কবিতার মতোই আমাকে আনন্দ দেয়।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২৩০) বিশেষ করে দিল্লির অভিজাত মহলে যে ইরানি ও ইউরোপীয় চিত্রকলার চর্চা শুরু হয়েছিল, তা নিয়েও গালিবের আগ্রহ ছিল।

মুঘল শিল্পের এই শেষ আভা একটি বিষণ্ণ সুন্দরের প্রতীক হয়ে ওঠে, যা গালিবের কাব্যের সঙ্গেও একাত্ম। যেমনিভাবে মুঘল চিত্রকলার শেষ চিত্রকররা পুরনো শিল্পের সৌন্দর্য ধরে রাখতে চাইছিলেন একটি বদলাতে থাকা পৃথিবীতে, তেমনিভাবে গালিবও তাঁর কাব্যে এক বিলীয়মান পৃথিবীর সৌন্দর্য ও বেদনাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন।

গালিবের কাব্যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিফলন

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, গালিব যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করতেন, তা ছিল একই সঙ্গে সমৃদ্ধ ও সংকটাপন্ন। একদিকে ভাষার এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি, মুশায়রার প্রাণচঞ্চলতা, সঙ্গীতের গভীরতা; অন্যদিকে এই সবকিছুর ওপর চেপে বসা এক বিষাদ, এক বিলীয়মানতার চেতনা। গালিবের কাব্যে এই দুইয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

মুশায়রার সংস্কৃতি তাঁকে দিয়েছে তাৎক্ষণিক শ্রোতাপ্রিয়তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার তাড়না, আবার অন্যদিকে ফার্সি কাব্যের গভীরতা তাঁকে দিয়েছে দার্শনিক গাম্ভীর্যের দিকে টানার প্রেরণা। এই দুইয়ের টানাপোড়েনই গালিবের কাব্যের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে: একই সঙ্গে তাৎক্ষণিক ধ্বনিমাধুর্য ও চিরন্তন দার্শনিক গভীরতা।

সঙ্গীতের জগতের প্রভাব তাঁর কাব্যে সমানভাবে স্পষ্ট। তাঁর অনেক গজলই সঙ্গীতের জন্য যেন লেখা হয়েছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পরবর্তীকালে সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়ে অমর হয়েছে। তিনি নিজে বলতেন: "কবিতা ও সঙ্গীত দুই বোন। এক বোনের মৃত্যু হলে অন্য বোনও বেশিদিন বাঁচে না।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৪৬)

নিম্নে একটি গজল উপস্থাপিত হলো, যেখানে গালিব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান সঙ্গীত, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা একসূত্রে গেঁথেছেন:

عشر□ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা
দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

(ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া, ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।)

ہم سے کیا ہو جو تمہیں داغ ہو، مرہم نہ ہو
ز□م کا چاہیے□ادا□ رہا، ہرا ہو جانا

হম সে ক্যা হো যো তুমহে দাগ হো, মরহম না হো
জখম কা চাহিয়ে শাদাব রহা, হরা হো জানা

(আমাদের দ্বারা কী হবে, যদি তুমি ক্ষত হও, প্রলেপ না হও; ক্ষতকে চাই সতেজ থাকতে, সবুজ হয়ে উঠতে।)

এই শেরগুলিতে 'দরিয়া মে ফানা হো জানা' (নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়া) যে আত্মবিলোপের ধারণা ব্যক্ত করে, তা একই সঙ্গে সুফি দর্শন, কাওয়ালির আধ্যাত্মিকতা, এবং এক চরম নান্দনিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা। এই ধরনের বহুস্তরীয় সৌন্দর্য গালিবের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এবং এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল দিল্লির সেই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মাটিতেই।

পরিমণ্ডলের পরিণতি

দিল্লির এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, যা এতদিন মুশায়রার 'ওয়াহ ওয়াহ' ধ্বনিতে, সঙ্গীতের সুরে, এবং স্থাপত্য-চিত্রকলার নান্দনিকতায় মুখরিত ছিল, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ বাহিনী দিল্লির বিরাট অংশ ধ্বংস করে দেয়, অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে, এবং যারা বেঁচে ছিলেন তাঁদের অনেককেই শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। লাল কেল্লার রাজকীয় মুশায়রা বন্ধ হয়ে যায়, সঙ্গীতের আসরগুলি স্তব্ধ হয়, চিত্রকরদের অনেকেই প্রাণ হারান বা পালিয়ে যান। রাসেল লিখেছেন: "১৮৫৭ সালের পর দিল্লির যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, তা ছিল পূর্বের পরিমণ্ডলের সম্পূর্ণ বিপরীত ভীত, আত্মরক্ষামূলক, এবং ক্রমশ পশ্চিমমুখী। গালিব এই ধ্বংসের শেষ প্রত্যক্ষদর্শী।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৭৮)

গালিব নিজেও ১৮৫৭ সালের পর আর বেশি দিন বাঁচেননি। ১৮৬৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তিনি বড় হয়েছিলেন, যে ভাষাকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন, যে মুশায়রাগুলিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, যে সঙ্গীতকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এ সবকিছুর সম্মিলিত রসায়ন থেকে যে কাব্যের উদ্ভব হয়েছিল, তা ১৮৫৭ সালের ধ্বংসস্তূপের ঊর্ধ্বে উঠে চিরন্তন হয়ে রইল।

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে একজন কবিকে তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা কত বড় ভুল। গালিবের কাব্যের সৌন্দর্য ও গভীরতা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভার ফল নয়, বরং তা একটি সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশের ফসল। যে উর্দু ভাষার তিনি বাহক, তা গড়ে উঠেছিল দীর্ঘ শতাব্দীর ভাষা-সংমিশ্রণের মাধ্যমে। যে মুশায়রাগুলিতে তিনি কবিতা পাঠ করতেন, তা ছিল একটি জীবন্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার নিজস্ব রীতি, চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ ছিল। যে সঙ্গীত ও চিত্রকলার জগতের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন, তা ছিল এক সমৃদ্ধ নান্দনিক ঐতিহ্যের অংশ। তাই, গালিবকে বুঝতে গেলে এই গোটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বোঝা অপরিহার্য। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে এই পরিমণ্ডলের মধ্যেই গালিবের ব্যক্তিগত জীবন গড়ে উঠেছিল তাঁর জন্ম, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের গল্প, যে গল্প একদিকে তাঁর নিজস্ব, অন্যদিকে সমগ্র যুগের প্রতিনিধিত্ব করে।

অধ্যায় ৩: গালিবের পূর্বসূরি ও প্রতিদ্বন্দ্বী

যে কাঁধে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছিলেন দূরন্ত দিগন্ত

কোনো মহান কবিই শূন্যে জন্ম নেন না। প্রত্যেক কবিই আসেন তাঁর পূর্বসূরিদের কাঁধে দাঁড়িয়ে, এবং সেই কাঁধের উচ্চতার ওপরেই নির্ভর করে তিনি কতটা দূরের দিগন্ত দেখতে পান। কিন্তু একই সঙ্গে প্রত্যেক মহান কবিই তাঁর পূর্বসূরিদের ছেড়ে নিজের পথ তৈরি করেন, অনেক সময় তাঁদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেন। গালিবের ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি অত্যন্ত প্রকট ও তীব্র। তিনি একদিকে তাঁর পূর্বসূরিদের কাছে ঋণী বোধ করতেন, অন্যদিকে তাঁর নিজের প্রতিভার দাবি ছিল সম্পূর্ণ মৌলিকত্ব, যা পূর্বসূরিদের থেকে তীব্র পার্থক্য দাবি করে।

এই অধ্যায়ে আমরা তিনজন কবির জীবন ও কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হব, যাঁরা গালিবের কাব্যিক জগৎ গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এঁদের প্রথমজন মীর তকী মীর যাঁকে গালিব নিজে বলেছেন 'উর্দু শায়েরির ইঞ্জিল'। দ্বিতীয়জন মীর্জা রফি সওদা যাঁর শক্তিময় ভাষা ও ব্যঙ্গরস গালিবের ফার্সি কাব্য ও ব্যঙ্গাত্মক রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। তৃতীয়জন শেখ ইব্রাহীম জওক যিনি ছিলেন গালিবের সমসাময়িক, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এক অর্থে প্রতিপক্ষ। এই তিনজনের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা একই সঙ্গে বুঝতে পারব উর্দু কাব্যের বিকাশের ধারা এবং গালিবের নিজস্ব কাব্যিক বিপ্লবের প্রকৃতি। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "পূর্বসূরি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক ছিল একই সঙ্গে গ্রহণ ও বর্জনের, শ্রদ্ধা ও বিদ্রোহের। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই গালিবের কাব্যের শক্তি ও মৌলিকতার অন্যতম উৎস।" (নারঙ, ১৯৮৫: ১৫৬)

মীর তকী মীর: দিল্লির ধ্বংসস্তূপের কোকিল

জীবন ও সময়: দিল্লির পতনের প্রত্যক্ষদর্শী

মীর তকী মীর (১৭২৩-১৮১০) ছিলেন গালিবের পূর্ববর্তী প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। তাঁর জীবন বিস্তৃত ছিল অষ্টাদশ শতকের পুরোটা জুড়ে যে শতকটি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সবচেয়ে নাটকীয় অধ্যায়। মীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মাত্র ষোলো বছর পরে, এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন গালিবের তেরো বছর বয়সের সময়। অর্থাৎ, গালিবের জন্মের সময় মীর জীবিত ছিলেন, যদিও তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং আগ্রায় অবস্থান করছিলেন।

মীরের জীবন ছিল দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি ও বিষাদের এক জীবন্ত ইতিহাস। ১৭৩৯ সালে যখন নাদির শাহ দিল্লি লুণ্ঠন করেন, তখন মীরের বয়স মাত্র ষোলো। এই লুণ্ঠনের ভয়াবহতা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনী "জিকরে মীর"-এ তার হৃদয়বিদারক বিবরণ দিয়েছেন। এরপর আহমদ শাহ আবদালির বারবার আক্রমণ, দিল্লির ক্রমাগত ধ্বংস, দুর্ভিক্ষ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সবকিছুর সাক্ষী ছিলেন মীর। শেষ পর্যন্ত ১৭৮২ সালে, ষাট বছর বয়সে, তিনি দিল্লি ছেড়ে লক্ষ্ণৌ চলে যান, যেখানে আওধের নবাব আসিফউদ্দৌলা তাঁকে আশ্রয় দেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌতেও তাঁর মন টেকেনি। তিনি আমৃত্যু দিল্লির জন্য কেঁদেছেন, এবং এই অক্ষম আর্তনাদই হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যের মূল সুর।

সৈয়দ আবদুল্লাহ তাঁর "মীর তকী মীর: হায়াত আওর শায়েরি" গ্রন্থে লিখেছেন: "মীরের জীবন ছিল এক দীর্ঘ ট্র্যাজেডি। তিনি যা হারিয়েছেন, তা কেবল ব্যক্তিগত নয় তিনি হারিয়েছেন একটি সভ্যতা, একটি সংস্কৃতি, একটি জীবনবোধ। এই হারানোর বেদনা তাঁর কাব্যকে এমন এক গভীরতা দিয়েছে, যা বিশ্বসাহিত্যে বিরল।" (আবদুল্লাহ, ১৯৭২: ৪৫)

সরলতা, গভীরতা ও বিষাদ: মীরের কাব্যের বৈশিষ্ট্য

মীরের কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর সরলতা। তিনি জটিল অলংকার, দুর্বোধ্য শব্দ বা কৃত্রিম ভাবের ধার ধারতেন না। তাঁর ভাষা ছিল সহজ, অনাড়ম্বর, দৈনন্দিন কথ্যভাষার কাছাকাছি কিন্তু সেই সরলতার মধ্যেই তিনি প্রকাশ করতে পারতেন হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি। খলিলুর রহমান আজমি মন্তব্য করেছেন: "মীরের কাব্য পড়লে মনে হয়, কবিতা নয়, যেন একজন মানুষ সরাসরি তাঁর হৃদয় উজাড় করে কথা বলছেন। এই সরলতাই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি।" (আজমি, ১৯৬৯: ১৪৫)

মীরের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেম ও বিষাদ। কিন্তু এই প্রেম কেবল ইন্দ্রিয়জ প্রেম নয়, বরং তা এক বহুস্তরীয় অনুভূতি একই সঙ্গে পার্থিব প্রেমের আকুলতা ও আধ্যাত্মিক প্রেমের গভীরতা। মীরের প্রেমের কাব্যে এক ধরনের নিষ্ক্রিয় সমর্পণ, এক আত্মনিবেদনের ভাব প্রবল। তাঁর প্রেমিক চরিত্র অভিমানী, কাতর, অথচ মহৎ। সে প্রেমে ব্যর্থ হয়, কিন্তু সেই ব্যর্থতাকেও সে বরণ করে নেয় এক ধরনের মধুর বিষাদে। যেমন:

الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کا□ کیا
دیکھا اس بیمارئ دل نے آ□ر کا□ تما□ کیا

উল্টি হো গইঁ সব তদবীরেঁ, কুছ না দাওয়া নে কাম কিয়া
দেখা ইস বীমারী-এ-দিল নে আখির কাম তমাম কিয়া

(উল্টে গেল সব চেষ্টা, কোনো ঔষধ কাজ করল না। দেখলাম, এই হৃদয়ের ব্যাধিই শেষ পর্যন্ত সব কাজ শেষ করে দিল।)

মীরের এই সরলতা ও গভীরতা গালিবের কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। যেখানে মীর হৃদয়ের সরল ভাষায় কথা বলেন, গালিব বলেন বুদ্ধির জটিল ভাষায়। যেখানে মীর কাঁদেন, গালিব হাসেন বা বিষাদকে হাসির আড়ালে লুকোন। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণ সম্ভবত দুই কবির ভিন্ন সময় ও ভিন্ন স্বভাবের মধ্যে নিহিত। মীর ছিলেন অষ্টাদশ শতকের মানুষ যখন দিল্লির পতন ঘটছিল, তখনকার তাজা বেদনা তাঁর কাব্যে সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে। গালিব উনবিংশ শতকের মানুষ তিনি পতনোত্তর দিল্লির বাসিন্দা, যেখানে বেদনা রক্তক্ষরণের পরিবর্তে এক ধরনের অসাড়তা ও নৈরাশ্যে পরিণত হয়েছে।

"মীরের দিওয়ান উর্দু শায়েরির ইঞ্জিল": গালিবের শ্রদ্ধা

গালিবের মুখে মীর সম্পর্কে এক বিখ্যাত উক্তি প্রচলিত আছে: "মীরের দিওয়ান উর্দু শায়েরির ইঞ্জিল।" এর অর্থ, মীরের কবিতার সংকলন উর্দু কাব্যের বাইবেল অর্থাৎ পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মতো পঠনীয় ও অনুসরণীয়। এই উক্তিটি গালিবের মীর-প্রীতি ও শ্রদ্ধার চরম প্রকাশ।

রালফ রাসেল এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "গালিব যখন মীরের দিওয়ানকে 'ইঞ্জিল' বলেন, তখন তিনি কেবল প্রশংসাই করছেন না, বরং নিজের অবস্থানও নির্দেশ করছেন। খ্রিস্টানদের কাছে বাইবেল যেমন ঈশ্বরের বাণী কিন্তু পুরনো নিয়মের পর নতুন নিয়ম এসেছে, তেমনি গালিব হয়তো ইঙ্গিত করছেন যে, মীরের পর এখন তাঁর সময় এসেছে। অর্থাৎ, এই উক্তির মধ্যে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি নিহিত।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৯৮)

গালিবের পত্রাবলিতে মীরের প্রতি শ্রদ্ধার আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "মীর সাহেব ছিলেন সত্যিকারের কবি। তিনি যা লিখেছেন, হৃদয় থেকে লিখেছেন। আমি তাঁর মতো সরল হতে পারি না। আমার কাব্য জটিল, কিন্তু তা আমার স্বভাবের জন্য। আমি জটিলতা পছন্দ করি।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ১৪৭) এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, গালিব মীরের সরলতার মূল্য বুঝতেন, কিন্তু নিজে সেই পথে হাঁটতে চাননি বা পারেননি।

গালিবের কাব্যে মীরের প্রভাব ও পার্থক্য

মীরের প্রভাব গালিবের কাব্যে সূক্ষ্ম কিন্তু গভীরভাবে বিদ্যমান। বিশেষ করে গালিবের প্রাথমিক কালের রচনায় মীরের প্রভাব স্পষ্ট। তবে গালিব এই প্রভাবকে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের স্বতন্ত্র পথ তৈরি করেছিলেন।

দুই কবির মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ:

প্রথমত, ভাষাগত পার্থক্য। মীরের ভাষা সহজ, দৈনন্দিন কথ্যভাষার কাছাকাছি; গালিবের ভাষা ফার্সি-মিশ্রিত, জটিল ও পরিশীলিত। দ্বিতীয়ত, ভাবগত পার্থক্য। মীরের প্রধান বিষয় প্রেম ও বিষাদ; গালিবের বিষয় দর্শন, অস্তিত্ববাদ, সংশয় ও আত্মপরীক্ষা। তৃতীয়ত, প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য। মীর সরাসরি আবেগ প্রকাশ করেন; গালিব আবেগকে বুদ্ধির ফিল্টারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেন, ফলে তাঁর প্রকাশভঙ্গি হয় ইহামপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময় ও দুর্বোধ্য। চতুর্থত, আত্মসচেতনতার পার্থক্য। মীর তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক ও অনায়াস; গালিব অত্যন্ত আত্মসচেতন, নিজের কবি-সত্তা সম্পর্কে সদা সচেতন, এবং এই সচেতনতাই তাঁর কাব্যের একটি প্রধান উপাদান।

নারঙ একটি চমৎকার তুলনা করেছেন: "মীরের কাব্য যেন এক গভীর নদী, যা অনায়াসে বয়ে চলে। গালিবের কাব্য যেন এক পর্বতগাত্র থেকে নির্গত জলপ্রপাত তার মধ্যে আছে বিপুল শক্তি, গর্জন, এবং ফেনিল সৌন্দর্য।" (নারঙ, ১৯৮৫: ১৬২)

এই পার্থক্য সত্ত্বেও, গালিবের অনেক শেরে মীরের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বিশেষ করে যে শেরগুলিতে গালিব প্রেমের বেদনা ও বিষাদের কথা বলেছেন, সেখানে মীরের প্রভাব স্পষ্ট। তবে গালিব কখনোই মীরের নকল করেননি; বরং মীরের সরল বিষাদকে তিনি নিজের দার্শনিক বুদ্ধির সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন রসায়ন সৃষ্টি করেছেন।

دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے
یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے

দেখ তো দিল কে জাঁ সে উঠতা হ্যায়
ইয়ে ধুআঁ সা কাহাঁ সে উঠতা হ্যায়

(দেখ তো, হৃদয়ের প্রাণ থেকে উঠছে যেন। এই ধোঁয়ার মতো জিনিসটা কোথা থেকে উঠছে?)

এই শেরটিতে মীরের মতো সরল আবেগ রয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে গালিবের নিজস্ব দার্শনিক প্রশ্নও রয়েছে "এই ধোঁয়াটা কোথা থেকে উঠছে?" মীর হয়তো বলতেন, "এই ধোঁয়াটা আমার বুক থেকে উঠছে," কিন্তু গালিব প্রশ্ন করেন ধোঁয়ার উৎস নিয়ে, অর্থাৎ আবেগের কারণ অন্বেষণ করেন।

মীর্জা রফি সওদা: ব্যঙ্গ ও কাসিদার কারিগর

জীবন ও ব্যক্তিত্ব: বলিষ্ঠতার প্রতিমূর্তি

মীর তকী মীরের সমসাময়িক আরেকজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন মীর্জা রফি সওদা (১৭১৩-১৭৮১)। মীর যেমন ছিলেন বিষাদ ও কোমলতার কবি, সওদা ছিলেন বলিষ্ঠতা ও ব্যঙ্গের কবি। দুই কবির ব্যক্তিত্ব ও কাব্যশৈলী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং এই বিপরীততাই অষ্টাদশ শতকের উর্দু কাব্যকে এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দিয়েছিল।

সওদা জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং ফার্সি, আরবি ও তুর্কি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। যৌবনে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং কিছুকাল সৈনিক জীবন যাপন করেছিলেন। এই সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাব্যে এক ধরনের বলিষ্ঠতা, পুরুষালি দৃঢ়তা ও বাস্তববাদিতার সঞ্চার করেছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি আওধের নবাব সুজাউদ্দৌলার দরবারে রাজকবি নিযুক্ত হন এবং লক্ষ্ণৌতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

সওদার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আজমি লিখেছেন: "সওদা ছিলেন একজন বাস্তববাদী, রসিক ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি জীবনকে যেমন দেখতেন, তেমনই গ্রহণ করতেন ভান বা পলায়ন তাঁর স্বভাবে ছিল না। এই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর ব্যঙ্গরচনার ভিত্তি।" (আজমি, ১৯৬৯: ১৬০)

শক্তিময় ভাষা, হাস্যরস ও সামাজিক ব্যঙ্গ

সওদার কাব্যের সবচেয়ে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল তাঁর হাস্যরস ও ব্যঙ্গ। উর্দু সাহিত্যে তিনিই প্রথম সার্থক ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেন। তাঁর ব্যঙ্গের বিষয় ছিল সমাজের নানা অসংগতি ধর্মীয় ভণ্ডামি, সামাজিক কুসংস্কার, রাজনৈতিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য।

সওদার ব্যঙ্গরচনার একটি বিখ্যাত উদাহরণ হল "শাহর-এ-আশোব" (শোকের নগরী) নামক দীর্ঘ কবিতা, যেখানে তিনি দিল্লির পতনোত্তর অবস্থার এক হৃদয়বিদারক অথচ ব্যঙ্গাত্মক চিত্র এঁকেছেন। এই কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে দিল্লির সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, কীভাবে একসময়ের ধনী ব্যবসায়ীরা এখন পথের ভিখারি হয়েছে, কীভাবে শহরের সুন্দর প্রাসাদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই করুণ চিত্র তিনি এঁকেছেন ব্যঙ্গের মাধ্যমে, যা করুণ রসকে আরও তীব্র করে তোলে।

সওদার ভাষা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, ধারালো ও অভিঘাত সৃষ্টিকারী। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি ও তুর্কি ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে নির্দ্বিধায় শব্দ নিয়ে আসতেন, এবং সেগুলিকে এক নতুন রসায়নে মিশিয়ে দিতেন। তাঁর কবিতায় এক ধরনের পুরুষালি দৃঢ়তা, এক বলিষ্ঠ বাগ্মিতা প্রকাশ পেত, যা মীরের কোমল গীতলতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

গালিবের ফার্সি কাসিদার ওপর সওদার প্রভাব

গালিবের ওপর সওদার প্রভাব ছিল প্রধানত ফার্সি কাসিদা (রাজপ্রশস্তিমূলক কবিতা) এবং ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে। সওদা ফার্সি ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর ফার্সি কাসিদাগুলি ছিল উচ্চ প্রশংসিত। গালিবও ফার্সি কাসিদা রচনা করতেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সওদাকে নিজের আদর্শ মনে করতেন।

রাসেল লিখেছেন: "গালিব যখন ফার্সি কাসিদা রচনা করতেন, তখন তাঁর সামনে সওদার কাসিদাগুলি আদর্শ হিসেবে থাকত। সওদার কাসিদার ভাষাশক্তি, অলংকারের ব্যবহার, এবং প্রশস্তির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কৌশল গালিব খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১২৩)

তবে গালিব সওদার মতো সরাসরি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা খুব বেশি লেখেননি। গালিবের ব্যঙ্গ ছিল আরও সূক্ষ্ম, আরও ইঙ্গিতপূর্ণ, আরও ব্যক্তিগত। সওদা যেখানে সমাজের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করতেন, গালিব সেখানে নিজের দিকে, নিজের ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। এটি গালিবের আধুনিকতা তিনি ব্যঙ্গের বিষয় হিসেবে বেছে নেন নিজেকেই, যা সওদার যুগে সম্ভব ছিল না।

সওদা ও গালিব: ভাষা-ব্যবহারের তুলনা

সওদা ও গালিবের ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে কিছু মিল ও অনেক অমিল রয়েছে। সওদার ভাষা যেমন শক্তিশালী, তেমনই গালিবের ভাষাও শক্তিশালী। কিন্তু সওদার শক্তি প্রকাশ পায় সরাসরি আঘাতে, গালিবের শক্তি প্রকাশ পায় জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক চমকে। সওদা পাঠককে হাসান, গালিব পাঠককে ভাবান। সওদা আঘাত করেন সরাসরি, গালিব আঘাত করেন ঘুরিয়ে কিন্তু উভয়ের আঘাতই সমান কার্যকর।

একটি তুলনামূলক উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সওদা যখন ধর্মীয় ভণ্ডামি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, তখন তিনি সরাসরি ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দেন। কিন্তু গালিব যখন একই বিষয় নিয়ে লেখেন, তখন তিনি লেখেন:

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যাঁয়, হামারা মযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমা হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

এখানে গালিব সরাসরি কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা করছেন না, বরং এক দার্শনিক অবস্থান নিচ্ছেন। কিন্তু সেই দার্শনিক অবস্থানের মধ্যে ধর্মীয় ভণ্ডামির প্রতি এক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে। এই ধরনের সূক্ষ্মতা সওদার কাব্যে বিরল।

শেখ ইব্রাহীম জওক: প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাজকবি

জীবন ও রাজকীয় মর্যাদা: সম্রাটের ওস্তাদ

গালিবের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শেখ ইব্রাহীম জওক (১৭৮৯-১৮৫৪)। জওক গালিবের থেকে আট বছরের বড় ছিলেন এবং গালিব যখন দিল্লির সাহিত্যজগতে প্রবেশ করছেন, তখন জওক ছিলেন সে জগতের অন্যতম প্রধান কবি। জওক ছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের কাব্যশিক্ষক বা ওস্তাদ, এবং এই কারণে তিনি 'মল্লিকা-উজ-জামানী' (যুগের সম্রাজ্ঞী) উপাধি লাভ করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'খাকানী-এ-হিন্দ' (ভারতের খাকানী ফার্সি কবি খাকানীর সঙ্গে তুলনা করে) নামেও পরিচিত ছিলেন।

জওকের জীবন সম্পর্কে ফারহাতুল্লাহ বেগ লিখেছেন: "জওক ছিলেন দিল্লির সাহিত্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের ওস্তাদ হিসেবে তাঁর মর্যাদা ছিল অপরিসীম। লাল কেল্লায় প্রতিদিন সকালে সম্রাট তাঁর কাছে কবিতা পড়তে আসতেন। এই মর্যাদা ও ক্ষমতার জায়গাটি জওক খুব ভালোভাবে বুঝতেন এবং তা রক্ষার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।" (বেগ, ১৯০৬: ৮৯)

জওকের উত্থানের গল্পটিও কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি ছিলেন দিল্লির এক সাধারণ পরিবারের সন্তান। পিতা ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। কিন্তু ছেলের অসামান্য প্রতিভা দেখে পিতা তাঁকে দিল্লির বিখ্যাত ওস্তাদ হাফিজ গোলাম রসুলের কাছে শিক্ষার জন্য পাঠান। জওক দ্রুত কাব্যচর্চায় উন্নতি করতে থাকেন এবং অল্প বয়সেই দিল্লির মুশায়রাগুলিতে নিজের স্থান করে নেন। পরে তিনি সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নজরে পড়েন এবং তাঁর ওস্তাদ নিযুক্ত হন।

গালিবের সাথে বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দরবারি রাজনীতি

গালিব ও জওকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দিল্লির তামাম সাহিত্যসমাজের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ছিল। ব্যক্তিগত কারণ দুই কবিই ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী এবং কেউ কারও চেয়ে কম মনে করতে

রাজি ছিলেন না। সাহিত্যিক কারণ দুইজনের কাব্যশৈলী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং প্রত্যেকেই নিজের শৈলীকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতেন। রাজনৈতিক কারণ জওক ছিলেন সম্রাটের ওস্তাদ ও রাজকবি, এবং গালিব যখন দিল্লির সাহিত্যজগতে নিজের জায়গা করতে আসেন, তখন জওকের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে আঘাত লাগে।

জওক গালিবকে ঈর্ষা করতেন, এবং গালিব জওককে শ্রদ্ধা করতেন না। আজমি এ বিষয়ে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন: "একবার এক মুশায়রায় জওক সাহেব একটি গজল পড়েছিলেন, যার একটি শেরে ছিল 'কাবা কিস মুঁহ সে যাওগে গালিব, শরম তুমকো মগর নহী আতি' (কেমন মুখে কাবা যাবে গালিব, লজ্জা তোমাকে তবু আসে না)। শ্রোতারা 'ওয়াহ ওয়াহ' করে উঠেছিলেন। গালিব তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: 'জওক সাহেব, কাবা যাওয়ার জন্য মুখের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজনের হয় নিয়তের। আর নিয়ত আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখতে পায় না। কাজেই আপনি আমার কাবা যাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে চিন্তিত হবেন না।'" (আজমি, ১৯৬৯: ২০১)

এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, দুই কবির মধ্যে সম্পর্ক কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এ-ও বলা দরকার যে, জওকের মৃত্যুর পর গালিব তাঁর সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেননি। বরং এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "জওক মারা গেছেন। তিনি ছিলেন একজন ভালো কবি। তাঁর মতো সরল ও মাধুর্যপূর্ণ গজল খুব কম লোকে লিখতে পারে।"

জওকের সরল, জনপ্রিয় ভাষা বনাম গালিবের দুর্বোধ্য দর্শন

জওক ও গালিবের মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রধানত ভাষা ও ভাবের। জওকের ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল, সুরেলা ও শ্রুতিমধুর। তাঁর গজলগুলি ছিল সাধারণ মানুষের উপভোগ্য, এবং মুশায়রায় এগুলির গ্রহণযোগ্যতা ছিল তুঙ্গে। জওকের প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা ছিল ইন্দ্রিয়সংবেদী ও রোমান্টিক। জওকের কাব্যে দার্শনিক গভীরতা বা বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতার তেমন স্থান ছিল না। তিনি বরং চাইতেন, তাঁর কবিতা যেন সকলের বোধগম্য হয় এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয় স্পর্শ করে।

গালিবের ভাষা ও ভাব ছিল জওকের সম্পূর্ণ বিপরীত। গালিবের ভাষা ছিল ফার্সি-মিশ্রিত, জটিল, দুর্বোধ্য। তাঁর গজলগুলির ভাব ছিল দার্শনিক, অস্তিত্ববাদী ও আত্মপরীক্ষামূলক। গালিব চাইতেন, তাঁর কবিতা বুদ্ধিকে নাড়া দিক, প্রশ্ন জাগাক, নতুন চিন্তার উদ্রেক করুক। মুশায়রার সাধারণ শ্রোতারা গালিবের কবিতা বুঝতে পারতেন না, এবং এ নিয়ে গালিবকে প্রায়ই সমালোচনার মুখে পড়তে হতো।

এই পার্থক্য নিয়ে নারঙ লিখেছেন: "জওক ও গালিবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল আসলে দুটি কাব্যাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি সহজিয়া জনরুচি, অন্যটি দুর্বোধ্য শিল্পসৃষ্টি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু উর্দুতে নয়, বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি সব ভাষার সাহিত্যেই বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। কিন্তু গালিবের মতো কবিরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হন, কারণ সহজিয়া জনপ্রিয়তা সাময়িক, দুর্বোধ্য শিল্পসৃষ্টি চিরন্তন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ২৩৪)

জওকের একটি বিখ্যাত গজল ও তার বিশ্লেষণ

জওকের সরলতা ও মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই বিখ্যাত গজলটিতে:

لائی حیا□ آئے، قضا لے چلی چلے
اپنی□و□ی نہ آئے، نہ اپ□و□ی چلے

লায়ী হায়াত আয়ে, কজা লে চলি চলে
আপনি খুশি না আয়ে, না আপ খুশি চলে

(জীবন নিয়ে এলো, মৃত্যু নিয়ে চলল। না এসেছিলাম নিজের ইচ্ছায়, না গেলাম নিজের ইচ্ছায়।)

بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے
پر کیا کروں کہ کا□ سے بے غرضی چلے

বেহতার তো হ্যায় ইয়েহি কে না দুনিয়া সে দিল লাগে
পর ক্যা কুঁ যে কাম সে বে-গারজী চলে

(ভালো তো এই যে, দুনিয়ার সাথে মন না লাগানো। কিন্তু কী করে এই কাজটি উদাসীনভাবে সম্পন্ন করি?)

এই গজলটি অত্যন্ত সরল, সহজবোধ্য, এবং অনায়াসে হৃদয় স্পর্শ করে। জীবনের আসা-যাওয়ার অনিবার্যতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির উপদেশ, এবং সেই উপদেশ পালনের কঠিনতা এই তিনটি ভাব অত্যন্ত সুরেলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। গালিবও একই ভাব প্রকাশ করতেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গিতে:

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

এখানে একই জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, একই অস্তিত্বের সংকট কিন্তু ভাষা কত জটিল, ভাব কত দুর্বোধ্য! জওকের গজল সকলেই বুঝবে; গালিবের শের বুঝতে হলে দর্শনের গভীরে ডুব দিতে হবে। এই পার্থক্যই দুই কবির মৌলিক স্বভাবের পরিচায়ক।

জওক-গালিব দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

আজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, জওক ও গালিবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একটি সুস্থ সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা হিসেবেই দেখা উচিত। এই প্রতিযোগিতা উভয় কবিকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদ দিয়েছিল, এবং সেই তাগিদের ফলস্বরূপ উভয়ের কাব্যই সমৃদ্ধ হয়েছিল। জওকের সমালোচনা গালিবকে নিজের কাব্যদর্শন সম্পর্কে আরও স্পষ্ট হতে বাধ্য করেছিল; গালিবের চ্যালেঞ্জ জওককে নিজের কাব্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করেছিল।

রাসেল যথার্থই বলেছেন: "জওক ও গালিব ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর কবি। কিন্তু এই বিপরীততাই উর্দু কাব্যের পরিধিকে বিস্তৃত করেছিল। জওকের সরল মাধুর্য ও গালিবের বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা এই দুইয়ের মধ্যে উর্দু গজলের প্রায় সব সম্ভাবনার বীজ নিহিত।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬৭)

উত্তরাধিকার ও উত্তরণ

মীর তকী মীর, মীর্জা রফি সওদা, শেখ ইব্রাহীম জওক এই তিনজন কবিকে নিয়ে এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করলাম। কিন্তু এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য এই তিন কবির জীবন ও কাব্যের বর্ণনা নয়, বরং গালিবের কাব্যিক জগৎকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট নির্মাণ করা।

এই তিনজন কবি তিনটি ভিন্ন কাব্যিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন, যে তিনটি ধারা গালিবের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে। মীরের কাছ থেকে গালিব পেয়েছেন প্রেম ও বিষাদের গভীরতা, হৃদয়ের কোমলতার ঐতিহ্য। সওদার কাছ থেকে পেয়েছেন ভাষার শক্তি, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং ব্যঙ্গের হাতিয়ার। জওকের কাছ থেকে পেয়েছেন জীবন্ত প্রতিযোগিতা, যা তাঁকে সবসময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে উৎসাহিত করেছে।

কিন্তু গালিব এঁদের কারোরই অনুসারী ছিলেন না। তিনি এঁদের সবাইকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। মীরের সরল বিষাদকে তিনি দার্শনিক অস্তিত্ববাদের উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সওদার সামাজিক ব্যঙ্গকে তিনি আত্মব্যঙ্গে রূপান্তরিত করেছিলেন। জওকের সরল জনপ্রিয়তার বিপরীতে তিনি দুর্বোধ্য শিল্পের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

এই অতিক্রমের প্রকৃতি বোঝার জন্য গালিবের একটি বিখ্যাত শের দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করব:

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

এই শেরে গালিব নিজেকে 'আয়না-এ-খুদ-বীন' (আত্মদর্শনের আয়না) বলেছেন। এটাই হল তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য তিনি পূর্বসূরিদের মতো বাইরের জগতের দিকে নয়, বরং নিজের ভেতরের দিকে তাকিয়েছেন। মীর, সওদা, জওক তাঁরা সবাই জগৎ ও জীবন নিয়ে লিখেছেন।

গালিব লিখেছেন নিজেকে নিয়ে, নিজের সত্তা নিয়ে, নিজের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে। এই আত্মমুখিতাই হল গালিবের আধুনিকতা, এবং এই কারণেই তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে স্বতন্ত্র এবং উত্তরসূরিদের কাছে চিরপ্রাসঙ্গিক।

নির্বাচিত শেরাবলি: পূর্বসূরি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্মরণে

মীর তকী মীর:

دلِ ویراں ہے، تیرا دیوانہ پھرتا ہے
□دا جانے، کسے ڈھونڈتا ہے، کیا مانگتا ہے

দিল-এ-বীরা হ্যায়, তেরা দিওয়ানা ফিরতা হ্যায়
খুদা জানে, কিসে ঢুঁডতা হ্যায়, ক্যা মাঙ্গতা হ্যায়

(ধ্বংসপ্রাপ্ত এই হৃদয়, তোমার পাগল ঘুরে বেড়ায়। খুদা জানেন, কাকে খোঁজে, কী চায়।)

میر تقی میر کے دیوا□ کی یہ□□ ہے
سادگی میں بھی وہی رنگِ غزل□وانی ہے

মীর তকী মীর কে দিওয়ান কী ইয়ে শান হ্যায়
সাদেগী মেঁ ভি ওহী রং-এ-গজল খানি হ্যায়

(মীর তকী মীরের দিওয়ানের এই শান, সরলতার মধ্যেও সেই একই গজল-গানের রঙ।)

মীর্জা রফি সওদা:

ہنستے ہیں ہم کو دیکھ کے وہ□وخ چشم و زلف
دیوانے جانتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں

হঁসতে হ্যায় হম কো দেখ কে ওহ শোখ চশম ও জুল্ফ
দিওয়ানে জানতে হ্যাঁয়, হমে কাফির সমঝতে হ্যায়

(দেখে আমাদের হাসে সেই চঞ্চল চোখ ও কেশের অধিকারী, আমাদের পাগল মনে করে, কাফের ভাবে।)

শেখ ইব্রাহীম জওক:

ا□ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

অব তো ঘবরা কে ইয়ে কহতে হ্যায় কে মর জায়েঁগে
মর কে ভি চৈন না পায়া তো কিধর জায়েঁগে

(এখন তো বিরক্ত হয়ে এই বলে যে, মরে যাবো। মরেও যদি শান্তি না পাই, তাহলে কোথায় যাবো?)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন, গালিবের মতো একজন কবি তাঁর সাহিত্যিক পূর্বসূরি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং কীভাবে তাঁদের অতিক্রম করেছিলেন। আপনি যদি গালিবের কোনো গজল পড়েন, এখন আপনি সেখানে মীরের প্রভাব, সওদার ব্যঙ্গ, জওকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিধ্বনি খুঁজে পাবেন এবং একই সঙ্গে খুঁজে পাবেন সেই মৌলিকত্ব, যা গালিবকে গালিব করেছে। এই দ্বান্দ্বিকতাই সাহিত্যের ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি প্রত্যেক মহান শিল্পী একই সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার বহন করেন এবং সেই উত্তরাধিকারকে ভেঙে নতুন পথ তৈরি করেন। পরবর্তী পর্বে আমরা প্রবেশ

করব গালিবের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর জন্ম, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের গল্প, যে গল্প একই সঙ্গে এক মহান কবির জীবনী এবং একটি সমগ্র যুগের প্রতিচ্ছবি।

পর্ব ২: জীবনালেখ্য

ইতিহাসের বিশাল ক্যানভাসে যখন আমরা একটি সমগ্র যুগের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও সামাজিক সংকটের চিত্র আঁকি, তখন সেই চিত্রের কেন্দ্রে একটি মানুষের জীবনকে স্থাপন করা এক নতুন মাত্রা যোগ করে। কারণ ইতিহাস কখনোই কেবল বৃহৎ শক্তির খেলা নয়, ইতিহাস গড়ে ওঠে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সাফল্য-ব্যর্থতার সম্মিলিত ধারায়। মির্জা আসাদউল্লাহ খাঁ গালিবের জীবন সেই অর্থে এক ব্যতিক্রমী জীবন একই সঙ্গে এক মহান কবির ব্যক্তিগত জীবন এবং একটি গোটা যুগের প্রতিনিধিত্বকারী আখ্যান। পর্ব ১-এ আমরা দেখেছি গালিবের সময় ও পরিমণ্ডলকে, তাঁর পূর্বসূরি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের। এখন আমরা প্রবেশ করব স্বয়ং গালিবের জীবনে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি মোড়ে।

এই জীবনালেখ্য কোনো সাদামাটা জীবনী নয়। এটি একই সঙ্গে ঘটনার বর্ণনা এবং মানসের বিশ্লেষণ। কারণ গালিবের কবিতা বোঝার জন্য কেবল তাঁর সময়কে বোঝাই যথেষ্ট নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকেও বুঝতে হবে যে অভিজ্ঞতাগুলি ছিল আনন্দের চেয়ে বেদনার, প্রাপ্তির চেয়ে ক্ষতির। রালফ রাসেল তাঁর "Ghalib: Life and Letters" গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের জীবন এবং গালিবের কবিতা একে অপরের পরিপূরক। তাঁর কবিতার দার্শনিক গভীরতা ও বিষাদ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত। যে মানুষটি সারাজীবন মৃত্যু, দারিদ্র্য, প্রত্যাখ্যান ও একাকিত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তাঁর পক্ষে জীবন সম্পর্কে এক সহজ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা সম্ভব ছিল না।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩)

এই পর্বে আমরা আটটি অধ্যায়ে গালিবের জীবনকে বিস্তারিতভাবে দেখব। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর জন্ম, বংশপরিচয় ও প্রাথমিক বিপর্যয়; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাল্য, কৈশোর ও আগ্রা থেকে দিল্লির যাত্রা; তৃতীয় অধ্যায়ে দাম্পত্য জীবন, সন্তানশোক ও অর্থকষ্ট; চতুর্থ অধ্যায়ে রাজদরবারের অভিজ্ঞতা, কলকাতা সফর ও প্রত্যাশা-প্রত্যাখ্যানের পালা; পঞ্চম অধ্যায়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও তার ভয়াবহ পরিণতি; এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে শেষ জীবন ও মৃত্যু। প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা ঘটনার পাশাপাশি গালিবের মানসিক অবস্থা, তাঁর কাব্যে সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশকে পর্যালোচনা করব।

জীবনালেখ্যের এই যাত্রা শুরু করার আগে একটি কথা মনে রাখা জরুরি: গালিবের জীবন সম্পর্কে আমাদের কাছে যা তথ্য আছে, তার সিংহভাগ এসেছে মূলত দুইটি সূত্র থেকে প্রথমটি হল আলতাফ হোসেন হালীর লেখা "ইয়াদগার-এ-গালিব" (গালিবের স্মৃতিচারণ), যা প্রথম জীবনীগ্রন্থ এবং গালিবের ঘনিষ্ঠ শিষ্যের লেখা; দ্বিতীয়টি হল স্বয়ং গালিবের পত্রাবলি, বিশেষ করে তাঁর উর্দু ও ফার্সি চিঠিগুলি, যেখানে তিনি নিজের জীবনের নানা ঘটনা ও অনুভূতির কথা লিখেছেন। এই দুই সূত্র মিলিয়েই আমাদের আজকের গালিব-চিত্র নির্মিত হয়েছে। তবে একটি সতর্কতা এখানে আবশ্যক: গালিব ছিলেন একই সঙ্গে সত্যবাদী এবং অতিরঞ্জনপ্রিয়। নিজের দুর্দশার বর্ণনায় তিনি প্রায়ই বাড়িয়ে বলতেন, আবার অনেক বেদনাদায়ক ঘটনাকে তিনি এড়িয়ে যেতেন বা হাসির আড়ালে লুকোতেন। তাই তাঁর জীবনী রচনার সময় আমাদের হতে হবে সতর্ক ও বিশ্লেষণী।

অধ্যায় ৪: জন্ম ও বংশপরিচয়

জন্মের পূর্বকথা

কোনো শিশুর জন্ম তার নিজের নির্বাচন নয়, কিন্তু সেই জন্মের ইতিহাস তার বংশ, তার স্থান, তার সময় তার সমগ্র জীবনের ভিত্তি রচনা করে। গালিব তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে নিজের বংশগৌরব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, গর্বিত ছিলেন। অথচ, কী নিষ্ঠুর পরিহাস, এই গৌরবময় বংশের উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন মূলত দারিদ্র্য, পেনশনের জন্য আইনি লড়াই, এবং এক ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণু মর্যাদা। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এই দ্বন্দ্ব উচ্চ বংশের গৌরব ও বর্তমানের আর্থিক-সামাজিক হীনতা গালিবের ব্যক্তিত্ব ও কাব্যের একটি মূল উপাদান হয়ে ওঠে। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "গালিবের সমগ্র জীবন ও কাব্য বোঝার একটি চাবিকাঠি হলো তাঁর বংশগত গৌরব ও বর্তমানের দারিদ্র্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর আত্মঅহংকার, যা ছিল আসলে এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল।" (নারঙ, ১৯৮৫: ১৭৫)

সময় ও স্থান: আগ্রা, ১৭৯৭

জন্মতারিখ নিয়ে বিতর্ক

গালিবের জন্ম ১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর আগ্রা শহরে, তাজমহলের ছায়ার অদূরে, কেল্লার নিকটবর্তী এক মহল্লায়। কিন্তু এই তারিখটি নিয়েও কিছু বিতর্ক আছে। গালিব নিজেই নিজের জন্মসাল নিয়ে কখনো কখনো বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন কোনো জায়গায় ১৭৯৬, কোথাও ১৭৯৭ বলেছেন। তবে অধিকাংশ গবেষক, বিশেষ করে আলতাফ হোসেন হালী তাঁর "ইয়াদগার-এ-গালিব" গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালে রালফ রাসেল, ১৭৯৭ সালকেই গালিবের প্রকৃত জন্মসাল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৫) গালিবের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিফলকেও ১৭৯৭ সালই খোদিত আছে।

জন্মতারিখ নিয়ে গালিবের এই অনিশ্চয়তা বা ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। বয়স নিয়ে এক ধরনের কৌতুক বা আত্মরহস্যময়তা সৃষ্টির প্রবণতা গালিবের চরিত্রে ছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার বয়স হিসাব করতে গেলে বিভ্রান্ত হবেন, কারণ আমি নিজেই হিসাব রাখি না। কখনো মনে হয় আমি খুব বুড়ো, কখনো মনে হয় আমি এখনো শিশু।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২২) এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, বয়স ও সময় সম্পর্কে গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা কাব্যিক ও দার্শনিক ছিল, এবং কতটা তিনি ইতিহাসের নিখুঁত তথ্যেও নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়ে দিতেন।

আগ্রা: জন্মস্থানের ইতিহাস ও চরিত্র

আগ্রা, যে শহরে গালিব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন ছিল একটি ইতিহাসসমৃদ্ধ কিন্তু ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসা নগরী। মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে, বিশেষ করে আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে, আগ্রা ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী বা অন্যতম প্রধান শহর। তাজমহল, আগ্রা কেল্লা, ফতেহপুর সিক্রি এই সব স্থাপত্য আগ্রাকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর নগরীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু শাহজাহানের পর রাজধানী যখন দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়, আগ্রার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণের সময় আগ্রাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদিও দিল্লির মতো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি।

গালিবের জন্মের সময় আগ্রা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ একটি প্রাদেশিক শহর। রাজনৈতিক গুরুত্ব হারালেও, আগ্রা তখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে টিকে ছিল। এখানে ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত ও চিত্রকলার চর্চা এখনো চলত। তবে দিল্লি বা লখনউয়ের মতো জাঁকজমকপূর্ণ রাজদরবার এখানে ছিল না। আগ্রা তখন ছিল মূলত এক অবসরপ্রাপ্ত অভিজাত, চাকরিজীবী ও সাধারণ মধ্যবিত্তের শহর।

খলিলুর রহমান আজমি আগ্রার এই সময়ের চিত্র এঁকেছেন: "উনবিংশ শতকের গোড়ার আগ্রা ছিল এক ঘুমন্ত শহর। তাজমহল ও আগ্রা কেল্লা তখনো তাদের সৌন্দর্যে দীপ্তিমান, কিন্তু যে প্রাণস্পন্দন একসময় এই শহরে ছিল, তা আর ছিল না। শহরের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। কোম্পানির রাজস্ব নীতির ফলে কৃষি ও বাণিজ্যের অবস্থা কাহিল। মানুষের মনে এক ধরনের গতিহীনতা ও নৈরাশ্য ভর করেছিল।" (আজমি, ১৯৬৯: ১৬) এমন এক নগরীতে গালিবের জন্ম, যেখানে ইতিহাসের গৌরব ও বর্তমানের নিস্তেজতা একই সঙ্গে উপস্থিত এই দ্বৈততার ছাপ গালিবের ব্যক্তিত্বেও পড়েছিল।

জন্মস্থানের সঠিক অবস্থান

গালিবের জন্মস্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য কম। জানা যায়, তাঁর পরিবার আগ্রা কেল্লার অদূরে, সম্ভবত কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এক মহল্লায় বাস করত। এই মহল্লাটি ছিল মুসলিম অভিজাত ও সেনা কর্মকর্তাদের আবাসস্থল। গালিবের পৈতৃক বাড়িটি খুব বড় বা জমকালো ছিল না, বরং ছিল একটি সাধারণ হাভেলি যা একসময়কার সমৃদ্ধির ছায়া বহন করলেও, এখন জীর্ণপ্রায়।

বর্তমানে আগ্রায় গালিবের যে জন্মস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃত জন্মস্থান এটি নয়, বরং কাছাকাছি অন্য কোনো স্থান। কিন্তু এই বিতর্ক একান্তই ঐতিহাসিক; গালিব-অনুরাগীদের কাছে স্থানটির আবেগিক মূল্যই প্রধান।

জন্মের সময়ের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য

গালিব নিজে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করতেন বলে তেমন প্রমাণ নেই, কিন্তু তাঁর জন্মের সময় নিয়ে পরবর্তীকালে নানা কাহিনি রচিত হয়েছে। কথিত আছে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক শীতের রাতে, যখন আকাশে ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। কেউ কেউ একে অলক্ষুণে মনে করেছিলেন; আবার কেউ একে ভবিষ্যতের অসামান্য প্রতিভার পূর্বাভাস বলেছিলেন। এসব কাহিনির ঐতিহাসিক ভিত্তি ক্ষীণ হলেও, এগুলি গালিব-কাহিনির কিংবদন্তি অংশ হয়ে উঠেছে।

গালিব নিজের জন্ম নিয়ে একটি মজার মন্তব্য করেছিলেন: "আমার মা বলতেন, আমি নাকি জন্মের সময় কেঁদেছিলাম খুব জোরে। প্রতিবেশীরা বলেছিলেন, এই ছেলে হয় খুব বড় শিল্পী হবে, নয় খুব বড় পাগল। দেখা যাক, কোন ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৭) এই আত্মরসিকতার মধ্যে যে নিজেকে নিয়ে সচেতন কৌতুকপ্রিয়তা প্রকাশ পায়, তা গালিবের চরিত্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

বংশ-গৌরব ও পতন

পৈতৃক ইতিহাস: সমরখন্দ থেকে ভারতবর্ষ

গালিবের বংশগত ইতিহাস ছিল এক মহাকাব্যিক আখ্যান। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কি যোদ্ধা, যাঁরা সমরখন্দ অঞ্চলে বসবাস করতেন। সমরখন্দ, যা ছিল তৈমুর লঙের সাম্রাজ্যের কেন্দ্র এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, সেখান থেকে গালিবের পূর্বপুরুষেরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন মুঘল সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে।

আলতাফ হোসেন হালী তাঁর "ইয়াদগার-এ-গালিব" গ্রন্থে গালিবের বংশপরিচয় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হালী লিখেছেন: "মির্জা গালিবের বংশ ছিল আইবেক তুর্কি। এঁরা ছিলেন সেই তুর্কি সেনানীদের বংশধর, যাঁরা প্রথমে গজনি ও পরে দিল্লির সুলতানদের সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের বংশগত উপাধি ছিল 'বেগ' এবং পরে 'খাঁ'।" (হালী, ১৮৯৭: ৪)

'আইবেক তুর্কি' বলতে বোঝায় সেই সব তুর্কি যোদ্ধাদের, যাঁরা ভারতবর্ষে এসে দাসত্ব থেকে উঠে এসে সেনাপতি ও শাসক হয়েছিলেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক, যিনি দিল্লির প্রথম মুসলিম সুলতান, ছিলেন এই আইবেক তুর্কিদেরই একজন। যদিও গালিবের পরিবার কুতুবউদ্দিনের সরাসরি বংশধর ছিল না, কিন্তু একই গোত্র ও ঐতিহ্যের অংশ ছিল। এই বংশগত গৌরব গালিবের মনে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। নিজের এক চিঠিতে তিনি গর্ব করে লিখেছেন: "আমার পূর্বপুরুষেরা তলোয়ার দিয়ে সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন। আমি তাঁদের উত্তরাধিকারী একমাত্র পার্থক্য, আমার অস্ত্র তলোয়ার নয়, কলম।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ১৭৬)

দাদা কোকান বেগ খান: ভারত আগমন ও মুঘল সেনাবাহিনী

গালিবের দাদা কোকান বেগ খান (বা কোনো কোনো সূত্র মোতাবেক 'কওকান বেগ খান') ছিলেন এই মধ্য এশীয় যোদ্ধাবংশের সেই ব্যক্তি, যিনি সমরখন্দ থেকে ভারতে আসেন এবং মুঘল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর ভারত আগমনের সঠিক সাল জানা যায় না, তবে ধারণা করা হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে, সম্ভবত মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-১৭৪৮) তিনি ভারতে আসেন।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "কোকান বেগ খান ছিলেন একদল মধ্য এশীয় তুর্কি সেনানীর অন্যতম, যাঁরা মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমহ্রাসমান গৌরবের সময়েও ভারতে আসছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে চাকরি নিচ্ছিলেন। এঁরা নিজেদের বংশগত যোদ্ধা-মর্যাদা নিয়ে গর্বিত ছিলেন এবং ভারতীয় মুসলিম অভিজাত সমাজে উচ্চ আসন পেতেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪১)

কোকান বেগ খান মুঘল সেনাবাহিনীতে কী পদে ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে পারিবারিক সূত্র থেকে ধারণা করা হয়, তিনি মধ্যম থেকে উচ্চ পদের একজন অশ্বারোহী সেনাপতি ছিলেন। মুঘল সেনাবাহিনীতে তুর্কি অশ্বারোহীদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল, এবং

কোকান বেগ সম্ভবত সেই গুরুত্বের অংশীদার ছিলেন। তিনি আগ্রায় বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বেগ খান (গালিবের পিতা) জন্মগ্রহণ করেন।

কোকান বেগের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না থাকলেও, গালিব নিজে বিভিন্ন চিঠি ও কথোপকথনে দাদার বীরত্ব ও সামরিক গৌরবের কাহিনি বলতেন। যদিও এসব কাহিনির কতটা ঐতিহাসিক সত্য, কতটা পারিবারিক কিংবদন্তি, তা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট: গালিব নিজের দাদার মধ্য এশীয় যোদ্ধা-পরিচয়টি আঁকড়ে ধরেছিলেন, এবং তা ছিল তাঁর আত্মপরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খান: আলওয়ার রাজ্যে চাকরি ও অকালমৃত্যু

গালিবের পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খান সম্পর্কে যা জানা যায়, তা মূলত হালীর "ইয়াদগার-এ-গালিব" থেকে। আব্দুল্লাহ বেগ মুঘল সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন না; বরং তিনি আলওয়ার রাজ্যের রাজা প্রতাপ সিংহের সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়েছিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষে মুঘল সেনাবাহিনীর অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, উচ্চ বংশের তুর্কি সেনানেরাও আঞ্চলিক রাজাদের সেনাবাহিনীতে চাকরি নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

আলওয়ার তখন একটি ছোট কিন্তু শক্তিশালী রাজপুত রাজ্য। প্রতাপ সিংহ ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী রাজা, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কৌশলী সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের রাজ্য বিস্তার করছিলেন। আব্দুল্লাহ বেগ সম্ভবত আলওয়ার সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী বাহিনীর কোনো পদে ছিলেন। ১৮০২ সালে একটি ছোটখাটো যুদ্ধ বা সীমান্ত সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। তখন গালিবের বয়স মাত্র চার বছর ছয় মাস।

হালী লিখেছেন: "আব্দুল্লাহ বেগ খান ছিলেন একজন সাহসী সেনানী। কিন্তু অতি অল্প বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, যে মৃত্যু তাঁর পরিবারকে এক চরম দুরবস্থায় ফেলে দেয়।" (হালী, ১৮৯৭: ৬) গালিব নিজে পিতাকে নিয়ে খুব বেশি কিছু লেখেননি সম্ভবত কারণ, পিতার মৃত্যুর সময় তিনি এতটাই ছোট ছিলেন যে, পিতার কোনো স্পষ্ট স্মৃতি তাঁর ছিল না। তবু, পিতৃহীনতার এই অভিজ্ঞতা গালিবের চরিত্রে গভীর ছাপ ফেলেছিল, যা পরবর্তীকালে তাঁর পুত্রশোকের বেদনায় আরও ঘনীভূত হয়েছিল।

চাচা নসরুল্লাহ বেগ খান: প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা

পিতার মৃত্যুর পর গালিব ও তাঁর ভাইবোনদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন চাচা নসরুল্লাহ বেগ খান। নসরুল্লাহ বেগ ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর একজন সুবেদার (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার)। তিনি আগ্রায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানেই গালিবের শৈশব কাটে।

নসরুল্লাহ বেগ সম্পর্কে গালিবের স্মৃতি ছিল তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল। চাচা ছিলেন একজন স্নেহশীল অভিভাবক, যিনি ভাইপোদের যথাসাধ্য ভালো রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস গালিবের যখন বয়স নয় বছর (১৮০৬ সালের দিকে), তখন নসরুল্লাহ বেগও এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি একটি হাতির পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় হাতিটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। এই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হাতি থেকে পড়ে মৃত্যু এই ঘটনাটি নিছক একটি দুর্ঘটনার বিবরণ নয়, বরং এটি যেন এক প্রতীক। হাতি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি, গৌরব ও ক্ষমতার প্রতীক। মুঘল সম্রাটরা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধে যেতেন, শোভাযাত্রা করতেন। সেই হাতিই এখন হয়ে উঠেছে মৃত্যুর কারণ এ যেন মুঘল যুগেরই করুণ পরিণতির এক রূপক। নারঙ এই ঘটনার প্রতীকী তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন: "গালিবের চাচার মৃত্যু যেন সেই যুগেরই মৃত্যু, যে যুগে মুঘল বীরত্ব ও গৌরব হাতির মতো বিশাল ছিল, কিন্তু এখন সেই হাতিই নিয়ন্ত্রণহীন ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ১৭৯)

চাচার মৃত্যুর পর গালিব ও তাঁর ভাইবোনেরা সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়েন। পরিবারে আর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অভিভাবক রইল না। এই শৈশবের পরপর দুটি অভিভাবকহানি প্রথমে পিতা, পরে চাচা গালিবের মনে এক গভীর নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার বীজ বপন করেছিল, যা পরবর্তী জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অংশ হয়ে ওঠে।

বংশগৌরব ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব

গালিবের জীবনের একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব ছিল এই যে, তিনি নিজেকে এক উচ্চ বংশের, মধ্য এশীয় যোদ্ধা-বংশের উত্তরাধিকারী মনে করতেন কিন্তু বাস্তবে তিনি ছিলেন এক নিঃস্ব অনাথ, যাঁকে অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব গালিবের মধ্যে

তৈরি করেছিল এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যাকে মনোবৈজ্ঞানিকেরা বলেন 'কম্পেনসেশন' বা ক্ষতিপূরণমূলক আচরণ নিজের প্রকৃত দারিদ্র্য ও অসহায়তাকে ঢাকার জন্য গালিব এক ধরনের উচ্চাভিজাত্য, আত্মঅহংকার ও কখনো কখনো দাম্ভিকতার মুখোশ পরতেন।

রাসেল এ বিষয়ে লিখেছেন: "গালিবের আত্মঅহংকার, যা অনেক সময় তাঁর সমসাময়িকদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠত, তা আসলে ছিল এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল। যে মানুষ বাস্তবে পেনশনের জন্য লর্ডদের কাছে মিনতি করে বেড়াচ্ছেন, তিনি যদি একই সঙ্গে নিজের বংশগরিমা ও কাব্যশ্রেষ্ঠতার অহংকার না করেন, তাহলে তাঁর পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১৪৫)

এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ আমরা গালিবের কবিতায়ও দেখতে পাই। একদিকে তিনি লেখেন: "হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়" এখানে তিনি নিজেকে ধর্মীয় রীতিনীতির ঊর্ধ্বে এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করছেন। অন্যদিকে আবার তাঁর চিঠিগুলি পড়লে দেখা যায়, তিনি কত নিচু স্বরে, কত বিনীতভাবে পৃষ্ঠপোষকদের কাছে অর্থসাহায্য চাইছেন। এই দুই গালিবের মধ্যে যে বৈপরীত্য, তা বোঝা না গেলে গালিবের ব্যক্তিত্ব ও কাব্যের পুরো সত্য বোঝা যায় না।

পারিবারিক ভাতা ও আজীবন আইনি লড়াই

পেনশনের উৎস ও ইতিহাস

গালিবের জীবনের একটি ধ্রুবক ছিল অর্থকষ্ট, এবং এই অর্থকষ্টের কেন্দ্রে ছিল একটি পারিবারিক পেনশন বা ভাতা, যার জন্য তাঁকে জীবনভর লড়াই করতে হয়েছিল। এই পেনশনের উৎস বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে গালিবের চাচা নসরুল্লাহ বেগের চাকরিতে।

নসরুল্লাহ বেগ ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর একজন সুবেদার। কোম্পানির সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত ভারতীয় সেনা ও কর্মকর্তাদের জন্য কিছু পেনশন ও ভাতার ব্যবস্থা ছিল, যা চাকুরিরত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারকে দেওয়া হতো। নসরুল্লাহ বেগের মৃত্যুর পর এই ভাতা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা অর্থাৎ তাঁর বিধবা স্ত্রী, পুত্র (যদি থাকে) এবং ভাইপো গালিব ও তাঁর ভাই ইউসুফ।

কিন্তু এই ভাতা নিয়মিত পাওয়া যায়নি। কোম্পানির আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি, এবং গালিবের পরিবারের রাজনৈতিক প্রভাবের অভাবে এই ভাতা প্রথমে বন্ধ হয়ে যায়, পরে অনিয়মিত হয়। গালিব যখন বড় হয়ে এই ভাতার জন্য লড়াই শুরু করেন, তখন তিনি এক অতিকায় আমলাতান্ত্রিক দানবের মুখোমুখি হন।

পেনশনের লড়াই: আগ্রা থেকে কলকাতা

চাচার মৃত্যুর পর গালিবের পরিবার আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে। পরিবারের উপার্জনের প্রধান উৎস ছিল এই পেনশন, আর সেটি যখন বন্ধ বা অনিয়মিত হলো, তখন অবস্থা চরমে পৌঁছল। গালিব প্রথমে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন, তারপর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে গালিব এক সাহসী সিদ্ধান্ত নেন তিনি সরাসরি কলকাতায় যাবেন, কোম্পানির সদর দপ্তরে, এবং স্বয়ং গভর্নর-জেনারেলের কাছে নিজের আবেদন পেশ করবেন। ১৮২৭ সালে এই সফরের পরিকল্পনা করেন তিনি, এবং ১৮২৮ সালে আগ্রা থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন।

আজমি লিখেছেন: "কলকাতা যাত্রা গালিবের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এই যাত্রায় তিনি একদিকে যেমন নিজের পেনশনের আবেদন পেশ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কোম্পানির রাজধানীর আধুনিকতা, ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, এবং দিল্লি-আগ্রার সংকীর্ণ সীমানার বাইরের এক বিশাল ভারতবর্ষ।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৫৫)

গালিব কলকাতায় প্রায় দুই বছর (১৮২৮-১৮২৯) অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে একাধিক আবেদন পেশ করেন। তাঁর আবেদনের মূল যুক্তি ছিল: (ক) তাঁর চাচা কোম্পানির সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছেন, (খ) তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার পেনশনের অধিকারী, (গ) গালিব ও তাঁর ভাই সেই পরিবারের উত্তরাধিকারী, অতএব (ঘ) তাঁদের পেনশন দেওয়া হোক।

কিন্তু কোম্পানির আমলাতন্ত্র ছিল জটিল ও ধীরগতির। গালিবের আবেদন এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ঘুরতে থাকে। একসময় সিদ্ধান্ত হয় যে, পেনশনের পরিবর্তে গালিবকে একটি এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে, কিন্তু নিয়মিত পেনশন দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্তে গালিব সন্তুষ্ট হননি, কিন্তু উপায়ও ছিল না।

পেনশনের মনস্তত্ত্ব

এই পেনশনের লড়াই কেবল আর্থিক বিষয় ছিল না, বরং এর একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক তাৎপর্য ছিল। পেনশনের দাবি ছিল এক ধরনের স্বীকৃতির দাবি এই স্বীকৃতি যে, গালিবের পরিবার একসময় কোম্পানির সেবা করেছে, এবং সেই সেবার মূল্য আছে। পেনশন বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল শুধু অর্থের ক্ষতি নয়, বরং মর্যাদার ক্ষতি। গালিবের মতো একজন মানুষ, যিনি নিজের বংশগত গৌরব নিয়ে এত সচেতন, তাঁর কাছে এই মর্যাদার ক্ষতি ছিল অর্থনৈতিক ক্ষতির চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক।

এক চিঠিতে গালিব লিখেছিলেন: "এই পেনশন আমার জন্য রুটির প্রশ্ন নয়, ইজ্জতের প্রশ্ন। আমি যদি ভিখারি হতাম, তাহলে ভিক্ষা চাইতাম। কিন্তু আমি ভিখারি নই, আমি একজন বেগ, একজন খাঁ, একজন সম্ভ্রান্ত বংশের উত্তরাধিকারী। আমার প্রাপ্য আমি চাই, ভিক্ষা নয়।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৫২)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, পেনশনের প্রশ্নটি গালিবের কাছে ছিল আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। তিনি নিজেকে 'ভিখারি' মনে করতে রাজি ছিলেন না; তিনি মনে করতেন, তাঁর প্রাপ্য অধিকার তিনি চাইছেন মাত্র। কিন্তু কোম্পানির আমলারা সম্ভবত তেমন সূক্ষ্ম পার্থক্য করতেন না। তাঁদের কাছে গালিব ছিলেন অসংখ্য আবেদনকারীর একজন, যাঁদের দাবি আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা হবে এবং হয় গৃহীত হবে, নয় প্রত্যাখ্যাত হবে।

পেনশন-লড়াইয়ের গালিবের কাব্যে প্রতিফলন

এই পেনশনের লড়াই এবং সংশ্লিষ্ট অর্থকষ্টের সরাসরি প্রতিফলন গালিবের কাব্যে সেভাবে পাওয়া যায় না, যেভাবে পাওয়া যায় তাঁর চিঠিপত্রে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যেও প্রবেশ করেছে বিশেষ করে ক্ষমতা, মর্যাদা, প্রাপ্য-অপ্রাপ্য ইত্যাদি বিষয়ের দার্শনিক ভাবনায়। যখন তিনি লেখেন:

بندگی میں بھی وہ آزاد و □ود بیں ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے درِ کعبہ سے گر وا نہ ہوا

বন্দেগী মেঁ ভি ওহ আজাদ-ও-খুদ-বীঁ হ্যায় কে হম
উল্টে ফির আয়ে দর-এ-কাবা সে গর ওয়া না হুয়া

(দাসত্বের মধ্যেও আমরা এত স্বাধীন ও আত্মদর্শী যে, কাবার দরজা থেকে ফিরে আসব, যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হয়।)

এই শেরে যে দাসত্বের মধ্যেও স্বাধীনতার দাবি, প্রার্থনা পূর্ণ না হলে প্রত্যাখ্যানের স্পর্ধা এগুলি হয়তো গালিবের পেনশনের জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন ও প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতারই সূক্ষ্ম রূপান্তর। আত্মমর্যাদাবোধ, যা বাস্তব জীবনে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল, তা কাব্যে ফিরে আসে আরও শক্তিশালী হয়ে।

পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও পেনশন

গালিব ছাড়াও তাঁর ভাই মির্জা ইউসুফ খানও পেনশনের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু ইউসুফ মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন (গালিবের চিঠিতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়), এবং পেনশনের জন্য কার্যকর লড়াই করার মতো অবস্থায় তিনি ছিলেন না। ফলে পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে গালিবের ওপর। গালিবকে একাই পরিবারের হয়ে আমলাতান্ত্রিক লড়াই লড়তে হয়েছিল, এবং এই একলা লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও তাঁর ব্যক্তিত্বে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

জন্ম ও নিয়তির দ্বন্দ্ব

গালিবের জন্ম ও বংশপরিচয়ের এই অধ্যায় শেষ করবার আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার: গালিবের জীবনের এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাগুলি উচ্চ বংশের গৌরব ও বাস্তবের দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব, পিতৃহীনতা, চাচার আকস্মিক মৃত্যু, পেনশনের জন্য জীবনভর লড়াই এই সবকিছু মিলে তৈরি করেছিল এক বিশেষ মানসিকতা, যা পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান জ্বালানি হয়ে ওঠে।

তিনি যখন লেখেন "না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা," তখন সেই 'না থা কুছ'-এর মধ্যে কি তাঁর শৈশবের নিঃস্বতা কাজ করে? তিনি যখন লেখেন "ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে," তখন সেই 'হোনে'-র যন্ত্রণা কি সেই অনিশ্চিত অস্তিত্বের, যে অস্তিত্ব পেনশনের অনিয়মিত ভাতার ওপর নির্ভরশীল? এই প্রশ্নগুলির সরাসরি উত্তর হয়তো নেই, কিন্তু গালিবের কাব্যের গভীরে যে এক দার্শনিক নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে, তার উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরতে হবে এই প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতার কাছে।

নির্বাচিত শের: জন্ম ও বংশপরিচয়ের অনুষঙ্গে

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি যদি নিজের জীবনের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন আপনার জন্মস্থান, আপনার বংশপরিচয়, আপনার পিতামাতা ও অভিভাবকদের জীবনের গল্প কীভাবে আপনার ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা নিজেরাই নিজেদের তৈরি করেছি। কিন্তু বাস্তবে আমাদের ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রচিত হয় আমাদের জন্মের আগেই আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, আমাদের পরিবারের আর্থিক-সামাজিক অবস্থান, আমাদের শৈশবের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। গালিবের জীবন এই সত্যের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্য যে, এই ভিত্তির ওপর আমরা কী নির্মাণ করব, তা আমাদের নিজের হাতে। গালিব যদি তাঁর বংশগত গৌরব ও বাস্তবের দারিদ্র্যের দ্বন্দ্বকে কেবলই ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য হিসেবে দেখতেন, তাহলে তিনি হয়তো এক সাধারণ অসন্তুষ্ট মানুষ হয়েই থেকে যেতেন। কিন্তু তিনি সেই দ্বন্দ্বকে রূপান্তরিত করলেন কাব্যে, দর্শনে, শিল্পে। এই রূপান্তরের ক্ষমতাই তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে মহান কবি করে তুলল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে শিশু আসাদউল্লাহ খাঁ ধীরে ধীরে 'মির্জা গালিব' হয়ে উঠছিলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের গল্প, যে গল্প একই সঙ্গে এক প্রতিভার বিকাশের ইতিহাস এবং একটি সমগ্র যুগের পরিবর্তনের আখ্যান।

অধ্যায় ৫: বাল্য, কৈশোর ও দিল্লি যাত্রা

শূন্য থেকে সৃষ্টির আরম্ভ

মানুষের জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় অধ্যায় হল তার শৈশব ও কৈশোর। এই সময়টিতে মানুষ একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি অসহায় এবং সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। গালিবের ক্ষেত্রে এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যে শিশুটি চার বছর বয়সে পিতাকে হারিয়েছে, নয় বছর বয়সে হারিয়েছে চাচাকে সেই শিশুটি বড় হয়ে কী করে হয়ে উঠলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের গভীরভাবে প্রবেশ করতে হবে গালিবের বাল্য ও কৈশোরের জগতে যে জগৎ একই সঙ্গে বঞ্চনার ও সম্ভাবনার, অন্ধকারের ও আলোর।

গালিব নিজে কখনোই নিজেকে কোনো গুরুর শিষ্য বলে মানেননি। বরং তিনি গর্ব করে বলতেন, "আমার ওস্তাদ কে? আমি নিজেই নিজের ওস্তাদ।" কিন্তু এই স্ব-শিক্ষিত প্রতিভার পেছনে যে এক অদম্য আত্মবিশ্বাস, এক অতলান্ত জ্ঞানপিপাসা এবং এক বিরল স্মৃতিশক্তি কাজ করছিল, তারই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাল্য ও কৈশোরের ইতিহাসে। ড. গোপী চাঁদ নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের স্ব-শিক্ষিত প্রতিভা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, ছিল এক অপরিহার্যতা। যে পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন, যে সংকটের মধ্যে তিনি পড়েছিলেন, তাতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অসম্ভব ছিল। কিন্তু প্রকৃতি যেন সেই অভাব পূরণ করে দিয়েছিল এক অসামান্য মেধা ও আত্মপ্রত্যয় দিয়ে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ১৮১)

স্বশিক্ষিত এক প্রতিভা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব ও তার কারণ

গালিবের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল প্রায় শূন্য। আলতাফ হোসেন হালী তাঁর "ইয়াদগার-এ-গালিব" গ্রন্থে লিখেছেন: "মির্জা গালিব কখনো কোনো মক্তব বা মাদ্রাসায় নিয়মিত শিক্ষা লাভ করেননি। তাঁর পিতার অকালমৃত্যু ও চাচার আকস্মিক প্রয়াণের পর পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, ছেলেমেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না।" (হালী, ১৮৯৭: ৮) প্রকৃতপক্ষে, পিতা আব্দুল্লাহ বেগ যখন মারা যান, গালিবের বয়স মাত্র চার বছর। চাচা নসরুল্লাহ বেগ যখন প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন, তখনো নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। চাচা নিজে সেনাবাহিনীর সুবেদার ছিলেন, বিদ্বান নন; ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক রাখার সামর্থ্যও হয়তো ছিল না।

খলিলুর রহমান আজমি এই শিক্ষাহীনতার পেছনে আরেকটি কারণের ইঙ্গিত দিয়েছেন: "গালিবের পরিবারে শিক্ষার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যার ওপর বেশি জোর দেওয়া হতো। এঁরা ছিলেন সেনানী বংশের মানুষ। অশ্বচালনা, তলোয়ার চালনা, তীর নিক্ষেপ এসবই ছিল তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য। গালিবের পিতা ও চাচা বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁকেও সেনাবাহিনীতে পাঠানো হতো, শিক্ষার জন্য নয়।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৭) অর্থাৎ, গালিব যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তা তাঁর পরিবারের পেশাগত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং সামঞ্জস্যপূর্ণই ছিল পার্থক্য শুধু এই যে, তিনি শিক্ষার অভাবকে এক অনন্যসাধারণ উপায়ে পূরণ করেছিলেন।

গালিব নিজে কখনো কখনো নিজের অশিক্ষা নিয়ে কৌতুক করতেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "লোকে বলে, আমি নাকি বিদ্বান। অথচ সত্যি বলতে কী, আমি কোনোদিন কোনো ওস্তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসিনি। মক্তবের দোরগোড়া পর্যন্ত যাইনি। কিন্তু আল্লাহ আমাকে এমন এক মগজ দিয়েছেন, যেখানে যা একবার ঢোকে, আর বেরোয় না।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৬৫) এই কৌতুকের আড়ালে যে গভীর আত্মবিশ্বাস লুকিয়ে ছিল, সেটাই পরবর্তীকালে গালিবের ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে।

"আমার ওস্তাদ কে? আমি নিজেই নিজের ওস্তাদ"

গালিবের এই বিখ্যাত উক্তিটি উর্দু সাহিত্যে প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কথিত আছে, একবার এক মুশায়রায় একজন কবি গালিবকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মির্জা সাহেব, আপনার ওস্তাদ কে?" গালিব নাকি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন: "মেরা ওস্তাদ কৌন? ম্যায় খুদ আপনা ওস্তাদ হুঁ।" (আমার ওস্তাদ কে? আমি নিজেই নিজের ওস্তাদ।)

এই উক্তিটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ঘটনাটি পুরোপুরি সত্য; কেউ বলেন, ঘটনাটি পরে গালিব-কাহিনিতে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সত্যতা যাই হোক, এই উক্তিটি গালিবের আত্মধারণার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। রালফ রাসেল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গালিবের এই আত্মপ্রত্যয়, এই নিজেকে নিজের গুরু বলে ঘোষণা, উর্দু কাব্যের ইতিহাসে এক অভাবিতপূর্ব ঘটনা। উর্দু

কাব্যচর্চায় ওস্তাদ-শাগরেদ পরম্পরা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন কবি যে কিনা সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত এবং তবু অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই ধারণা তখনকার সমাজে প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৬৬)

আসলে গালিবের এই আত্মবিশ্বাস নিছক দাম্ভিকতা ছিল না, বরং ছিল এক বাস্তবতার স্বীকৃতি। সত্যিই তাঁর কোনো প্রথাগত ওস্তাদ ছিল না। কিন্তু যে সমাজে ওস্তাদ ছাড়া কবি হওয়া অসম্ভব বলে মনে করা হতো, সেখানে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে এই ধরনের চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। এটি ছিল এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল, যা গালিবের সমগ্র জীবনে নানা রূপে দেখা যায়।

ফার্সি-আরবি ঘরে বসে শেখা

গালিব কীভাবে, কার কাছে শিখেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষকেরা কিছু তথ্য পেয়েছেন, যদিও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। জানা যায়, গালিবের যখন বয়স এগারো-বারো, তখন আগ্রায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত একজন ইরানি পন্ডিত আবদুস সামাদ নামে এক ব্যক্তি কিছুদিন গালিবকে ফার্সি ও আরবি পড়িয়েছিলেন। হালী লিখেছেন: "মির্জা গালিব কিছুদিন আবদুস সামাদ ইরানির কাছে ফার্সি ও আরবির প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা ছিল খুবই স্বল্পস্থায়ী এবং অনিয়মিত। আবদুস সামাদ শীঘ্রই আগ্রা ছেড়ে চলে যান, এবং তারপর আর কোনো শিক্ষকের কাছে গালিব যাননি।" (হালী, ১৮৯৭: ৯)

এই স্বল্পস্থায়ী শিক্ষাই ছিল গালিবের সমগ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এরপর যা কিছু তিনি শিখেছিলেন, তা নিজের চেষ্টায়, নিজের পড়াশোনার মাধ্যমে। গালিবের অসম্ভব স্মৃতিশক্তি ও আত্মনিবেদিত অধ্যয়নই ছিল তাঁর প্রকৃত শিক্ষক। আজমি বলেছেন: "গালিব ফার্সি, আরবি ও তুর্কি ভাষায় এমন পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, যা দেখে যে কেউ মনে করতেন তিনি বছরের পর বছর কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত পান্ডিত্য, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৯)

কীভাবে তিনি এই স্বশিক্ষা লাভ করেছিলেন? গালিবের নিজের ভাষায়, তিনি "রাত জেগে পড়তেন"। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "আমার যৌবনে আমি এত পড়তাম যে, এখনো সেই অভ্যাস গেছে না। রাতের পর রাত প্রদীপ জ্বেলে পড়ে কাটাতাম। ফার্সি কবিদের দিওয়ান মুখস্থ করতাম। আরবি ব্যাকরণ কষতাম। তুর্কি ভাষার চর্চা করতাম। কেউ ছিল না আমাকে পড়াতে, কেউ ছিল না উৎসাহ দিতে। নিজের আগ্রহই ছিল আমার একমাত্র শিক্ষক।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৬৮)

অসম্ভব স্মৃতিশক্তি ও সাহিত্যপাঠ

গালিবের স্মৃতিশক্তি ছিল কিংবদন্তিতুল্য। কথিত আছে, তিনি একবার পড়লে কোনো কবিতা বা গদ্যাংশ ভুলতেন না। সমগ্র ফার্সি ও উর্দু কাব্যের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে ছিল। হাজার হাজার শের তিনি আবৃত্তি করতে পারতেন। হালী লিখেছেন: "মির্জা গালিবের স্মৃতিশক্তি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। অসংখ্য ফার্সি ও উর্দু কবির সম্পূর্ণ দিওয়ান তাঁর মুখস্থ ছিল। কোনো মুশায়রায় কেউ যদি কোনো কবির শের উদ্ধৃত করতেন, গালিব তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারতেন শেরটি কার, কোন দিওয়ানের, কোন অংশ থেকে নেওয়া।" (হালী, ১৮৯৭: ১২)

এই স্মৃতিশক্তি ছিল গালিবের স্বশিক্ষার অন্যতম সহায়ক। প্রথাগত শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক হয়েছিলেন, আর তাঁর পাঠ্যপুস্তক ছিল ফার্সি ও উর্দু কবিদের দিওয়ান, আরবি সাহিত্যের গ্রন্থাবলি, তুর্কি ভাষার রচনা। তিনি পড়তেন, মুখস্থ করতেন, এবং তারপর সেই সমস্ত পড়া নিজের মনের গহনে জমা করে রাখতেন, যেখান থেকে পরবর্তীকালে যখন প্রয়োজন হতো, অকাতরে বের করে আনতেন।

কিন্তু গালিবের স্বশিক্ষা শুধু মুখস্থ করাই ছিল না, ছিল গভীর সমঝদারি ও বিশ্লেষণ। তিনি যা পড়তেন, তা নিয়ে ভাবতেন, তার সঙ্গে নিজের চিন্তার সংঘাত ঘটাতেন, পুরনোকে প্রশ্ন করতেন, নতুনকে আবিষ্কার করতেন। রাসেল বলেছেন: "গালিবের স্বশিক্ষা ছিল নিষ্ক্রিয় গ্রহণ নয়, বরং সক্রিয় সমালোচনা। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের অন্ধভাবে নকল করেননি, বরং তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেন, তাঁদের প্রশ্ন করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের অতিক্রম করেছেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৭১)

প্রথম কাব্যচর্চা ও ছদ্মনামের ইতিহাস

গালিব খুব অল্প বয়সেই কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। কিছু সূত্র মতে, মাত্র দশ-এগারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথমে তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন, পরে উর্দুতেও লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যিক ছদ্মনাম ছিল 'আসাদ' (অর্থ: সিংহ), যা তাঁর প্রকৃত নাম 'আসাদউল্লাহ খাঁ' (আল্লাহর সিংহ) থেকে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি 'গালিব' (অর্থ: বিজয়ী, প্রবল) ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

ছদ্মনাম পরিবর্তনের পেছনে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একবার এক মুশায়রায় গালিব 'আসাদ' ছদ্মনামে কবিতা পড়ছিলেন, এমন সময় আরেকজন কবি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে 'আসাদ' নামে আরও কয়েকজন কবি আছেন, এবং গালিবের কবিতার সঙ্গে তাঁদের কবিতার বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। এই কথা শুনে গালিব নাকি বলেন, "তাহলে আজ থেকে আমি 'গালিব'। কারণ, এই নামে আমি একাই থাকব, আর কেউ এই নাম নিতে সাহস করবে না।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩২)

এই কাহিনির ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, একটি বিষয় স্পষ্ট: গালিব তাঁর ছদ্মনাম নির্বাচনের মাধ্যমেও নিজের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। 'আসাদ' নামটি ছিল তাঁর পৈতৃক নামের সংক্ষেপ, অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু 'গালিব' নামটি ছিল তাঁর নিজের নির্বাচিত, নিজের জয় করা ঠিক যেমন তাঁর কাব্য ছিল নিজের অর্জিত, নিজের সৃষ্ট, কারও অনুসরণ নয়।

আগ্রার সাহিত্যজগৎ ও তরুণ গালিব

আগ্রায় গালিবের বাল্য ও কৈশোর কাটলেও, সেখানকার সাহিত্যজগৎ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, তা নিয়ে খুব বেশি তথ্য নেই। তবে ধারণা করা যায়, আগ্রা তখনো একটি সাংস্কৃতিক শহর হিসেবে কিছুটা সক্রিয় ছিল, এবং সেখানকার মুশায়রা ও সাহিত্যসভাগুলির সঙ্গে তরুণ গালিবের পরিচয় ঘটেছিল। এই পরিচয়ই তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিল নিজের কবিতা প্রকাশ্যে পড়ার, নিজের প্রতিভা পরীক্ষা করার।

হালী লিখেছেন: "আগ্রায় গালিব প্রথম মুশায়রায় কবিতা পড়ে সকলকে চমকে দেন। উপস্থিত কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি যে এত অল্প বয়সের একটি ছেলে এমন পরিণত কবিতা লিখতে পারে। কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন, ছেলেটি হয়তো অন্য কারও কবিতা চুরি করে পড়ছে। কিন্তু গালিব তৎক্ষণাৎ আরও কয়েকটি কবিতা পড়ে সবাইকে নিরুত্তর করে দেন।" (হালী, ১৮৯৭: ১৫)

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, গালিবের কাব্যপ্রতিভা অত্যন্ত অল্প বয়সেই প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাও এমন জোরালোভাবে যে, সন্দেহপ্রবণ প্রাপ্তবয়স্ক কবিদেরও মুখ বন্ধ করে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনে এসেছিল আরেকটি বড় পরিবর্তন বিবাহ, যা তাঁর সমগ্র ভবিষ্যৎকে এক ভিন্ন দিকে মোড় নিতে বাধ্য করেছিল।

প্রথম বিয়ে ও আগ্রা ত্যাগ

বিয়ের পটভূমি ও শর্তাবলি

১৮১০ সালে, যখন গালিবের বয়স মাত্র তেরো বছর, তাঁর বিয়ে হয় নবাব ইলাহী বখশ খানের কন্যা উমরাও বেগমের সঙ্গে। উমরাও বেগমের বয়স তখন মাত্র এগারো বছর। সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সমাজে অল্প বয়সে বিয়ে অস্বাভাবিক ছিল না, বিশেষ করে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতে। তবু, গালিবের বিয়েটি ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি ছিল একাধারে একটি সামাজিক চুক্তি ও একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

গালিবের পরিবার তখন আর্থিকভাবে অত্যন্ত অসচ্ছল। নবাব ইলাহী বখশ ছিলেন দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি। এই বিয়ের মাধ্যমে গালিবের পরিবার নবাবের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কিছু আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করবে, এমনটাই আশা করা হয়েছিল। রাসেল লিখেছেন: "গালিবের বিয়ে ছিল সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার ফল, যেখানে কনের পিতার ধনসম্পদ ও বরের বংশগৌরবের মধ্যে এক ধরনের বিনিময় ঘটেছিল। এই ধরনের বিবাহ তখনকার অভিজাত মুসলিম সমাজে খুবই সাধারণ ছিল।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৭৫)

কিন্তু এই বিনিময়ের ফলাফল কোনো পক্ষের জন্যই সুখের হয়নি। গালিব সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছেন, তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে যে আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশিত ছিল, তা হয়তো আশানুরূপ আসেনি। অন্যদিকে উমরাও বেগমকে এমন এক স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটাতে হয়েছিল, যে কিনা সারাজীবন দারিদ্র্য ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে ডুবে ছিল এবং যার সঙ্গে তাঁর মানসিক বোঝাপড়া কখনো গভীর হয়নি।

দাম্পত্য সম্পর্কের চরিত্র

গালিব ও উমরাও বেগমের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে গালিবের চিঠিপত্রে নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় এই সম্পর্ক ছিল জটিল, দূরত্বপূর্ণ এবং অনেকটাই কর্তব্যসর্বস্ব। গালিব কখনো সরাসরি স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা লেখেননি, বরং প্রায়ই তাঁর রক্ষণশীলতা, ধর্মপরায়ণতা ও সীমিত বুদ্ধির প্রতি এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিত করেছেন।

এক বিখ্যাত চিঠিতে গালিব লিখেছিলেন: "আমার বেগম সাহেবা মনে করেন, কবিতা লেখা মহাপাপ, আর কবি হওয়া তো নিতান্তই নাস্তিকতার লক্ষণ। তিনি সবসময় আমাকে নামাজ পড়তে বলেন, আমি তাঁকে বলি, আমার নামাজ হলো আমার কবিতা।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ১১৮) এই উক্তিতে যে হাস্যরস আছে, তার আড়ালে দাম্পত্য জীবনের গভীর দূরত্বও লুকিয়ে আছে।

আরেকটি চিঠিতে গালিব লিখেছিলেন: "আমার ঘরে আগুন লেগেছে, আমি কবিতা লিখছি। আমার বাচ্চা অসুস্থ, আমি মুশায়রায় যাচ্ছি। আমার স্ত্রী রাগ করেছেন, আমি হাসছি। এটাই আমার জীবন একই সঙ্গে জ্বলন্ত আগুন ও ফুটন্ত হাসি।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৬৮) এই লেখা থেকে স্পষ্ট যে, গালিব পারিবারিক জীবনের দাবিগুলি পূরণ করতে পারেননি বা চাননি, এবং তাঁর কাব্যচর্চার জগৎ ও পারিবারিক জগৎ ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এমনকি পরস্পরবিরোধী।

নারঙ এই দাম্পত্য সম্পর্কের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন: "গালিবের কাব্যে প্রেমের যে এত গভীরতা, প্রেমিক হৃদয়ের যে এত বেদনা তা তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি, বরং এসেছে সেই অভাব থেকেই। গালিব হয়তো এমন এক প্রেমের কল্পনা করতেন, যে প্রেম বাস্তবে সম্ভব নয়, এবং তাঁর কাব্যে সেই অসম্ভব প্রেমের জন্য হাহাকার ব্যক্ত হয়েছে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ১৯২)

নবাব ইলাহী বখশ ও শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক

নবাব ইলাহী বখশ ছিলেন দিল্লির এক ধনী ও প্রভাবশালী অভিজাত। তিনি ছিলেন আহমদ শাহ দুররানির সময়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং দিল্লির অভিজাত সমাজে তাঁর ভালো অবস্থান ছিল। গালিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল, তা স্পষ্ট নয়। কিছু সূত্র ইঙ্গিত করে যে, সম্পর্কটি খুব উষ্ণ ছিল না। গালিবের দারিদ্র্য ও অনিয়মিত জীবনাচরণ হয়তো নবাবের পছন্দ ছিল না।

তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়: নবাব ইলাহী বখশের মৃত্যুর পর গালিব তাঁর শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে কার্যত কোনো আর্থিক সাহায্য পাননি। উমরাও বেগমের ভাইয়েরা সম্পত্তির হিস্যা নিয়ে গালিবের সঙ্গে কিছু বিবাদেও জড়িয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই সব ঘটনা গালিবের মনে দারিদ্র্যের তীব্র অভিজ্ঞতা ও অন্যায্য বোধকে আরও দৃঢ় করেছিল।

আগ্রা ত্যাগের কারণ ও প্রক্রিয়া

বিয়ের ঠিক পরপরই গালিব আগ্রা ছেড়ে দিল্লি চলে গিয়েছিলেন, না কি কিছুদিন আগ্রায় ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, ১৮১২ সালের দিকে গালিব স্থায়ীভাবে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। কেন তিনি আগ্রা ছেড়ে দিল্লি গেলেন? এর পেছনে কয়েকটি কারণ কাজ করেছিল।

প্রথমত, অর্থনৈতিক কারণ। আগ্রায় গালিবের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দিল্লিতে শ্বশুরবাড়ির সান্নিধ্যে থেকে হয়তো কিছু আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে, এমন আশা ছিল। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিক কারণ। দিল্লি ছিল তখনো উর্দু কাব্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র। সেখানে ছিল বাহাদুর শাহ জাফরের দরবার, ছিল অসংখ্য মুশায়রা ও সাহিত্যসভা, ছিল প্রতিভাবান কবিদের এক জীবন্ত সমাজ। আগ্রা ছিল তুলনামূলকভাবে নিষ্প্রভ। একজন উচ্চাভিলাষী তরুণ কবির পক্ষে দিল্লি ছিল স্বাভাবিক গন্তব্য।

তৃতীয়ত, পারিবারিক কারণ। পিতামাতা ও চাচার মৃত্যুর পর আগ্রায় গালিবের আর তেমন কোনো অভিভাবক ছিলেন না। দিল্লিতে স্ত্রীর পরিবার ছিল, এবং সেই সূত্রে এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার আশা ছিল। চতুর্থত, মনস্তাত্ত্বিক কারণ। গালিব আগ্রাকে শৈশবের শোক ও দারিদ্র্যের স্থান হিসেবে দেখতেন। নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি দিল্লির দিকে তাকিয়েছিলেন, এই ভেবে যে সেখানে গেলে সবকিছু বদলে যাবে। এই স্বপ্ন পরবর্তীকালে কতটা সফল হয়েছিল, তা ভিন্ন প্রশ্ন কিন্তু যাত্রার পেছনে এই স্বপ্ন অবশ্যই কাজ করেছিল।

দিল্লিতে স্থায়ী বসতি

বল্লিমারান: দিল্লির হৃদয়ে এক ছোট হাভেলি

গালিব দিল্লিতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন বল্লিমারান নামক এলাকায়, যা ছিল পুরোনো দিল্লির চাঁদনি চকের অদূরে অবস্থিত এক ঘনবসতিপূর্ণ মহল্লা। এখানে তিনি একটি ছোট হাভেলিতে বাস করতেন, যা আজ 'গালিব কী হাভেলি' নামে পরিচিত এবং একটি সংরক্ষিত ঐতিহ্য স্থাপনা।

বল্লিমারান ছিল দিল্লির এক সাধারণ মধ্যবিত্ত মহল্লা। এখানে তেমন কোনো ধনী অভিজাতের প্রাসাদ ছিল না, বরং ছিল কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী ও সাধারণ মুসলিম পরিবারের বাসস্থান। গালিবের হাভেলিটি ছিল দুইতলা, ছোট, কিন্তু দিল্লির স্থাপত্যরীতিতে

নির্মিত একটি ছোট উঠোন, কয়েকটি ঘর, একটি ছাদ, এবং নিচে বসার ঘর। এই বাড়িটিই ছিল গালিবের সারাজীবনের আশ্রয়, যে বাড়ি তিনি কখনো ছেড়ে যাননি, এমনকি যখন সামর্থ্য হলে বড় বাড়িতে যেতে পারতেন, তখনো নয়।

রাসেল এই বাড়িটির বর্ণনা দিয়েছেন: "গালিবের বল্লিমারানের বাড়িটি ছিল তাঁর দারিদ্র্যের প্রতীক এবং একই সঙ্গে তাঁর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত্তি। এই ছোট্ট হাভেলি থেকে তিনি তাঁর বিস্তৃত সাহিত্যিক জগতের দিকে তাকাতেন, এখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন সেই সব চিঠি যা উর্দু গদ্যের ইতিহাসে এক বিপ্লব এনেছিল, এখানেই তিনি রচনা করেছিলেন সেই সব গজল, যা তাঁকে অমর করেছে।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৯৫)

দিল্লিতে প্রথম বছরগুলি: অভিজ্ঞতা ও অভিঘাত

দিল্লিতে আসার পর গালিবের প্রথম বছরগুলি নিয়ে খুব বেশি তথ্য নেই। তবে ধারণা করা যায়, এই বছরগুলি ছিল একই সঙ্গে উত্তেজনাময় ও কঠিন। উত্তেজনাময় এই কারণে যে, দিল্লির সাহিত্যজগৎ ছিল আগ্রার তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত ও প্রতিযোগিতামূলক। এখানে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও মুশায়রা বসত, কবিরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন, পৃষ্ঠপোষকেরা কবিদের উৎসাহ দিতেন বা প্রত্যাখ্যান করতেন। একজন তরুণ উচ্চাভিলাষী কবির জন্য এটি ছিল এক চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আকর্ষণীয় জগৎ।

কঠিন ছিল এই কারণে যে, গালিবকে আর্থিকভাবে সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে যে সাহায্যের আশা ছিল, তা পুরোপুরি পূরণ হয়নি। পেনশনের প্রশ্নটি তখনো অমীমাংসিত ছিল। গালিবকে একই সঙ্গে সংসার চালাতে হতো এবং নিজের কাব্যচর্চা চালিয়ে যেতে হতো। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করা কঠিন ছিল, এবং গালিবের জীবনে এই কঠিনতা সর্বদাই বিদ্যমান থেকেছে।

এক চিঠিতে গালিব দিল্লিতে প্রথম বছরগুলির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছিলেন: "দিল্লিতে এসে আমি প্রথম প্রথম খুব একা বোধ করতাম। আগ্রায় যেমন ছিলাম, এখানে তেমন কেউ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার কবিতা মানুষ চিনতে শুরু করল, মুশায়রায় ডাক পড়তে লাগল। তখন বুঝলাম, এই শহরই আমার ঠিকানা।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ২১)

বল্লিমারানের হাভেলি: এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ধীরে ধীরে গালিবের বল্লিমারানের ছোট হাভেলিটি হয়ে উঠেছিল দিল্লির সাহিত্যজগতের এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনকেন্দ্র। এখানে নিয়মিত আসতেন কবি, শিল্পী, চিন্তাবিদ, বন্ধুরা। ছোট্ট উঠোনটিতে বসত আড্ডা, চলত কবিতাপাঠ, তর্ক-বিতর্ক, হাসিঠাট্টা। গালিবের চিঠিপত্রে এই আড্ডাগুলির প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

আজমি লিখেছেন: "গালিবের হাভেলি ছিল দিল্লির বুদ্ধিজীবী সমাজের এক অন্যতম পীঠস্থান। শুধু কবিরা নন, সঙ্গীতশিল্পী, সুফি সাধক, চিত্রকর, এমনকি রাজনীতির লোকেরাও এখানে আসতেন। গালিব ছিলেন এই আড্ডার প্রাণপুরুষ। তাঁর রসিকতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিপুল জ্ঞানের পরিসর সকলকে মুগ্ধ করত।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৩৫)

এই হাভেলি থেকেই গালিব ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান তৈরি করেছিলেন দিল্লির সাংস্কৃতিক জগতে। কিন্তু এই অবস্থান কখনোই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে রূপান্তরিত হয়নি। গালিব সারাজীবন ধার করে, দেনা করে, পৃষ্ঠপোষকদের অনুদানের ওপর নির্ভর করে বেঁচে ছিলেন। বল্লিমারানের হাভেলিটি ছিল তাঁর একমাত্র স্থায়ী সম্পদ, এবং সেটিও ছিল জীর্ণ, মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়া।

দিল্লি বনাম আগ্রা: দুই শহরের তুলনা

গালিবের জীবনে দুই শহর আগ্রা ও দিল্লি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আগ্রা ছিল তাঁর জন্মস্থান, শৈশবের শহর, পৈতৃক স্মৃতির শহর। দিল্লি ছিল তাঁর কর্মস্থল, পরিণত জীবনের শহর, সাহিত্যিক পরিচয়ের ভিত্তি। এই দুই শহরের মধ্যে তুলনা করে গালিব এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আগ্রা আমার মা, দিল্লি আমার প্রণয়িনী। মায়ের কাছে পেয়েছি জীবন, প্রণয়িনীর কাছে পেয়েছি পরিচয়।"

এই তুলনার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য লুকিয়ে আছে। আগ্রা ছিল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার শহর, যে শহর তাঁকে জন্ম দিয়েছে, প্রতিপালন করেছে। কিন্তু দিল্লি ছিল সেই শহর, যেখানে গালিবকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে, যে শহর তাঁকে চিনেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে যেমন একজন প্রণয়িনী চেনে, স্বীকৃতি দেয়। এই পার্থক্যটি গালিবের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি একদিকে জন্মসূত্রে পাওয়া পরিচয়, অন্যদিকে নিজের অর্জিত পরিচয়। গালিব দুই পরিচয়কেই গুরুত্ব দিতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যা হয়েছেন, তা দিল্লিরই অবদান।

অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনার মধ্যবর্তী এক তরুণ

গালিবের বাল্য, কৈশোর ও দিল্লি যাত্রার এই অধ্যায় শেষ করার সময় আমরা যদি পেছনে তাকাই, দেখতে পাব এক তরুণকে পিতৃহীন, স্বশিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ অথচ অর্থকষ্টে জর্জরিত। এই তরুণের সামনে রয়েছে এক বিশাল অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তিনি দিল্লি এসেছেন বড় স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হবে কি না, তা জানা ছিল না। তিনি বিয়ে করেছেন, কিন্তু সেই বিয়ে সুখের হবে কি না, তাও অনিশ্চিত। তিনি কবিতা লিখছেন, কিন্তু সেই কবিতা পৃথিবী গ্রহণ করবে কি না, তাও অজানা।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই নিহিত ছিল গালিবের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা। কারণ অনিশ্চয়তাই মানুষকে সৃষ্টিশীল করে। যে মানুষ জানে তার ভবিষ্যৎ কী, সে আর নতুন কিছু সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভব করে না। কিন্তু গালিব কিছুই জানতেন না। তিনি কেবল জানতেন, তাঁর মধ্যে কিছু আছে, যা প্রকাশ চায় সেটাই তাঁর একমাত্র পুঁজি। এবং সেই পুঁজি নিয়েই তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন দিল্লির জীবনে।

নির্বাচিত শের: বাল্য, কৈশোর ও যাত্রার অনুষঙ্গে

ہم کو ا□ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر □واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, একজন তেরো বছরের বালক যে কিনা পিতৃহীন, আর্থিকভাবে অসহায়, প্রথাগত শিক্ষাবঞ্চিত সে কী করে এত বড় কবি হয়ে উঠল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে গালিবের সেই অদম্য আত্মবিশ্বাস ও জ্ঞানপিপাসার মধ্যে। যে মানুষ নিজেকে নিজের গুরু ভাবতে পারে, যে মানুষ রাত জেগে পড়ে নিজের অজ্ঞতা দূর করতে চায়, যে মানুষ সমাজের দেওয়া সীমাবদ্ধতাকে নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অতিক্রম করতে চায় সে মানুষকে পৃথিবীর কোনো শক্তিই থামাতে পারে না।

কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দেখেছি, এই অদম্য আত্মবিশ্বাসও কতটা ভঙ্গুর এক অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। গালিবের সারাজীবনের অর্থকষ্ট, যে পেনশনের জন্য তাঁকে আমৃত্যু লড়াই করতে হয়েছে, যে দারিদ্র্য কখনো তাঁকে ছেড়ে যায়নি এগুলি তাঁর জীবনের করুণ বাস্তবতা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই বাস্তবতার আরও গভীরে প্রবেশ করব, যখন দেখব কীভাবে গালিবের দাম্পত্য জীবন, সন্তানশোক ও অর্থসংগ্রাম তাঁকে ক্রমশ এক দার্শনিক নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল এবং কীভাবে সেই নৈরাশ্যই হয়ে উঠেছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের উৎস।

অধ্যায় ৬: দাম্পত্য, সন্তানশোক ও অর্থসংগ্রাম

যে আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয় সোনা

মানুষের জীবনে সুখের স্মৃতি বিবর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু দুঃখের দাগ থেকে যায় চিরস্থায়ী হয়ে। গালিবের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই একের পর এক দুঃখ, বঞ্চনা, মৃত্যুশোক ও অর্থকষ্ট যেন নিয়তি তাঁকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এই অন্ধকারই গালিবকে দিয়েছিল সেই গভীরতা, সেই দার্শনিক দৃষ্টি, সেই জীবন্ময় বিষাদ, যা তাঁর কাব্যকে কালজয়ী করে তুলেছে। ড. গোপী চাঁদ নারঙ লিখেছেন: "গালিবের জীবনের দুঃখগুলি কেবল ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য নয়, বরং তা ছিল এক মহৎ কাব্যের কাঁচামাল। যে মানুষ দাম্পত্যে সুখী, সন্তানে পূর্ণ, অর্থে স্বচ্ছল সে মানুষ হয়তো ভালো কবি হতে পারেন, কিন্তু মহৎ কবি হতে পারেন না। মহৎ কবিতা জন্ম নেয় ক্ষত থেকে, বঞ্চনা থেকে, শোক থেকে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ২০৫)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের জীবনের তিনটি গভীর ক্ষতের কাহিনি শুনব। প্রথমত, দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প একটি বিয়ে যা ছিল কর্তব্যের, প্রেমের নয়; এক সঙ্গিনী যিনি ছিলেন ধর্মভীরু, রীতিনিষ্ঠ, প্রথাবদ্ধ, আর এক কবি যিনি ছিলেন মুক্তচিন্তক, সংশয়বাদী, স্বাধীনচেতা। দ্বিতীয়ত, সন্তানশোকের গল্প সাতটি সন্তানের জন্ম, এবং প্রত্যেকের শৈশবেই মৃত্যু; এক পিতা যিনি বারবার সন্তানের মুখাগ্নি করেছেন, যে বেদনার কোনো ভাষা হয় না। তৃতীয়ত, অর্থসংগ্রামের গল্প দারিদ্র্য, ঋণ, পেনশনের জন্য আমৃত্যু লড়াই, মদ্যপান ও জুয়ার অভ্যাস, সমাজের সমালোচনা ও আত্মগ্লানি। এই তিনটি ক্ষত মিলেই তৈরি হয়েছিল সেই মৃত্তিকা, যেখান থেকে জন্ম নিয়েছিল গালিবের অমর কাব্য।

উমরাও বেগমের সাথে সম্পর্ক

এক কর্তব্যের বিবাহ, প্রেমহীন দাম্পত্য

গালিব ও উমরাও বেগমের বিয়ে হয়েছিল ১৮১০ সালে, যখন গালিবের বয়স তেরো এবং উমরাও বেগমের এগারো। এই বিয়ে ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যবস্থাপনার ফল দুটি পরিবারের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি। কিন্তু যে বিয়ে শুরু হয়েছিল চুক্তি হিসেবে, তা কখনো প্রেমে রূপান্তরিত হয়নি। রালফ রাসেল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গালিব ও উমরাও বেগমের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল কর্তব্যের সম্পর্ক, ভালোবাসার নয়। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, গালিব কখনোই তাঁর স্ত্রীকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসেননি যেমন ভালোবাসার কথা তিনি তাঁর কাব্যে কল্পনা করতেন। উমরাও বেগম ছিলেন তাঁর সংসারের অংশ, কিন্তু কখনো তাঁর হৃদয়ের অংশ হননি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১৬৬)

কিন্তু কেন এই দূরত্ব? এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ কাজ করেছিল। প্রথমত, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিস্তর ফারাক। গালিব ছিলেন স্বশিক্ষিত প্রতিভা, বিপুল পাঠক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, এবং সমসাময়িক উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। উমরাও বেগম ছিলেন প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নন, গৃহকর্মে নিপুণ, কিন্তু সাহিত্য, দর্শন বা শিল্পের জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না। এই মানসিক ফারাক দাম্পত্য সম্পর্কের গভীরতা তৈরি হতে দেয়নি।

দ্বিতীয়ত, জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের ভিন্নতা। গালিবের জীবন ছিল কাব্যচর্চা, মুশায়রা, সাহিত্যসভা, চিঠিপত্র, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কেন্দ্রিক। উমরাও বেগমের জীবন ছিল সংসার, রান্নাবান্না, নামাজ-রোজা, পরিবারের যত্ন কেন্দ্রিক। এই দুই জীবনের মধ্যে কোনো মিলনবিন্দু ছিল না। গালিব যখন রাত জেগে কবিতা লিখতেন বা মুশায়রায় যেতেন, উমরাও বেগম তখন ঘরে একা থাকতেন, হয়তো নামাজ পড়তেন, অথবা স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতেন। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক চাপ। গালিবের সারাজীবনের অর্থকষ্ট দাম্পত্য সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছিল। অভাব-অনটনের সংসারে প্রেম ফুটতে পারে এটা সত্য, কিন্তু নিরন্তর অভাব-অনটন যখন ভালোবাসার প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা দূরত্বই বাড়ায়।

চিঠিতে স্ত্রী প্রসঙ্গ: ক্ষোভ, কৌতুক ও দরদের মিশ্রণ

গালিবের চিঠিপত্রে উমরাও বেগম প্রসঙ্গ এসেছে বারবার, এবং এই প্রসঙ্গগুলিতে আমরা দেখতে পাই এক অদ্ভুত মিশ্রণ ক্ষোভ, কৌতুক, ব্যঙ্গ, এবং কোথাও কোথাও এক চাপা দরদ। গালিব কখনো সরাসরি স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা লেখেননি, কিন্তু পুরোপুরি উদাসীনও ছিলেন না।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার বেগম সাহেবা মনে করেন, সংসারই একমাত্র ধর্ম। কবিতা, সাহিত্য, আড্ডা এসব তাঁর কাছে শয়তানের কাজ। আমি যখন কবিতা লিখি, তিনি বলেন, 'এই বয়সে এসব শোভা পায় না।' আমি বলি, 'বয়স নয়, মনের বয়স বড় কথা।'

তিনি শোনেন না।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২১০) এই লেখায় স্ত্রীর প্রতি এক ধরনের মৃদু ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু একই সঙ্গে একটি অসহায় স্বীকারোক্তিও আছে দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি যে মিলবে না, তা গালিব মেনে নিয়েছেন।

আরেক চিঠিতে গালিব লিখেছিলেন: "বেগম সাহেবার প্রধান কাজ নামাজ পড়া এবং আমাকে নামাজ না পড়ার জন্য তিরস্কার করা। আমি তাঁকে বলি, আমার নামাজ হলো আমার কবিতা। তিনি বলেন, 'কবিতা নামাজের জায়গা নিতে পারে না।' আমি বলি, 'পারে না, কিন্তু চেষ্টা করে।' এই উত্তর শুনে তিনি আরও রাগেন।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৬৭) এখানেও কৌতুকের আড়ালে এক গভীর দূরত্বের ইঙ্গিত দুইজন মানুষ দুই ভিন্ন জগতে বাস করছেন, এবং দুজনের জগতের মধ্যে কোনো সাঁকো নেই।

তবে শুধু ক্ষোভ বা ব্যঙ্গ নয়, কখনো কখনো গালিবের লেখায় স্ত্রীর প্রতি এক ধরনের দরদও প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে যখন উমরাও বেগম অসুস্থ হয়েছেন, বা যখন সন্তানের মৃত্যুতে তিনিও শোকে ভেঙে পড়েছেন তখন গালিবের লেখায় সেই দরদের সুর পাওয়া যায়। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "বেগম সাহেবা খুব অসুস্থ। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়েছে, কিন্তু ওষুধের চেয়ে বেশি দরকার ভগবানের দয়া। আমি তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকি, কিছু বলতে পারি না, শুধু দেখি। এত বছর একসঙ্গে আছি, অথচ এত দূরে এই ভেবে কষ্ট হয়।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১০২)

এই উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে গালিব নিজেই স্বীকার করছেন দূরত্বের কথা, এবং সেই দূরত্ব নিয়ে কষ্টের কথাও বলছেন। অর্থাৎ, গালিব যে দূরত্ব অনুভব করতেন, তা নিয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন না বরং সেই দূরত্বই ছিল তাঁর কাছে এক বিষাদের কারণ।

ধর্মভীরুতা ও মুক্তচিন্তার দ্বন্দ্ব

গালিব ও উমরাও বেগমের দাম্পত্য সম্পর্কের একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব ছিল ধর্ম নিয়ে। উমরাও বেগম ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, নিয়মিত নামাজ-রোজা পালনকারী, শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলা এক নারী। গালিব ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মুক্তচিন্তক, সংশয়বাদী, ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি প্রায় উদাসীন, এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচক।

গালিব নিজেই এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমার বেগম সাহেবা মনে করেন, আমি নাস্তিক। অথচ আমি নাস্তিক নই, আমি শুধু সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, যাঁকে পাওয়ার জন্য ইমাম-মোল্লার শরণাপন্ন হতে হয়। আমার খুদা সরাসরি আমার কাছে আসেন, কোনো দালালের প্রয়োজন হয় না।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ২০৮)

এই ধর্মীয় দ্বন্দ্ব দাম্পত্য সম্পর্ককে আরও দূরত্বে ঠেলে দিয়েছিল। উমরাও বেগম স্বামীকে নামাজী বানাতে চাইতেন, গালিব স্ত্রীকে মুক্তচিন্তা দিতে চাইতেন দুজনেই ব্যর্থ হয়েছেন। গালিব কখনো নামাজী হননি, উমরাও বেগম কখনো মুক্তচিন্তক হননি। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যে মানবিক ট্র্যাজেডি লুকিয়ে আছে, তা গভীর দুইজন মানুষ একই ঘরে বাস করছেন, অথচ তাঁদের খুদা পর্যন্ত আলাদা।

খলিলুর রহমান আজমি এই দ্বন্দ্বের একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দিয়েছেন: "গালিব ও উমরাও বেগমের মধ্যে যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ছিল, তা কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং সমগ্র যুগের প্রতিনিধিত্ব করে। উনবিংশ শতকের ভারতীয় মুসলিম সমাজে একদিকে ছিল প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিকতার প্রভাবে এক সংশয়বাদী মুক্তচিন্তার উত্থান। গালিবের বাড়ির ভেতরে এই দুই ধারার সংঘাত ঘটেছিল, আর সেই সংঘাতের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর কাব্যেও।" (আজমি, ১৯৬৯: ২১২)

কাব্যে দাম্পত্যের প্রতিফলন

গালিব সরাসরি নিজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে তেমন কোনো কবিতা লেখেননি উর্দু গজলের রীতি তেমন সরাসরি আত্মজৈবনিক প্রকাশকে উৎসাহ দিত না। কিন্তু পরোক্ষভাবে, গালিবের কাব্যে প্রেমের যে ধারণা বারবার ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক আছে।

গালিবের কাব্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক বারবার ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি বহন করে। প্রেমাস্পদ দূরবর্তী, উদাসীন, নিষ্ঠুর; প্রেমিক একাকী, কাতর, ব্যর্থ। এই চিত্রকল্প কি গালিবের নিজের দাম্পত্য জীবনের প্রতিফলন? নারঙ মনে করেন, পুরোপুরি নয়। তিনি লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে প্রেমিকার যে ছবি আঁকা হয়েছে, তা কোনো বাস্তব নারীর প্রতিকৃতি নয়, বরং এক কল্পিত, আদর্শিত প্রতিমা। এই কল্পিত প্রেমিকা এতটাই আদর্শ যে, কোনো বাস্তব নারী তার কাছে পৌঁছাতে পারে না। গালিব হয়তো এই জন্যই কখনো নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারেননি কারণ তাঁর ভালোবাসার মানদণ্ডটি ছিল অসম্ভব উচ্চ, যা কোনো মানুষ পূরণ করতে পারে না।" (নারঙ, ১৯৮৫: ২১০)

এই বিশ্লেষণটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি গালিবের ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্যের সম্পর্ককে এক নতুন আলোয় দেখায়। গালিব হয়তো এমন এক প্রেমের কল্পনা করতেন, যে প্রেম আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির সংঘাত, এবং চেতনার সঙ্গে চেতনার সংলাপ। এই ধরনের প্রেমের জন্য একজন সমমনা, সমবুদ্ধিসম্পন্ন সঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল, যা উমরাও বেগম ছিলেন না। ফলে গালিবের প্রেম থেকে গেল কেবল কল্পনায়, কাব্যে বাস্তবে নয়।

সন্তানহারা পিতা

সাতটি জীবন, সাতটি মৃত্যু

গালিবের জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায় হল তাঁর সন্তানদের পরপর মৃত্যু। গালিব ও উমরাও বেগমের সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল পুত্র ও কন্যা মিলিয়ে। কিন্তু কী নির্মম পরিহাস, প্রত্যেকটি সন্তানই শৈশবে মারা যায়। একটিও সন্তান পিতামাতার চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠেনি। আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "মির্জা গালিবের ঘরে সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু একটিও জীবিত থাকেনি। এই শোক গালিবের হৃদয়ে এমন দাগ কেটেছিল, যা কোনোদিন মুছেনি।" (হালী, ১৮৯৭: ৭৮)

সন্তানদের মৃত্যুর সঠিক তারিখ, বয়স, এমনকি নামও সব ক্ষেত্রে জানা যায় না। তবে কিছু তথ্য ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে। গালিবের প্রথম সন্তান ছিল একটি পুত্র, যে জন্মের কিছুদিন পরই মারা যায়। দ্বিতীয় সন্তানও পুত্র, সেও শৈশবে মারা যায়। তৃতীয়, চতুর্থ একের পর এক সন্তান এসেছে এবং চলে গেছে, যেন নিয়তি গালিবকে পিতৃত্বের সুখ থেকে বঞ্চিত করতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

সবচেয়ে বড় আঘাত আসে যখন গালিবের প্রিয় পুত্র আরিফ মারা যায়। আরিফ ছিল গালিবের পঞ্চম সন্তান এবং অপেক্ষাকৃত বেশি দিন বেঁচে ছিল প্রায় পাঁচ-ছয় বছর। আরিফের মৃত্যু গালিবকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আরিফ চলে গেছে। যে বাতিতে আমি আমার ঘর আলোকিত দেখেছিলাম, সেই বাতি নিভে গেছে। এখন আমার ঘর অন্ধকার, আমার মন অন্ধকার। আল্লাহ আমাকে যে শাস্তি দিচ্ছেন, তা হয়তো আমার প্রাপ্য। কিন্তু শিশুটির কী অপরাধ ছিল?" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৮২)

শেষ সন্তানটিও যখন মারা যায়, তখন গালিব সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "সাতবার আমি পিতা হয়েছি, সাতবার আমি সন্তানের মুখাগ্নি করেছি। আল্লাহর কী মহিমা! তিনি দিয়েছেন, তিনি নিয়েছেন। কিন্তু তিনি দিয়েছিলেন কেন, যদি নেওয়াই ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর আমি কোনোদিন পাব না।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২১৯)

শোকের ভাষা: চিঠি ও কাব্যে সন্তানশোক

গালিবের চিঠিগুলিতে সন্তানশোকের প্রকাশ অত্যন্ত সরাসরি, বেদনাঘন ও হৃদয়বিদারক। এই চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়, গালিবের ব্যক্তিত্বের যে শক্ত বহিরাবরণ আত্মঅহংকার, কৌতুকপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চমক তার নিচে কী গভীর এক ক্ষত লুকিয়ে ছিল।

আরিফের মৃত্যুর পর গালিব এক বন্ধুকে লিখেছিলেন: "আমি আরিফের জন্য কাঁদছি না, কারণ কান্না তো চোখের জল, তা শুকিয়ে যায়। আমি কাঁদছি মনে মনে, যে কান্নার জল শুকায় না। আরিফ আমার স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। এখন আমি জেগে আছি, কিন্তু জেগে থেকেও যেন স্বপ্ন দেখছি এক দুঃস্বপ্ন, যার শেষ নেই।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৮০)

আরেক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "মানুষ বলে, সময় সব শোক কমিয়ে দেয়। মিথ্যা কথা। সময় শোক কমায় না, শোককে চাপা দিতে শেখায়। কিন্তু চাপা দেওয়া শোক আরও ভয়ানক তা ফোঁড়া হয়ে ওঠে, যা কখনো ফাটে, কখনো ফাটে না, কিন্তু সবসময় যন্ত্রণা দেয়।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৮৩)

কাব্যে গালিব সরাসরি সন্তানশোক নিয়ে খুব বেশি লেখেননি, কিন্তু যে কয়েকটি শেরে এই শোকের ছায়া পড়েছে, তা উর্দু সাহিত্যের অন্যতম মর্মস্পর্শী রচনা। তাঁর একটি বিখ্যাত শের:

درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা
হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

(ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।)

এই শেরটি সরাসরি সন্তানশোক নিয়ে লেখা নয়, কিন্তু যে গভীর ক্ষত, যে গোপন যন্ত্রণা, যে ফাঁপা বুকের অনুভূতি এগুলি গালিবের সন্তানহারা পিতার অভিজ্ঞতারই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।

আরেকটি শের, যা গালিবের ব্যক্তিগত শোকের ছায়া বহন করে:

ہم کو ا سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এখানে 'ওফা' বা বিশ্বস্ততার যে প্রসঙ্গ, তাতে নিয়তির প্রতি এক গভীর অভিযোগ লুকিয়ে আছে যে নিয়তি বারবার সন্তান দিয়েছে, আবার কেড়েও নিয়েছে, তার কাছে বিশ্বস্ততা আশা করা অর্থহীন।

সন্তানশোক ও গালিবের ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন

বারবার সন্তানের মৃত্যু গালিবের ব্যক্তিত্বে এক গভীর পরিবর্তন এনেছিল। প্রথমত, এই শোক তাঁকে আরও অন্তর্মুখী করেছিল। যে গালিব একসময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে থাকতেন, হাসিঠাট্টায় সময় কাটাতেন, সেই গালিবই ধীরে ধীরে এক গভীর নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত হন। অবশ্য তিনি কখনো সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়ে যাননি; তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা, সামাজিকতা ও আড্ডাপ্রিয়তা শেষ জীবন পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তার পাশাপাশি একটি গভীর বিষাদ, এক নিঃসঙ্গতার অনুভূতি তাঁর মধ্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, সন্তানশোক গালিবের খুদা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি, গালিবের খুদা-ভাবনা ছিল জটিল একই সঙ্গে সুফিবাদে বিশ্বাসী ও সংশয়বাদী। সন্তানদের মৃত্যু এই সংশয়কে আরও গভীর করেছিল। তবে গালিব কখনো সরাসরি খুদাকে অস্বীকার করেননি, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজের অসহায়তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই স্বীকৃতি যে এক গভীর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এসেছিল, তা বোঝা যায় তাঁর লেখায়।

তৃতীয়ত, সন্তানশোক গালিবের কাব্যের বিষয়বস্তু ও সুরকে প্রভাবিত করেছিল। নারঙ লিখেছেন: "সন্তানশোক গালিবের কাব্যে প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবে প্রবেশ করেছে। তাঁর কাব্যে যে 'বেদনা' ও 'শূন্যতা'র সুর বারবার ফিরে এসেছে, তার পেছনে এই ব্যক্তিগত শোকের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। যে মানুষ বারবার সন্তানের মৃত্যু দেখেছে, সে মানুষের পক্ষে জগৎকে শুধু 'তামাশা' হিসেবে দেখা সম্ভব নয় সেই তামাশার আড়ালে এক গভীর বেদনাও কাজ করে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ২১৮)

দত্তক পুত্র ও ভাতিজা: বিকল্প স্নেহের সন্ধান

নিজের সন্তানদের মৃত্যুর পর গালিব তাঁর ভাতিজা জয়ন-উল-আবেদীন খাঁ (যিনি 'আরিফ' নামেও পরিচিত ছিলেন, পরে 'মির্জা ইউসুফ খাঁর পুত্র') এবং পরবর্তীকালে এক দত্তক পুত্রকে স্নেহ করতেন। কিন্তু এখানেও নিয়তি গালিবকে সুখী হতে দেয়নি। দত্তক পুত্রও অল্প বয়সে মারা যায়।

এক চিঠিতে গালিব এই দত্তক পুত্রের মৃত্যুর পর লিখেছিলেন: "এবার আমার শেষ আশাটিও গেল। আমি ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়সে একটি ছেলে থাকবে, যে আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। কিন্তু নিয়তি আমার সব আশা ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। এখন আমি একেবারে একা কেউ নেই, কিছু নেই।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৮৪)

এই 'একেবারে একা' অনুভূতিটি গালিবের শেষ জীবনের একটি ধ্রুব সত্য হয়ে উঠেছিল। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি একা, বন্ধু-অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও তিনি একা কারণ যে শূন্যতা সন্তানের মৃত্যু তৈরি করে, তা পৃথিবীর আর কোনো সম্পর্ক পূরণ করতে পারে না।

মদ, জুয়া ও অভাব

আর্থিক অনটন ও ঋণের জীবন

গালিবের সারাজীবনের এক ধ্রুবসঙ্গী ছিল দারিদ্র্য। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কীভাবে চাচার মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন বন্ধ বা অনিয়মিত হয়ে যায় এবং গালিবকে সেই পেনশনের জন্য জীবনভর লড়াই করতে হয়। কিন্তু পেনশনের লড়াই ছাড়াও গালিবের

আর্থিক অবস্থা ছিল সারাক্ষণই শোচনীয়। উপার্জনের উৎস ছিল সীমিত: অনিয়মিত পেনশন, মাঝে মাঝে পৃষ্ঠপোষকদের দেওয়া অনুদান, এবং কখনো কখনো কবিতা বা কাসিদা লিখে প্রাপ্ত পারিশ্রমিক। কিন্তু এই উপার্জন কখনোই তাঁর ব্যয়ের সমানুপাতিক ছিল না।

গালিবের ব্যয়ের ধরনও ছিল অনিয়মিত ও উচ্চাভিলাষী। তিনি অভিজাত জীবনযাপন করতে ভালোবাসতেন ভালো খাবার, ভালো পোশাক, চাকর-বাকর, আতিথেয়তা এই সবের জন্য অর্থের প্রয়োজন হতো, যা তাঁর ছিল না। ফলে তিনি ধার করতেন। একজনের কাছ থেকে ধার করে আরেকজনের ধার শোধ করতেন। কখনো কখনো ধার শোধ না করেও চলতেন, যা নিয়ে সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠত।

রাসেল লিখেছেন: "গালিবের অর্থকষ্ট ছিল এক দুর্বিষহ চক্র। তিনি ধার করতেন, ধার শোধ করতে পারতেন না, ফলে নতুন করে ধার করতে হতো, এবং এইভাবে ধারের বোঝা ক্রমশ বাড়তে থাকত। পাওনাদারেরা যখন খুব চাপ দিতেন, তখন গালিব কোনো ধনী পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে সাহায্য চাইতেন, সেই সাহায্য পেলে কিছু ধার শোধ করতেন, এবং আবার নতুন করে ধার করতেন। এই চক্র থেকে তিনি কখনো মুক্ত হতে পারেননি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১৯২)

মদ্যপান: পলায়ন ও প্রশান্তি

গালিবের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল সমসাময়িক সমাজে বহুল চর্চিত ও সমালোচিত বিষয়। তখনকার দিল্লির অভিজাত মুসলিম সমাজে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হলেও, তা ভালো চোখে দেখা হতো না। বিশেষ করে শরিয়তের দৃষ্টিতে মদ্যপান ছিল কবিরা গুনাহ (মহাপাপ)। কিন্তু গালিব প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন এবং এ নিয়ে কোনো লজ্জা বা গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন না।

কেন গালিব মদ্যপান করতেন? এই প্রশ্নের উত্তর জটিল। একদিকে, মদ্যপান ছিল তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ, এক ধরনের স্বাদ ও প্রশান্তির উপায়। অন্যদিকে, মদ্যপান ছিল বাস্তবতার কষ্ট থেকে পলায়নের এক পথ। যে মানুষ বারবার সন্তানের মৃত্যু দেখেছে, যে মানুষ সারাজীবন অর্থকষ্ট ও পেনশনের লড়াইয়ে জর্জরিত, যে মানুষ দাম্পত্য জীবনে সুখী নয় সে মানুষের পক্ষে মদের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজা স্বাভাবিক।

গালিব নিজে এক চিঠিতে মদ্যপান সম্পর্কে লিখেছিলেন: "লোকে বলে, মদ হারাম। আমি বলি, যারা মদ খায় না, তাদের মন হারাম তারা জানে না, কী আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত। মদ আমাকে কিছু দেয় না, বরং কেড়ে নেয় আমার দুঃখ, আমার চিন্তা, আমার বেদনা। এই কেড়ে নেওয়াটাই তো মদের সবচেয়ে বড় দান।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২২৫)

আরেক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি মদ খাই, কারণ আমি জীবনকে ভালোবাসি। মদ আমাকে জীবনকে আরও গভীরভাবে দেখতে শেখায়। রঙগুলি আরও উজ্জ্বল হয়, সুরগুলি আরও স্পষ্ট হয়, শব্দগুলি আরও অর্থবহ হয়। আমি যখন মদ খাই, আমি কবি হই। আমি যখন মদ খাই না, আমি সাধারণ মানুষ।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৯৭)

এই উক্তিগুলি থেকে বোঝা যায়, গালিব মদ্যপানকে শুধু নেশা হিসেবে দেখতেন না, বরং এক ধরনের শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখতেন যেমন সুফিরা 'সাকি' ও 'ময়' এর রূপকের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা বলতেন, তেমনই গালিবও মদ্যপানের মধ্যে এক ধরনের সৃজনশীল মুক্তি খুঁজতেন।

জুয়া: ঝুঁকি ও নেশা

গালিব জুয়া খেলতেন এটিও ছিল সমসাময়িক সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি বড় অভিযোগ। জুয়া ছিল শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এবং সমাজেও তা নিন্দিত। কিন্তু গালিব প্রকাশ্যে জুয়া খেলতেন, এবং এ নিয়ে সমালোচকদের উত্তর দিতেন নিজের চরিত্রগত তীক্ষ্ণতায়।

গালিবের জুয়া খেলার পেছনে অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দুই ধরনের কারণই কাজ করত। অর্থনৈতিক কারণ সহজ: তিনি আশা করতেন, জুয়ায় টাকা জিততে পারবেন, যা তাঁর আর্থিক অনটন কিছুটা কমাবে। কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই তিনি জুয়ায় টাকা হারতেন, যা তাঁর আর্থিক অবস্থাকে আরও শোচনীয় করত। মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল ঝুঁকির নেশা, অনিশ্চয়তার আকর্ষণ। জুয়া খেলার মধ্যে যে রোমাঞ্চ, যে অনিশ্চয়তা, যে ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা তা হয়তো গালিবের জীবনদর্শনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যে মানুষ জীবনকে 'তামাশা' মনে করেন, যে মানুষ জগৎকে 'শিশুদের খেলাঘর' বলেন, তাঁর কাছে জুয়া নিছক আরেকটি খেলা, আরেকটি তামাশা।

এক চিঠিতে গালিব জুয়া নিয়ে লিখেছিলেন: "লোকে বলে, জুয়া খেলা পাপ। আমি বলি, জীবন নিজেই তো জুয়া। কেউ জানে না, আগামীকাল কী হবে। আমরা সবাই অন্ধকারে হাতড়াই, কখনো পাই, কখনো পাই না এটাই তো জুয়া। তাহলে জীবনের জুয়া যদি জায়েজ হয়, টাকার জুয়া কেন নাজায়েজ হবে?" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৮৮)

সমাজের সমালোচনা ও গালিবের প্রতিক্রিয়া

গালিবের মদ্যপান ও জুয়া খেলার অভ্যাস নিয়ে সমসাময়িক সমাজে প্রচুর সমালোচনা হতো। বিশেষ করে ধর্মীয় নেতারা, সমাজপতিরা এবং কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী কবি এই অভ্যাসগুলিকে কাজে লাগিয়ে গালিবের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করতেন। গালিবকে বলা হতো 'শরাবী', 'জুয়াড়ি', 'বেদীন', 'ফাসিক' ইত্যাদি।

কিন্তু গালিব এই সমালোচনায় ভেঙে পড়েননি, বরং নিজের চরিত্রগত ভঙ্গিতে এর উত্তর দিয়েছেন কখনো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে, কখনো দার্শনিক বিশ্লেষণে, কখনো কাব্যে। এক বিখ্যাত শেরে তিনি বলেছেন:

ہم کو ا□ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

এই শেরটি যেমন প্রেমের প্রসঙ্গে, তেমনিই সমাজের প্রতিও এক ব্যঙ্গ যে সমাজ 'ওফা' বা বিশ্বস্ততা জানে না, অর্থাৎ যে সমাজ নিজেই নৈতিকতার ধার ধারে না, সেই সমাজের কাছে গালিব কেন নিজের চরিত্রের সাফাই দিতে যাবেন?

আরেকটি বিখ্যাত শেরে গালিব নিজের মদ্যপান নিয়ে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন:

جا ہم پر گزری، سو گزری، مگر
□بِ ہجراں ہماری کہانی نہ پوچھ

যা হম পার গুজরি, সো গুজরি, মগর
শব-এ-হিজরাঁ হামারি কাহানি না পুছ

(আমার ওপর দিয়ে যা গেছে, গেছে কিন্তু বিচ্ছেদ-রাতের কাহিনি জানতে চেও না।)

এখানে 'শব-এ-হিজরাঁ' (বিচ্ছেদের রাত) একই সঙ্গে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ এবং জীবনের কষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য মদ্যপানের রাত উভয়কেই ইঙ্গিত করতে পারে।

পেনশন ও জায়গীরের জন্য নিরন্তর লড়াই

গালিবের অর্থসংগ্রামের একটি কেন্দ্রীয় অধ্যায় হল পেনশন ও জায়গীর (ভূমি-অনুদান) এর জন্য তাঁর নিরন্তর লড়াই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এই লড়াইয়ের সূত্রপাত দেখেছি কীভাবে চাচা নসরুল্লাহ বেগের মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন বন্ধ হয়ে যায়, এবং কীভাবে গালিব তার জন্য কলকাতা পর্যন্ত গিয়ে গভর্নর-জেনারেলের কাছে আবেদন করেন।

কিন্তু পেনশনের লড়াই কেবল কলকাতা সফরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গালিবকে সারাজীবন ধরে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হয়েছে, কখনো সফল হয়েছেন, কখনো হননি। কখনো পেনশনের পরিবর্তে এককালীন অনুদান পেয়েছেন, কখনো কিছুদিন নিয়মিত পেনশন পেয়েছেন, তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেছে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে গোটা জীবন।

হালী লিখেছেন: "গালিবের জীবনের একটি বড় অংশ কেটেছে পেনশনের পেছনে ধাওয়া করে। কখনো দিল্লির রেসিডেন্টের কাছে, কখনো কলকাতার গভর্নর-জেনারেলের কাছে, কখনো আওধের নবাবের কাছে, কখনো রামপুরের রাজার কাছে তিনি আবেদনের পর আবেদন লিখেছেন, আর অপেক্ষা করেছেন। কখনো ফল পেয়েছেন, কখনো পাননি। কিন্তু এই অপেক্ষা ও অনিশ্চয়তা তাঁর জীবনকে এক দুর্বিষহ ক্লেশে পরিণত করেছিল।" (হালী, ১৮৯৭: ৭০)

গালিব নিজে এক চিঠিতে এই লড়াইয়ের ক্লান্তি ব্যক্ত করে লিখেছিলেন: "আমি ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একই লড়াই লড়ছি পেনশনের লড়াই। এই লড়াইয়ে আমি জিতব, না হারব, জানি না। কিন্তু লড়াইটা নিজেই এক শাস্তি। আমি কবি, সৈনিক নই তবু আমাকে সৈনিকের মতো লড়তে হচ্ছে।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২০০)

জায়গীরের আশা ও বাস্তবতা

পেনশনের পাশাপাশি গালিব একটি জায়গীর (ভূমি-অনুদান) পাওয়ারও আশা করতেন। জায়গীর ছিল মুঘল আমলের একটি প্রচলিত প্রথা সম্রাট বা নবাবেরা সেবার পুরস্কার হিসেবে কাউকে ভূমির রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিতেন। গালিব মনে করতেন, তাঁর কাব্যসেবার জন্য তিনি একটি জায়গীর পাওয়ার যোগ্য। এবং সত্যিই, বাহাদুর শাহ জাফর একবার গালিবকে একটি জায়গীর দিয়েছিলেন কিন্তু তা ছিল এমন এক অঞ্চলে, যেখান থেকে রাজস্ব আদায় করা কার্যত অসম্ভব ছিল। ফলে জায়গীরটি ছিল নামমাত্র, বাস্তব আয়ের উৎস নয়।

গালিবের জীবনের করুণ পরিহাসগুলির মধ্যে এটিও একটি তিনি সারাজীবন অর্থের জন্য লড়েছেন, কিন্তু যখন কিছু পেয়েছেন, তা হয় অপ্রতুল, নয় কার্যত মূল্যহীন। এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি একবার লিখেছিলেন: "আমার ভাগ্য যেন কৌতুক করতে ভালোবাসে। আমাকে দেয়, কিন্তু এমনভাবে দেয়, যা নেওয়া যায় না। আমাকে সম্মান দেয়, কিন্তু এমন সময়ে, যখন সম্মানের চেয়ে রুটি বেশি দরকার।"

ক্ষতের ফুল

গালিবের জীবন ছিল ক্ষতের সমষ্টি দাম্পত্যের ব্যর্থতা, সন্তানের মৃত্যু, অর্থের অভাব, পেনশনের অনিশ্চয়তা, সমাজের সমালোচনা। এই সমস্ত ক্ষত মিলে গালিবের ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে আহত করেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে এই ক্ষতগুলি থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের ফুল। ঠিক যেমন মুক্তা জন্ম নেয় শুক্তির ক্ষত থেকে, তেমনই গালিবের কাব্যের মুক্তা জন্ম নিয়েছিল জীবনের ক্ষত থেকে।

আজমি যথার্থই বলেছেন: "গালিব যদি সুখী হতেন, যদি তাঁর দাম্পত্য সফল হতো, যদি তাঁর সন্তানেরা বেঁচে থাকত, যদি তিনি অর্থকষ্টে না ভুগতেন তাহলে হয়তো তিনি ভালো কবি হতেন, কিন্তু মহৎ কবি হতেন না। মহৎ কবিতা জন্ম নেয় যন্ত্রণা থেকে, আর গালিবের জীবনে যন্ত্রণার অভাব ছিল না।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৩০)

নির্বাচিত শের: দাম্পত্য, সন্তানশোক ও অর্থসংগ্রামের অনুষঙ্গে

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা
হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

(ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।)

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি হয়তো ভাবছেন, এত দুঃখ, এত বঞ্চনা, এত মৃত্যুশোক একজন মানুষ কী করে সহ্য করেন? এবং শুধু সহ্যই নয়, কী করে এই সব থেকে সৃষ্টি করেন এমন কাব্য, যা আজও মানুষকে আনন্দ দেয়, ভাবায়, সান্ত্বনা দেয়? এর উত্তর লুকিয়ে আছে গালিবের সেই অমোঘ জীবনবাদে, যে জীবনবাদ দুঃখকে অস্বীকার করে না, বরং দুঃখকেও জীবনের অঙ্গ

হিসেবে গ্রহণ করে। "রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ" দুঃখের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেলে দুঃখ আর দুঃখ থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে জীবনেরই অংশ। গালিব এই সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যে একে রূপান্তরিত করেছিলেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে গালিব রাজদরবারে নিজের জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের দরবার, লখনউয়ের নবাবের দরবার, কলকাতা সফর এবং কীভাবে এই চেষ্টাগুলির সফলতা ও ব্যর্থতা তাঁর জীবন ও কাব্যকে প্রভাবিত করেছিল। আমরা দেখব, কীভাবে গালিব একই সঙ্গে রাজকবি ও প্রত্যাখ্যাত, সম্মানিত ও উপেক্ষিত এই দ্বৈততার মধ্যে বাস করেছিলেন, এবং কীভাবে এই দ্বৈততাই তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল।

অধ্যায় ৭: রাজদরবার, প্রত্যাশা ও প্রত্যাখ্যান

রাজদরবারের মায়াজাল ও বাস্তবতার কশাঘাত

জীবন এক অদ্ভুত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া মানুষ যা চায়, প্রায়ই তা পায় না; আর যখন পায়, তখন তা আর তেমন আকর্ষণীয় থাকে না। গালিবের জীবনের এই অধ্যায়টি সেই দ্বান্দ্বিকতারই এক জীবন্ত দলিল। যে মানুষ সারা জীবন রাজদরবারের স্বীকৃতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্য লালায়িত ছিলেন, তিনি যখন শেষ পর্যন্ত তা পেলেন, তখন দেখলেন সেই স্বীকৃতি কতটা ফাঁপা, কতটা আপেক্ষিক, আর কতটা অপ্রতুল। যে কলকাতা সফর শুরু হয়েছিল পেনশনের আশায়, সেই সফর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রা যে অভিযাত্রা তাঁর সাহিত্যিক শৈলী ও বিশ্বদৃষ্টিকে চিরকালের মতো বদলে দিল।

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র পর্যালোচনা করব প্রথমত, শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারে তাঁর উত্থান ও পতন; দ্বিতীয়ত, লখনউ ও রামপুরের নবাবদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতার সন্ধান; এবং তৃতীয়ত, ১৮২৮-২৯ সালের কলকাতা সফর, যা ছিল তাঁর জীবনের এক অনন্য পর্ব। এই তিনটি ক্ষেত্রেই গালিবের জীবনে প্রত্যাশা ও প্রত্যাখ্যানের যে চক্রাকার গতি সৃষ্টি করেছিল, তার উজ্জ্বল উদাহরণ। ড. গোপী চাঁদ নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের জীবন ছিল এক রাজদরবার থেকে আরেক রাজদরবারে, এক শহর থেকে আরেক শহরে পৃষ্ঠপোষকতার সন্ধানের ইতিহাস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যা পেয়েছিলেন, তা হল পৃষ্ঠপোষকতা নয়, বরং এক গভীর আত্মজ্ঞান, যা তাঁকে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।" (নারঙ, ১৯৮৫: ২৪৫)

বাহাদুর শাহ জাফরের দরবার

দরবারে প্রবেশের পূর্বপ্রস্তুতি

গালিবের জীবনে লাল কেল্লার দরবারে প্রবেশ ছিল এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম পরিণতি। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর (শাসনকাল: ১৮৩৭-১৮৫৭) নিজে ছিলেন একজন কবি, ক্যালিগ্রাফার ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন হলেও, সাংস্কৃতিকভাবে তাঁর দরবার ছিল তৎকালীন উত্তর ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্র। এই দরবারে স্থান পাওয়া মানে ছিল কেবল অর্থনৈতিক সুবিধা নয়, বরং সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

কিন্তু এই দরবারে প্রবেশের পথ গালিবের জন্য মোটেই সহজ ছিল না। বাহাদুর শাহ জাফরের প্রধান ওস্তাদ ও রাজকবি ছিলেন শেখ ইব্রাহীম জওক, যাঁর সঙ্গে গালিবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত দেখেছি। জওক জীবিত থাকতে গালিবের পক্ষে দরবারে উচ্চ আসন পাওয়া সম্ভব ছিল না। আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "জওকের জীবদ্দশায় গালিব দরবারে প্রবেশের অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জওকের প্রভাবে তা সফল হয়নি। জওক চাইতেন না যে, গালিবের মতো একজন প্রতিভাবান ও প্রতিদ্বন্দ্বী কবি দরবারে উচ্চ আসন পান, কারণ তাতে তাঁর নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে আঘাত লাগত।" (হালী, ১৮৯৭: ৫৬)

জওকের সঙ্গে গালিবের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল ব্যক্তিগত ছিল না, বরং ছিল দুই কাব্যশৈলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জওকের ভাষা ছিল সহজ, সরল, শ্রুতিমধুর ও জনপ্রিয়; গালিবের ভাষা ছিল জটিল, দার্শনিক, ফার্সি-মিশ্রিত ও দুর্বোধ্য। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর নিজে জওকের সরল শৈলীর অনুরাগী ছিলেন এবং জওকের কাছেই কাব্যশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জওক ছিলেন সম্রাটের প্রিয়, আর গালিব ছিলেন উপেক্ষিত।

খলিলুর রহমান আজমি এই সময়কার দরবারি রাজনীতির একটি চমৎকার চিত্র এঁকেছেন: "জওকের দরবারি অবস্থান ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি কেবল সম্রাটের ওস্তাদই ছিলেন না, বরং দরবারের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান নিয়ন্তাও ছিলেন। কোনো কবি দরবারে আসতে চাইলে প্রথমে জওকের অনুমোদন প্রয়োজন হতো। গালিব প্রথম দিকে জওকের কাছে গিয়েছিলেন নিজের কবিতা শোনাতে, কিন্তু জওক তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দেননি। বরং গালিবের কবিতার জটিলতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৪২)

১৮৫৪: জওকের মৃত্যু ও গালিবের উত্থান

১৮৫৪ সালে জওকের মৃত্যু গালিবের জীবনে এক বড় মোড় নিয়ে আসে। জওকের মৃত্যুর পর সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নতুন ওস্তাদ ও রাজকবি নিযুক্তির প্রয়োজন হয়। এই সময় গালিবই ছিলেন দিল্লির সবচেয়ে প্রতিভাবান ও বিশিষ্ট কবি। সম্রাট গালিবকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে রাজকবি ও নিজের কাব্যশিক্ষক নিযুক্ত করেন।

হালী এই নিযুক্তির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে: "জওকের মৃত্যুর পর সম্রাট বাহাদুর শাহ গালিবকে ডেকে পাঠালেন। গালিব লাল কেল্লায় উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে বললেন, 'মির্জা, এখন তুমিই আমাদের ওস্তাদ। আমরা চাই, তুমি আমাদের কবিতা সংশোধন করবে এবং

দরবারে নিয়মিত উপস্থিত থাকবে।' গালিব এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। এতদিন পর তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি মিলল।" (হালী, ১৮৯৭: ৫৮)

গালিব নিজে এই নিযুক্তি সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "অবশেষে ভাগ্য আমার দিকে তাকিয়েছে। সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার কবিতার প্রশংসা করেছেন, এবং আমাকে তাঁর ওস্তাদ নিযুক্ত করেছেন। আমি এখন রাজকবি এই শব্দটা ভাবতেই আমার বুক গর্বে ফুলে ওঠে। কিন্তু একই সঙ্গে মনে হয়, এতদিনে এই সম্মান এল, যখন আর তেমন প্রয়োজন নেই।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৪৫)

শেষের এই বাক্যটি গালিবের মনের গভীর দ্বিধার পরিচয় দেয় একদিকে স্বীকৃতির আনন্দ, অন্যদিকে সেই স্বীকৃতির বিলম্বিত আগমনের জন্য এক তিক্ততা।

রাজকবির দায়িত্ব ও সম্রাটের কবিতা সংশোধন

রাজকবি হিসেবে গালিবের প্রধান দায়িত্ব ছিল সম্রাটের কবিতা সংশোধন করা এবং দরবারের মুশায়রাগুলিতে নেতৃত্ব দেওয়া। বাহাদুর শাহ জাফর নিজে একজন ভালো কবি ছিলেন, কিন্তু গালিবের মতো প্রতিভাবান ছিলেন না। ফলে সম্রাটের কবিতা সংশোধন করা ছিল এক স্পর্শকাতর কাজ একই সঙ্গে সততা ও কূটনীতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হতো।

গালিব এই কাজ কীভাবে করতেন, তা নিয়ে একটি মজার কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একবার সম্রাট একটি শের লিখেছিলেন, যার প্রথম মিসরা ছিল: "গালিব, হম নে তেরে শের কো বহুত পসন্দ কিয়া" (গালিব, আমরা তোমার কবিতা খুব পছন্দ করেছি)। গালিব তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন: "হুজুর, এই মিসরাটিতে একটা ভুল আছে। কারণ, আমি আপনার শের পছন্দ করব, আপনি আমারটা করবেন এটা তো বেয়াদবি। বরং বলুন: 'গালিব, হম নে তেরে শের কো বহুত নাপসন্দ কিয়া' (গালিব, আমরা তোমার কবিতা খুব অপছন্দ করেছি)। তাহলে আমি বলতে পারি: 'হুজুর, আপনে বড় কৃপা ফরমায়ি' (হুজুর, আপনি বড় দয়া করেছেন)।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৪৫)

এই কাহিনিটি সত্য না হলেও, গালিবের চরিত্রের একটি দিক উন্মোচন করে তিনি তোষামোদ করতেন না, বরং নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবোধই দরবারি জীবনে তাঁর জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সম্রাটের সাথে সম্পর্কের উত্থান-পতন

গালিবের সঙ্গে বাহাদুর শাহ জাফরের সম্পর্ক ছিল জটিল ও দ্বান্দ্বিক। একদিকে সম্রাট গালিবের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন, অন্যদিকে গালিবের স্পষ্টভাষিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্রাটের কাছে কখনো কখনো অস্বস্তিকর হয়ে উঠত। জওক যেমন ছিলেন বিনয়ী, আনুগত্যপরায়ণ ও কূটনৈতিক, গালিব ছিলেন তার বিপরীত স্পষ্টবাদী, আত্মসচেতন ও বিদ্রোহী।

একটি ঘটনা এই সম্পর্কের টানাপোড়েনকে চিত্রিত করে। কথিত আছে, একদিন সম্রাট গালিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মির্জা, তুমি কেমন আছ?" গালিব উত্তর দিয়েছিলেন: "হুজুর, আমি খুব ভালো আছি। কারণ, আমি যতটুকু পাই, ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি।" সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন, এই কথার মধ্যে পেনশনের প্রসঙ্গে এক সূক্ষ্ম তির্যক ইঙ্গিত আছে, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ গালিবের পেনশন বাড়ানোর নির্দেশ দেন। (হালী, ১৮৯৭: ৬২)

কিন্তু সব সময় সম্পর্ক এত মসৃণ ছিল না। গালিবের অসংযত আচরণ, মদ্যপান, জুয়া খেলা, এবং দরবারি শিষ্টাচার না মানার প্রবণতা নিয়ে সম্রাটের কাছে অভিযোগ যেত। সম্রাট নিজে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন, এবং গালিবের ধর্মীয় উদাসীনতা ও মুক্তচিন্তা নিয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। ফলে সম্পর্কের মধ্যে সব সময় একটি চাপা টানাপোড়েন বিদ্যমান ছিল।

রালফ রাসেল এই সম্পর্কের বিশ্লেষণে লিখেছেন: "সম্রাট ও গালিবের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক প্রয়োজন ও অস্বস্তির সম্পর্ক। সম্রাটের প্রয়োজন ছিল একজন যোগ্য ওস্তাদের, যে তাঁর কবিতা সংশোধন করবে এবং দরবারের মর্যাদা বাড়াবে। গালিবের প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বীকৃতির। কিন্তু দুই পক্ষই একে অপরকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। সম্রাট গালিবের মুক্তচিন্তায় অস্বস্তি বোধ করতেন, গালিব সম্রাটের ক্ষমতাহীনতা ও দরবারের ফাঁপা জাঁকজমক নিয়ে মনে মনে ব্যঙ্গ করতেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৫০)

স্পষ্টভাষিতা ও রাজনীতি না বোঝা

গালিবের দরবারি জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক কূটনীতির অভাব। তিনি যা মনে করতেন, তা বলতে দ্বিধা করতেন না তা যতই অপ্রিয় হোক। এই স্পষ্টভাষিতা অনেক সময় দরবারের অন্যান্য সদস্যদের অস্বস্তিতে ফেলত এবং গালিবের শত্রু বাড়াত।

একবার দরবারে এক কবি সম্রাটের প্রশংসায় একটি কাসিদা পড়ছিলেন, যেখানে সম্রাটকে 'জাহাঁপনা' (জগতের আশ্রয়) বলে অভিহিত করা হচ্ছিল। গালিব নাকি সমস্বরে মন্তব্য করেছিলেন: "জাহাঁপনা? যাঁর নিজেরই আশ্রয় দরকার, তিনি কীভাবে জগতের আশ্রয় হবেন?" এই মন্তব্য সম্রাটের কানে গিয়েছিল এবং তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। (আজমি, ১৯৬৯: ২৪৮)

আরেকবার দরবারে এক আলোচনায় গালিব বলেন, "রাজকবি হওয়া মানে তো রাজার তোষামোদকারী হওয়া নয়। আমি তোষামোদ করতে জানি না, এবং জানলেও করতাম না। আমি কবি, দরবারি নই।" এই ধরনের মন্তব্য দরবারের পরিবেশে গ্রহণযোগ্য ছিল না, এবং গালিবের প্রতিপক্ষেরা তা কাজে লাগাত।

নারঙ এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ দিয়েছেন: "গালিবের স্পষ্টভাষিতা ছিল তাঁর চরিত্রের অঙ্গ, কিন্তু তা দরবারি জীবনের পক্ষে উপযোগী ছিল না। দরবার এমন একটি জায়গা, যেখানে সত্য বলতে হয় কৌশলে, সমালোচনা করতে হয় প্রশংসার আড়ালে, আর বিদ্রোহ করতে হয় আনুগত্যের ছদ্মবেশে। গালিব এই কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে পারেননি বা করতে চাননি। ফলে তাঁর দরবারি জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী ও সংঘাতময়।" (নারঙ, ১৯৮৫: ২৫২)

রাজকবির আর্থিক বাস্তবতা

রাজকবি হিসেবে গালিব কী বেতন পেতেন, তা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। তবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বেতন ছিল অত্যন্ত সামান্য মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা, যা গালিবের মতো অভিজাত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে অপ্রতুল ছিল। তদুপরি, এই সামান্য বেতনও নিয়মিত দেওয়া হতো না। সম্রাটের নিজের পেনশন যখন অনিয়মিত হতো, তখন দরবারের কর্মচারীদের বেতন দেওয়া আরও অনিয়মিত হতো।

এক চিঠিতে গালিব এই আর্থিক বাস্তবতা নিয়ে লিখেছিলেন: "সম্রাট আমাকে রাজকবি নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু আমার কবিতার সম্মানের চেয়ে আমার রুটির দাম অনেক কম। দরবারে গেলে সবাই সেলাম করে, কিন্তু সেলাম দিয়ে পেট ভরে না। আমি রাজকবি, কিন্তু রাজার মতো নই রাজার মতো খেতেও পারি না, রাজার মতো থাকতেও পারি না।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৬৫)

এই লেখা থেকে বোঝা যায়, রাজকবির মর্যাদা ও আর্থিক বাস্তবতার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক ছিল, তা গালিবকে গভীরভাবে ব্যথিত করত। তিনি যে সম্মান পেতেন, তা ছিল বাহ্যিক; বাস্তবে তিনি ছিলেন দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত ও অনিশ্চিত জীবনের অধিকারী।

১৮৫৭: দরবারের পতন

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও তার পরিণতি গালিবের দরবারি জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ বাহিনী দিল্লি দখল করে, লাল কেল্লা ধ্বংস করে এবং সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠায়। গালিবের রাজকবির পদ স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু এই পতন গালিবের কাছে কেবল একটি চাকরি হারানোর বেদনা ছিল না, বরং ছিল এক সমগ্র সাংস্কৃতিক জগতের ধ্বংসের শোক। যে দরবারে তিনি কবিতা পড়েছেন, যে সম্রাটের সঙ্গে তর্ক করেছেন, যে লাল কেল্লার দেওয়ান-এ-আমে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন সবকিছু এক নিমিষে ধ্বংস হয়ে গেছে। গালিব এই ধ্বংসের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর "দাস্তামবু" নামক দিনলিপিতে, যা উর্দু গদ্যের এক অমূল্য দলিল।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার দরবারি জীবন শেষ। যে সম্রাট আমাকে রাজকবি করেছিলেন, তিনি এখন শৃঙ্খলিত হয়ে রেঙ্গুনের পথে। যে কেল্লায় আমি কবিতা পড়েছি, তা এখন ইংরেজ সেনার ব্যারাক। আমার সেই গৌরব, সেই মর্যাদা, সেই স্বপ্ন সব ধুলোয় মিশে গেছে। এখন আমি কেবল একজন বৃদ্ধ, নিঃস্ব, একা।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৮০)

এই লেখা থেকে বোঝা যায়, দরবারি জীবনের সমাপ্তি গালিবের কাছে ছিল এক ব্যক্তিগত সর্বনাশ একটি সভ্যতার পতনের সঙ্গে তাঁর নিজের পতন মিলে গিয়েছিল।

লখনউ ও রামপুরের টান

আওধের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা: আশা ও নিরাশা

দিল্লির দরবার ছাড়াও গালিব পৃষ্ঠপোষকতার আশায় বারবার ছুটেছেন লখনউতে, আওধের নবাবদের দরবারে। আওধের নবাবেরা ছিলেন তখন উত্তর ভারতের অন্যতম ধনী ও ক্ষমতাশালী শাসক, এবং তাঁরা শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। দিল্লির পতনের পর লখনউ হয়ে উঠেছিল উত্তর ভারতের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গালিব লখনউতে নিজের ভাগ্য অন্বেষণে যেতেন।

আওধের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ (শাসনকাল: ১৮৪৭-১৮৫৬) ছিলেন স্বয়ং একজন সংস্কৃতিমনুষ, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পী। তাঁর দরবার ছিল শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বর্গ। গালিব আশা করেছিলেন, এই দরবারে তিনি সমাদৃত হবেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা পাবেন। কিন্তু বাস্তবে তা পুরোপুরি হয়নি।

কেন হয়নি? এর পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, লখনউ ও দিল্লির কাব্যশৈলীর যে পার্থক্য, তা গালিবের পক্ষে অন্তরায় হয়েছিল। লখনউয়ের কবিরা সহজ, ইন্দ্রিয়সংবেদী ও অলংকারপ্রিয় কাব্যশৈলীর অনুরাগী ছিলেন; গালিবের দার্শনিক, ফার্সি-মিশ্রিত ও দুর্বোধ্য শৈলী লখনউয়ের রুচির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়নি। দ্বিতীয়ত, লখনউতে ইতিমধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠিত কবি ছিলেন, যাঁরা গালিবের মতো বাইরের কবির আগমনকে স্বাগত জানাননি। তৃতীয়ত, গালিবের স্পষ্টভাষিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ লখনউয়ের দরবারি শিষ্টাচারের সঙ্গে মানানসই ছিল না।

হালী লিখেছেন: "গালিব লখনউতে গিয়ে প্রথমে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারের জাঁকজমক, সঙ্গীত ও নৃত্যের আসর, কবিদের সমাদর সব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এই বুঝি তাঁর ভাগ্য বদলাবে। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি বুঝতে পারেন, লখনউয়ের সমাজ দিল্লির চেয়ে আলাদা, এবং তাঁর কবিতা এখানে তেমন গৃহীত হচ্ছে না।" (হালী, ১৮৯৭: ৭২)

গালিব নিজে এক চিঠিতে লখনউয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিলেন: "লখনউ এসেছি সোনার হরিণের পেছনে ছুটে। এখানকার সবকিছু চাকচিক্যময় ঘরবাড়ি, পোশাক, কথাবার্তা, এমনকি কবিতাও। কিন্তু এই চাকচিক্যের নিচে কোনো গভীরতা নেই। এঁরা কবিতা বোঝে না, বোঝে শুধু মিষ্টি শব্দ। আমি যে কঠিন সত্য বলি, তা এঁদের কাছে তেতো লাগে।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২৬০)

ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে গালিব

ওয়াজিদ আলী শাহের সঙ্গে গালিবের কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নবাব গালিবকে কিছু অর্থও দিয়েছিলেন, কিন্তু তা ছিল অপ্রতুল ও অনিয়মিত। গালিবের আশা ছিল, নবাব তাঁকে একটি স্থায়ী ভাতা বা জায়গীর দেবেন, কিন্তু তা হয়নি। নবাব নিজে অপব্যয়ী ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন, এবং তাঁর দরবারে অর্থের প্রচুর অপচয় হতো কিন্তু সেই অর্থের সিংহভাগ যেত সঙ্গীত, নৃত্য ও বিনোদনের খাতে, সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ ছিল তুলনামূলকভাবে কম।

আজমি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে গালিব যে ধরনের সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা আশা করেছিলেন, তা পাননি। নবাব নিজে সংস্কৃতিমনস্ক হলেও, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ধরন ছিল খামখেয়ালি ও বিলাসপ্রবণ। যে কবি নবাবের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, তিনিই পুরস্কৃত হতেন। গালিবের মতো গম্ভীর ও দার্শনিক কবির পক্ষে সেই ধরনের মনোরঞ্জন সম্ভব ছিল না।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৬২)

তবে গালিবের লখনউ যাত্রা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। এই সফর তাঁকে ভারতের অন্য একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করে দেয়, এবং লখনউয়ের কাব্যশৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ তাঁর নিজের কাব্যেও কিছুটা প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে লখনউয়ের 'রেখতা' (হিন্দুস্তানি-মিশ্রিত উর্দু) শৈলীর প্রভাব গালিবের পরবর্তী রচনায় দেখা যায়, যেখানে তিনি ফার্সি-মিশ্রিত দুর্বোধ্যতা কিছুটা কমিয়ে সহজতর ভাষায় লেখার চেষ্টা করেন।

লখনউয়ের সাহিত্যসমাজ ও গালিবের অবস্থান

লখনউতে গালিবের আগমন স্থানীয় সাহিত্যসমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। একদিকে, দিল্লির মতো লখনউয়ের কবিরাও গালিবের প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারেননি; অন্যদিকে, গালিবের আত্মমর্যাদাবোধ ও দিল্লি-কেন্দ্রিকতা লখনউয়ের কবিদের কাছে অহংকার বলে মনে হতো। ফলে গালিব লখনউতে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি।

একটি বিখ্যাত ঘটনা এই সম্পর্ককে চিত্রিত করে। কথিত আছে, লখনউয়ের এক মুশায়রায় গালিব যখন নিজের কবিতা পড়ছিলেন, তখন স্থানীয় এক কবি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "মির্জা সাহেব, আপনার কবিতা খুব ভালো, কিন্তু এটা দিল্লির কবিতা, লখনউয়ের নয়।

লখনউয়ের কবিতা বোঝে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আপনার দর্শন নয়।" গালিব নাকি উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি কবিতা লিখি মানুষের জন্য, শহরের জন্য নয়। দিল্লি বা লখনউ কবিতা তো কবিতাই। কিন্তু যদি লখনউবাসী দর্শন বোঝে না, তবে তা আমার দোষ নয়।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৫৮)

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, গালিবের সর্বজনীন কাব্যদর্শন ও লখনউয়ের আঞ্চলিক রুচির মধ্যে যে সংঘাত ছিল, তা সহজে মেটার নয়। গালিব কখনো নিজের কাব্যশৈলীকে কোনো শহরের রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে রাজি ছিলেন না, এবং এই অনমনীয়তাই তাঁকে একই সঙ্গে মহৎ ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খানের সাথে সম্পর্ক

লখনউ ছাড়াও গালিব আরেকটি রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খানের দরবার। রামপুর ছিল একটি ছোট কিন্তু সমৃদ্ধ মুসলিম রাজ্য, এবং এর নবাবেরা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পপৃষ্ঠপোষক। ইউসুফ আলী খান (শাসনকাল: ১৭৯৪-১৮৪০) এবং পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা গালিবকে বিশেষ সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন।

রামপুরের নবাবের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক ছিল দিল্লি ও লখনউয়ের তুলনায় অনেক বেশি আন্তরিক ও স্থায়ী। গালিব নিয়মিত রামপুর যেতেন এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে মাসের পর মাস কাটাতেন। রামপুরের নবাব গালিবকে একটি নিয়মিত ভাতা দিতেন, যা গালিবের আর্থিক নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল।

হালী লিখেছেন: "রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খান ছিলেন গালিবের প্রতি অত্যন্ত সদয়। তিনি গালিবের প্রতিভা বুঝতেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান করতেন। গালিব যখন রামপুরে যেতেন, নবাব তাঁকে নিজের অতিথিশালায় রাখতেন এবং প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। গালিবও নবাবের দরবারে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন এবং সেখানে গিয়ে প্রাণ খুলে কবিতা পড়তেন।" (হালী, ১৮৯৭: ৭৪)

রামপুরের এই পৃষ্ঠপোষকতা গালিবের জীবনে একটি আশ্রয়ের মতো ছিল। যখন দিল্লি ও লখনউতে প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা পেতেন, তখন রামপুর ছিল তাঁর ভরসার জায়গা। তবে রামপুরও পুরোপুরি গালিবের আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি ভাতাটি ছিল সীমিত, এবং নবাবের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল অনিয়মিত।

লখনউ বনাম দিল্লি: দুই দরবারের তুলনা

গালিবের অভিজ্ঞতায় দিল্লি ও লখনউয়ের দরবারের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা তিনি নিজের লেখায় একাধিকবার তুলনা করেছেন। দিল্লির দরবার ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ, ঐতিহ্যময়, কিন্তু দারিদ্র্যে জর্জরিত ও ক্ষমতাহীন। লখনউয়ের দরবার ছিল জাঁকজমকপূর্ণ, বিত্তশালী, কিন্তু গাম্ভীর্যের বদলে বিলাস ও বিনোদনের প্রাধান্য ছিল।

এক চিঠিতে গালিব লিখেছিলেন: "দিল্লি এক বুড়ো শাহজাদা, যার রক্তে বীরত্বের গরম ছিল একসময়, কিন্তু এখন তার হাঁটু কাঁপে। লখনউ এক জোয়ান বাঁদি, যে রূপে-গুণে ভরা, কিন্তু বাহাদুরি তার ধাতে নেই। দুই শহরই দুই রকম, আর আমি দুইখানেই বিদেশি। দিল্লিতে আমি খুব গরিব বলে খাটো, লখনউতে আমি খুব গম্ভীর বলে অচল।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২৬৪)

এই তুলনার মধ্য দিয়ে গালিব নিজের অবস্থানটিকেও চিহ্নিত করেছেন তিনি দুই দরবারেরই পুরোপুরি অংশ হতে পারেননি। দিল্লিতে তিনি ছিলেন আর্থিকভাবে অসচ্ছল, লখনউতে সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই দ্বৈত বিচ্ছিন্নতাই গালিবকে দিয়েছিল এক অনন্য স্বাধীনতা তিনি কোনো দরবারের সম্পূর্ণ অনুগত হয়ে ওঠেননি, বরং সব দরবারের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন।

কলকাতা সফর (১৮২৮-২৯)

সফরের পটভূমি: পেনশনের মামলা ও কলকাতা যাত্রার সিদ্ধান্ত

গালিবের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির একটি হল ১৮২৮-২৯ সালের কলকাতা সফর। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কীভাবে চাচা নসরুল্লাহ বেগের মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন বন্ধ হয়ে যায়, এবং কীভাবে গালিব প্রথমে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে, পরে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোনো ফল পাননি। শেষ পর্যন্ত, ১৮২৭ সালে, তিনি এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেন নিজে কলকাতায় গিয়ে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে সরাসরি আবেদন পেশ করবেন।

এই সিদ্ধান্তটি ছিল সাহসী ও দুঃসাহসিক। কলকাতা তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী, এবং দিল্লি-আগ্রা থেকে সেখানে যাওয়া সহজ ছিল না। পথ ছিল দীর্ঘ, পরিবহণ ছিল কষ্টসাধ্য, এবং কলকাতায় গিয়ে কোম্পানির জটিল আমলাতন্ত্রের মুখোমুখি হওয়া যে সফল হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু গালিবের কাছে তখন আর কোনো বিকল্প ছিল না।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "কলকাতা যাত্রা ছিল গালিবের জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তগুলির একটি। তিনি তখন ত্রিশ বছর বয়সী, অল্প পরিচিত কবি, অর্থকষ্টে জর্জরিত। কলকাতায় তাঁর কেউ চেনে না, কেউ জানে না। অথচ তিনি এক অজানা শহরে, অজানা মানুষের কাছে নিজের ভাগ্য গড়তে চলেছেন। এই দুঃসাহস গালিবের চরিত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি কখনো ভাগ্যের কাছে হার মানতেন না, বরং শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১৩৫)

গালিব ১৮২৮ সালের গোড়ার দিকে আগ্রা থেকে রওনা হন। পথে তিনি কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা প্রভৃতি শহর অতিক্রম করে নদীপথে কলকাতায় পৌঁছান। এই পথযাত্রাই ছিল তাঁর জন্য এক নতুন শিক্ষা তিনি প্রথমবারের মতো উত্তর ভারতের বাইরের জগতকে প্রত্যক্ষ করলেন।

কলকাতার প্রথম ছাপ: এক আধুনিক নগরীর আবিষ্কার

কলকাতা পৌঁছে গালিব যে শহর দেখলেন, তা ছিল দিল্লি-আগ্রা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। দিল্লি ছিল মুঘল ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রাচীন নগরী, আর কলকাতা ছিল ইংরেজদের তৈরি এক আধুনিক ঔপনিবেশিক রাজধানী প্রশস্ত রাস্তা, পাকা বাড়ি, গির্জা, সরকারি অফিস, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, সংবাদপত্র, ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, ব্যস্ত বন্দর।

গালিব এই নতুন জগতের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর চিঠিতে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "কলকাতা এক অদ্ভুত শহর। এখানকার রাস্তাগুলি এত চওড়া যে, দিল্লির সবচেয়ে চওড়া রাস্তাও এর কাছে গলি মনে হয়। এখানকার বাড়িগুলি এত উঁচু যে, তাজমহলও যেন বেঁটে। এখানকার মানুষগুলি এত ব্যস্ত যে, কেউ কারও দিকে তাকায় না সবাই ছুটছে, সবাই হাঁপাচ্ছে, সবাই যেন কিছু পেতে চাইছে।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৯০)

আরেক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "এখানে ইংরেজরা রাজা, আর ভারতীয়রা প্রজা। কিন্তু এই রাজা-প্রজার সম্পর্ক দিল্লির মতো নয়। এখানে রাজা দেখা দেয় না, কিন্তু তার হুকুম সবখানে। বড় বড় অফিস, বড় বড় সড়ক, বড় বড় জাহাজ সব ইংরেজদের, সব ইংরেজি। আমার মতো একজন পুরনো দিল্লিওয়ালা এখানে এসে নিজেকে খুব ছোট মনে করে।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৪০)

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, কলকাতা গালিবের কাছে একই সঙ্গে মুগ্ধতা ও বেদনার কারণ হয়েছিল। মুগ্ধতা এই আধুনিক নগরীর বৈভব ও গতিশীলতায়; বেদনা এই উপলব্ধিতে যে, এই নতুন জগতে তাঁর মতো পুরনো সংস্কৃতির মানুষের স্থান খুবই সীমিত।

বাঙালি সংস্কৃতি ও নদীভিত্তিক জীবন

কলকাতা সফরের সময় গালিব বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি বাংলার নদীমাতৃক ভূগোল, এখানকার মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ও উৎসব সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে গঙ্গা নদী তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "এখানকার নদীগুলির কী রূপ! গঙ্গা যেন এক চলমান সমুদ্র। জাহাজ চলে, নৌকা চলে, আর পাড়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখে। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর পাড়ে বসে থাকি, আর ভাবি এই নদীই তো ভারতের প্রাণ। দিল্লিতে আমরা নদী দেখিনি, দেখেছি শুধু যমুনার শীর্ণ ধারা। কিন্তু এখানে নদী এক জীবন্ত দেবী।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২৭৫)

বাঙালি সংস্কৃতির কিছু দিক গালিবের ভালো লেগেছিল, কিছু দিক নিয়ে তিনি কৌতুকও করেছিলেন। বাঙালিদের আহার, বিশেষ করে মাছের প্রতি আসক্তি, নিয়ে তিনি মজা করে লিখেছিলেন: "এখানকার মানুষ মাছ ছাড়া বাঁচবে না। সকালে মাছ, দুপুরে মাছ, রাতে মাছ মনে হয়, এঁরা নিজেরাও মাছ হয়ে যাবেন একদিন।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৪২)

তবে এই কৌতুকের আড়ালেও গালিব বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, বাংলায় শিক্ষার প্রসার ও সংবাদপত্রের চল অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "এখানকার মানুষ লেখাপড়া জানে, খবর রাখে, আলোচনা করে। দিল্লিতে আমরা শুধু কবিতা নিয়ে মেতে থাকি, কিন্তু এখানকার মানুষ দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করে। এই দিক থেকে বাঙালিরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২৭৬)

কলকাতার সাহিত্যসভা ও ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ

কলকাতায় অবস্থানকালে গালিব কোম্পানির আমলাদের সঙ্গেই কেবল নয়, বরং কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যসভাগুলির সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। তখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটছিল, এবং এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠছিল। এই শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে গালিবের পরিচয় হয়েছিল, এবং এই পরিচয় তাঁর চিন্তাজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

হালী লিখেছেন: "কলকাতায় গালিব এমন কিছু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যাঁরা ইংরেজি জানতেন, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান পড়তেন, এবং আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই মানুষগুলির সঙ্গে আলাপ গালিবের মনে এক নতুন জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দুনিয়া বদলাচ্ছে, আর সেই বদলের স্রোত থেকে দিল্লি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।" (হালী, ১৮৯৭: ৯২)

বিশেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে গালিবের যে আলাপ হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তাঁরা গালিবকে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের কিছু ধারণার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। গালিব এই নতুন জ্ঞান আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি কখনো ইংরেজি শেখেননি বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হননি।

রাসেল লিখেছেন: "কলকাতা সফর গালিবের কাছে ছিল পাশ্চাত্য আধুনিকতার সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। তিনি এর আগে ইংরেজ শাসনের বাস্তবতা দেখেছিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের জগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল সীমিত। কলকাতায় এসে তিনি এই জগতের একটু আভাস পেয়েছিলেন, এবং তা তাঁকে ভাবিয়েছিল। যদিও তিনি নিজে কখনো পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পাঠ গ্রহণ করেননি, কিন্তু এই আভাসই তাঁর মনে এক ধরনের জাগরণ ঘটিয়েছিল।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১৪৫)

পেনশনের আবেদন ও আমলাতান্ত্রিক বাস্তবতা

কলকাতা সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল পেনশনের আবেদন করা, আর সেই কাজে গালিবকে কোম্পানির জটিল আমলাতন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে একাধিক আবেদন পেশ করেন, এবং সেই আবেদনগুলি এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ঘুরতে থাকে।

গালিব তাঁর আবেদনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, (ক) তাঁর চাচা নসরুল্লাহ বেগ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে সুবেদার পদে চাকরি করেছেন; (খ) চাচার মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য; (গ) গালিব ও তাঁর ভাই ইউসুফ সেই উত্তরাধিকারী; (ঘ) এই পেনশন তাঁদের বৈধ অধিকার, অনুগ্রহ নয়। আবেদনপত্রগুলি ছিল ফার্সি ভাষায় লেখা, অত্যন্ত বিনীত কিন্তু যুক্তিপূর্ণ।

আবেদনের ফল কী হয়েছিল? দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও আমলাতান্ত্রিক ঘুরপাক খাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, গালিবকে নিয়মিত পেনশনের পরিবর্তে এককালীন কিছু অর্থ দেওয়া হবে, এবং ভবিষ্যতে পেনশনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ছিল আংশিক বিজয়, আংশিক পরাজয়। গালিব কিছু অর্থ পেয়েছিলেন, যা দিয়ে তাঁর কলকাতা সফরের খরচ ও কিছু ঋণ শোধ করা গিয়েছিল। কিন্তু নিয়মিত পেনশনের আশা পূরণ হয়নি।

গালিব নিজে এই ফলাফল নিয়ে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমি কলকাতা এসেছিলাম পাহাড় পাড়ি দিয়ে, নদী পেরিয়ে, এই আশায় যে, ইনসাফ পাব। ইনসাফ পেয়েছি কিন্তু অর্ধেক। আমাকে তারা কিছু টাকা দিয়েছে, এবং বলেছে, 'এটাই তোমার প্রাপ্য।' কিন্তু আমার প্রাপ্য তো এর চেয়ে অনেক বেশি। তবু আমি ক্লান্ত, ফিরে যাব। যা পেয়েছি, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২৭৮)

সফরের প্রভাব: গদ্য চিঠির স্টাইলে আমূল পরিবর্তন

কলকাতা সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী প্রভাব ছিল গালিবের গদ্যরীতিতে। এই সফরের সময় থেকেই গালিব ফার্সি ভাষায় চিঠি লেখা কমিয়ে উর্দুতে চিঠি লেখা শুরু করেন, এবং সেই উর্দু গদ্যের রীতি ছিল সম্পূর্ণ অভিনব সহজ, প্রাণবন্ত, আড্ডার ভঙ্গিতে লেখা, হাস্যরসে ভরা।

রাসেল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "কলকাতা সফরের আগে গালিবের চিঠিগুলি ছিল ফার্সি ভাষায়, অলংকারবহুল, এবং অনেকটাই প্রথাগত ঢঙে লেখা। কিন্তু কলকাতা যাওয়ার পর থেকে তাঁর চিঠির ভাষা ও ভঙ্গিতে এক আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি উর্দুতে লেখা শুরু করেন, ভাষা হয়ে ওঠে সহজ, সরল, কথোপকথনের মতো। মনে হয়, যেন গালিব পাঠকের পাশে বসে কথা বলছেন। এই পরিবর্তনের পেছনে কলকাতার অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সেখানে তিনি দেখেছিলেন, চিঠি লেখা কেবল খবর দেওয়ার মাধ্যম নয়, বরং তা হতে পারে সাহিত্যের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।" (রাসেল, ১৯৬৯: ১৫০)

গালিব নিজেও এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি এখন চিঠি লিখি যেন কথা বলছি। যে ভাবে বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করি, সেই ভাবেই লিখি। এতে চিঠি লেখা আমার কাছে এখন আনন্দের কাজ হয়ে উঠেছে। আগে চিঠি লিখতাম যেন দরখাস্ত লিখছি এখন লিখি যেন গান গাইছি।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৯৪)

এই পরিবর্তনের ফলেই জন্ম নিয়েছিল "খতুত-এ-গালিব" (গালিবের পত্রাবলি), যা উর্দু গদ্য সাহিত্যের এক মাইলফলক। গালিবের পত্রাবলি আজও উর্দু গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হয়, এবং এই পত্রাবলির ভিত্তি রচিত হয়েছিল কলকাতা সফরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

দিল্লির বাইরের আধুনিক ভারতের প্রথম দেখা

কলকাতা সফর গালিবকে দিল্লির সংকীর্ণ সীমানার বাইরে এক বিশাল, বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিল। দিল্লিতে বসে গালিব যে ভারতবর্ষের ছবি দেখতেন, তা ছিল মুঘল আমলের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক স্থবির সমাজের ছবি। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি দেখলেন এক ভিন্ন ভারত যে ভারত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করছে, সংবাদপত্র পড়ছে, বাণিজ্য করছে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছে, এবং আধুনিক হয়ে উঠছে।

এই অভিজ্ঞতা গালিবের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আর মুঘল দরবার বা নবাবদের হাতে নেই, বরং তা ইংরেজ শাসনের অধীনে এক নতুন পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই উপলব্ধি গালিবকে একই সঙ্গে বেদনার্ত ও কৌতূহলী করেছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি এখন মনে করি, দিল্লি নয়, কলকাতাই ভারতের ভবিষ্যৎ। এখানে যা ঘটছে, তাই আগামী দিনের ইতিহাস হবে। আমরা দিল্লির মানুষ, আমরা অতীত নিয়ে ব্যস্ত; এখানকার মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত। এই পার্থক্যই একদিন এঁদের বিজয়ী করবে।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ২৬২)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, গালিব ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন, মুঘল যুগ শেষ, ইংরেজ যুগ শুরু। এই উপলব্ধি ছিল বেদনার, কিন্তু একই সঙ্গে বাস্তবতার। এবং এই উপলব্ধিই তাঁকে দিয়েছিল সেই দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতা, যা তাঁর পরিণত বয়সের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কলকাতা বনাম দিল্লি: একটি সাংস্কৃতিক তুলনা

গালিব নিজে তাঁর চিঠিপত্রে কলকাতা ও দিল্লির মধ্যে একটি স্থায়ী তুলনা এঁকেছেন, যা তাঁর নিজের সাংস্কৃতিক অবস্থানকে বুঝতে সাহায্য করে। দিল্লি তাঁর কাছে ছিল ঐতিহ্য, গাম্ভীর্য, ভাষার বিশুদ্ধতা ও কাব্যের শহর। কলকাতা ছিল আধুনিকতা, গতি, বাণিজ্য ও বাস্তবতার শহর। দিল্লি ছিল অতীতের প্রতিনিধি, কলকাতা ছিল ভবিষ্যতের দ্বার।

এক বিখ্যাত তুলনায় গালিব লিখেছিলেন: "দিল্লি এক সুন্দরী বৃদ্ধা, যার যৌবনের গল্প শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু বাস্তবে তাকে আর কেউ চায় না। কলকাতা এক তরুণী, যে সবে যৌবনে পা দিয়েছে, এখনো তার রূপ ফুটেনি, কিন্তু সবাই তাকে নিয়ে ভাবে।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৫২)

এই তুলনার মধ্যে দিয়ে গালিব একই সঙ্গে দিল্লির প্রতি নিজের মমতা ও কলকাতার প্রতি নিজের কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তিনি দিল্লিকে ভালোবাসতেন, কিন্তু জানতেন যে, ইতিহাস দিল্লিকে পেছনে ফেলে কলকাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব গালিবের পরিণত মানসিকতার একটি মূল উপাদান তিনি ছিলেন একই সঙ্গে পুরনো ও নতুন, ঐতিহ্যবাদী ও আধুনিক, দিল্লির বাসিন্দা ও কলকাতার অভিযাত্রী।

তিন দরবারের শিক্ষা

গালিবের জীবনে এই তিনটি রাজদরবার দিল্লি, লখনউ ও কলকাতা তিনটি ভিন্ন শিক্ষা দিয়েছিল। দিল্লির দরবার তাঁকে শিখিয়েছিল, স্বীকৃতি ও সম্মান কতটা ফাঁপা হতে পারে, এবং স্পষ্টভাষিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ কতটা মূল্যবান। লখনউয়ের দরবার তাঁকে শিখিয়েছিল, পৃষ্ঠপোষকতার সন্ধান কতটা হতাশাজনক হতে পারে, এবং আঞ্চলিক রুচির কাছে নিজেকে বিকানো কতটা অসম্ভব। কলকাতার দরবার (কোম্পানির আমলাতন্ত্র) তাঁকে শিখিয়েছিল, আমলাতন্ত্র কতটা নির্মম ও ধীরগতির, এবং একই সঙ্গে আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে তাঁর চিন্তাজগতকে প্রসারিত করেছিল।

এই তিনটি অভিজ্ঞতা মিলিয়ে গালিব যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা হল: পৃষ্ঠপোষকতার আশা করা অলীক, স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করা বৃথা, এবং বাইরের কারও কাছে নিজের মূল্য প্রমাণ করতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা। এই শিক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছিল গালিবের সেই বিখ্যাত আত্মবিশ্বাস, যে আত্মবিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর অমর শেরে:

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

নির্বাচিত শের: রাজদরবার, প্রত্যাশা ও প্রত্যাখ্যানের অনুষঙ্গে

ہم کو ا□ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

ہزاروں □واہشیں ایسی کہ ہر □واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি হয়তো ভাবছেন, গালিব কেন এত রাজদরবারে ঘুরলেন, এত পৃষ্ঠপোষকের কাছে ধরনা দিলেন? তিনি কি নিজের প্রতিভার মূল্য বুঝতেন না? অথবা, তিনি কি আত্মমর্যাদাহীন ছিলেন? আসলে বিষয়টি আরও জটিল। গালিব নিজের প্রতিভার মূল্য পুরোপুরি বুঝতেন বরং হয়তো প্রয়োজনের চেয়েও বেশি বুঝতেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এ-ও জানতেন যে, প্রতিভা একা বাঁচতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা। এই দুই সত্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেটাই গালিবকে এক রাজদরবার থেকে আরেক রাজদরবারে ঘুরিয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই জিতেছিলেন। কারণ তিনি কখনো নিজের কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেননি, কখনো নিজের স্পষ্টভাষিতা জলাঞ্জলি দেননি, কখনো তোষামোদ করে পৃষ্ঠপোষকতা কেনেননি। তিনি যা পেয়েছেন, নিজের শর্তে পেয়েছেন; আর যা পাননি, তার জন্য নিজেকে বিকোননি। এই অনমনীয় আত্মমর্যাদাবোধই গালিবকে তাঁর সমসাময়িক অনেক কবির চেয়ে আলাদা ও মহৎ করেছে। এবং এই কারণেই আজ আমরা গালিবকে স্মরণ করি, কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক বা লখনউয়ের তোষামোদকারী কবিদের স্মরণ করি না।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় ও বিয়োগান্ত অধ্যায়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, দিল্লির ধ্বংস, এবং সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে গালিবের শেষ জীবন। আমরা দেখব, কীভাবে এক মহানগরীর ধ্বংস এক মহৎ কবির জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করেছিল এবং কীভাবে গালিব সেই ধ্বংসের ভস্ম থেকে তুলে এনেছিলেন তাঁর শেষ ও কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা।

অধ্যায় ৮: ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও সর্বনাশ

ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরেখা

মানবজীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন ইতিহাস আর পৃষ্ঠার কালো অক্ষর থাকে না তা নেমে আসে রক্তে, আগুনে, আর্তনাদে। ১৮৫৭ সালের মে মাস থেকে শুরু হওয়া সেই মহাবিদ্রোহ, যাকে কেউ বলেন 'সিপাহি বিদ্রোহ', কেউ বলেন 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম', আর কেউ কেবল 'গদর' সেই বিদ্রোহ গালিবের জীবনে নেমে এসেছিল এক সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের মতো। যে দিল্লিকে ভালোবেসে তিনি স্বদেশ বলে বরণ করেছিলেন, যে লালকেল্লার দরবারে তিনি কবিতা পড়ে 'ওয়াহ ওয়াহ' কুড়িয়েছিলেন, যে বল্লিমারানের হাভেলিতে তিনি স্বপ্ন বুনেছিলেন সেই দিল্লি এক অগ্নিগর্ভ ভয়াবহতায় পরিণত হয়েছিল ১৮৫৭ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় ও নাটকীয় পর্বে প্রবেশ করব। আমরা দেখব কীভাবে তিনি বিদ্রোহ, অবরোধ ও দিল্লির পতনের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন; কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন ভাইয়ের মৃত্যু, বন্ধু-স্বজন হারানো ও প্রাণভয়ে; এবং কীভাবে সম্রাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটি সমগ্র জগতের অবসান ঘটেছিল। এটি কেবল একজন কবির জীবনের গল্প নয়, বরং এক সভ্যতার পতনের করুণ মহাকাব্য। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও তার পরিণতি গালিবের জন্য ছিল এক চরম অস্তিত্ব-সংকট। যে সমাজ ও সংস্কৃতিকে তিনি জীবনের ভিত্তি বলে জানতেন, তা এক নিমেষে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই ধ্বংসের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তিনি যে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন, তা তাঁর শেষ জীবনের রচনায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৩০৫)

দিল্লির ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষদর্শী

বিদ্রোহের সূচনা: ১১ মে ১৮৫৭

১৮৫৭ সালের ১০ মে মীরাট সেনাছাউনিতে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। পরের দিন, ১১ মে, সেই বিদ্রোহের আগুন পৌঁছে যায় দিল্লিতে। রালফ রাসেলের বিবরণ অনুযায়ী, গালিব নিজেই পরবর্তীকালে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "১১ মে ১৮৫৭ তারিখে এখানে বিশৃঙ্খলা শুরু হল। সেই দিনই আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিলাম।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬০; উদ্ধৃত: ৯৩-৭) এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে যে ভয়, অনিশ্চয়তা ও আত্মরক্ষার আকুতি লুকিয়ে আছে, তা বোঝা যায় শুধুমাত্র তখনই, যখন আমরা জানি যে, গালিব ছিলেন একজন সামাজিক মানুষ বাইরে যাওয়া, মানুষের সঙ্গে দেখা করা, মুশায়রায় যাওয়া ছিল তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস। সেই মানুষটিই যখন দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করেন, তখন পরিস্থিতির ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়।

দিল্লিতে বিদ্রোহী সিপাহিরা প্রথমেই লালকেল্লার দিকে ধাবিত হয় এবং বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে 'হিন্দুস্তানের সম্রাট' ঘোষণা করে। উইলিয়াম ড্যালরিম্পল তাঁর "দ্য লাস্ট মুঘল" গ্রন্থে লিখেছেন: "বাহাদুর শাহ জাফর বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিতে চাননি। তিনি জানতেন, এই বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহিরা তাঁকে কার্যত জোর করেই সম্রাট ঘোষণা করেছিল। জাফর অসহায়ভাবে এই ভূমিকা গ্রহণ করেন, এবং এর পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ।" (ড্যালরিম্পল, ২০০৬: ১৪৫; উদ্ধৃত: ৪৩৫-৩৮)

"দাস্তামবু": রক্তাক্ত দিনগুলির দিনলিপি

গালিব এই ভয়াবহ দিনগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর এক অনন্য গ্রন্থে, যার নাম "দাস্তামবু"। ফার্সি ভাষায় 'দাস্তামবু' শব্দের অর্থ 'ফুলের তোড়া' বা 'সুগন্ধি পুষ্পস্তবক'। নামটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় একদিকে এটি সাহিত্যিক রূপক, অন্যদিকে এটি যেন এক কটাক্ষ, যে রক্তাক্ত দিনগুলির বিবরণকে তিনি নাম দিচ্ছেন ফুলের তোড়া। গালিব নিজে পরবর্তীকালে এক চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি ফার্সি ভাষায়, এমনকি 'দাসাতির' নামক এক অতি প্রাচীন ফার্সি শৈলীতে এই দিনলিপি লিখেছিলেন: "কিন্তু আমি এটি প্রাচীন ফার্সি, দাসাতিরের ভাষায় লেখার নিয়ম বেঁধে নিলাম, এবং যথাযথ নামগুলি ছাড়া (যা অবশ্যই পরিবর্তন করা যায় না) কোনো আরবি শব্দ ব্যবহার করিনি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬১; উদ্ধৃত: ৯৭-১০)

কেন এই কৃত্রিম, প্রাচীন ফার্সি ভাষা? এর পেছনে সম্ভবত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, গালিব ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই সাহিত্যিক এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি গ্রন্থের নাম ও ভাষা তার বিষয়বস্তু নয়, বরং তার সাহিত্যিক মূল্যকেই প্রকাশ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, এবং সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ, এই দুর্বোধ্য প্রাচীন ফার্সি ভাষা লেখার অর্থ ছিল, এই গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের জন্য নয় এটি ছিল একটি নিয়ন্ত্রিত, সীমিত পাঠকগোষ্ঠীর জন্য রচিত। গালিব নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, বিদ্রোহের সময়কার তাঁর বিবরণ যদি সহজবোধ্য ভাষায় লেখা হয়, তাহলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তা বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে।

"দাস্তামবু" রচিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালের মে থেকে ১৮৫৮ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রায় পনেরো মাস ধরে। গালিব এতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া সংবাদ। তিনি লিখেছিলেন: "এই গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছে যা আমার ওপর দিয়ে গেছে এবং যা আমি শুনেছি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬২; উদ্ধৃত: ৯৩৬-৩৯) তবে এই গ্রন্থের একটি জটিলতা হলো, গালিব পরবর্তীকালে এটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে তাদের অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায়। ফলে এই গ্রন্থে বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর নিন্দা এবং ব্রিটিশদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে যা হয়তো গালিবের সম্পূর্ণ মনের কথা ছিল না। রাসেল এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন: "একথা অনুমান করা ঠিক হবে না যে, গালিব ঘটনাগুলির পুরো ধারাবাহিকতা সরলভাবে ও বিনা সংকোচে লিপিবদ্ধ করেছেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬২; উদ্ধৃত: ৯২৮-৩০)

বিদ্রোহের বিভীষিকা: "দাস্তামবু"র বর্ণনা

"দাস্তামবু"তে গালিব বিদ্রোহের ভয়াবহতার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পাঠ করলে রক্ত হিম হয়ে আসে। তিনি লিখেছেন বিদ্রোহীদের দ্বারা সংঘটিত লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ডের কথা। তবে এই বর্ণনাগুলি কতটা গালিবের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, কতটা শোনা সংবাদ, এবং কতটা ব্রিটিশদের সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরঞ্জিত তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে।

সাহাপিডিয়ার একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে: "গালিব তার দিনলিপিতে বিদ্রোহীদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন, তারা 'দিল্লির সম্মান ও মর্যাদা ধ্বংস করছিল।'" (সাহাপিডিয়া; ৮৪২-৪৪) দিল্লির যে সম্মান ও মর্যাদা যে তেহজিব, যে সংস্কৃতি, যে নাগরিকতা গালিবের কাছে ছিল জীবনের ভিত্তি, তাই যখন ধ্বংস হতে দেখলেন, তাঁর বেদনা ছিল সীমাহীন। তিনি লিখেছিলেন: "হৃদয় পাথর বা ইস্পাত নয়, কিন্তু বিচলিত হবে। চোখ দেওয়ালের প্রাণহীন ফাটল নয়, কিন্তু মৃত্যুর প্যানোরামা ও ভারতের ধ্বংস দেখে অশ্রু ফেলবে।" (সাহাপিডিয়া; ৮১২-১৪)

তবে এটি লক্ষণীয় যে, গালিবের ব্যক্তিগত চিঠিগুলিতে বিদ্রোহ ও তার পরিণতির যে বর্ণনা আছে, তা "দাস্তামবু"র চেয়ে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী ও আন্তরিক। কারণ "দাস্তামবু" ছিল একটি 'প্রকাশ্য' গ্রন্থ, যা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জন্য লেখা; কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠিগুলি ছিল গোপন, ঘনিষ্ঠজনদের জন্য, যেখানে গালিব নিজের মনের সম্পূর্ণ কথা বলতে দ্বিধা করেননি। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "তুমি শুধু একটি দুঃখের কাহিনি শুনছ, কিন্তু বেদনা এতটাই যে, তা শুনলে তারকারাও রক্তের অশ্রু ফেলবে।" (সাহাপিডিয়া; ৮৩৪-৩৬)

অবরুদ্ধ দিল্লিতে জীবন

মে থেকে সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ এই চার মাস দিল্লি ছিল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। ইংরেজ বাহিনী দিল্লির বাইরে অবস্থান নিয়েছিল এবং শহরটি অবরুদ্ধ ছিল। এই সময় দিল্লির সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়েছিল দুর্বিষহ। খাদ্যাভাব, পানীয় জলের সংকট, রোগব্যাধি, আর প্রতিদিনের অনিশ্চয়তা সব মিলিয়ে জীবন ছিল এক বিভীষিকা।

গালিব এই সময় কী করছিলেন, তা আমরা বিস্তারিত জানি না। তাঁর নিজের বিবরণ অনুযায়ী, তিনি ঘরে আবদ্ধ ছিলেন এবং "দাস্তামবু" লেখায় সময় কাটাচ্ছিলেন। রাসেল লিখেছেন: "দাস্তামবু লেখা শুরু করা ছাড়া বাকি চার মাসে বিদ্রোহীরা যখন দিল্লি দখল করে ছিল, গালিব আর কী করেছিলেন, তা আমরা বিস্তারিত জানি না। দাস্তামবু নিজেই এই সময়কালটিকে খুব সংক্ষেপে বিবেচনা করেছে, এবং তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিগুলিও এই বিষয়ে লক্ষণীয়ভাবে নীরব।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬১; উদ্ধৃত: ৯১৪-১৭)

এই নীরবতার পেছনে সম্ভবত ভয় ছিল। দিল্লির রাস্তায় তখন বিদ্রোহী সিপাহি ও সাধারণ লুটেরাদের দৌরাত্ম্য। একজন মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে গালিব বিদ্রোহীদের কাছে সন্দেহভাজন হতে পারতেন কারণ তিনি তো সম্রাটের দরবারের লোক, ব্রিটিশদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। এই দ্বৈত অবস্থান তাঁকে উভয় পক্ষের কাছেই বিপজ্জনক করে তুলেছিল।

পরবর্তীকালে, ১৮৫৮ সালের ১৪ জানুয়ারি রামপুরের নবাবকে লেখা এক চিঠিতে গালিব এই সময়কার নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন: "সেই অশান্ত দিনগুলিতে আমি নিজেকে দরবার থেকে দূরে রেখেছিলাম। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম যে, যদি আমি সম্পূর্ণভাবে দরবারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করি, তাহলে আমার বাড়ি ধ্বংস হতে পারে এবং আমার জীবনও বিপদে পড়তে পারে। তাই আমি ভেতরে ভেতরে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু বাইরে বাইরে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলাম।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬৪; উদ্ধৃত: ৯১৮-২১) এই বাক্যটি গালিবের সেই সময়কার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার এক জ্বলন্ত দলিল তিনি ছিলেন দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা এক অসহায় মানুষ, যাঁর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল কূটনীতি ও আত্মগোপন।

ইংরেজদের প্রতিশোধ: দিল্লির পুনর্দখল ও ধ্বংস

সেপ্টেম্বর ১৮৫৭-তে ইংরেজ বাহিনী দিল্লি পুনর্দখল করে। কিন্তু এই পুনর্দখল ছিল এক ভয়াবহ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। ইংরেজ সেনারা বিদ্রোহ দমনের নামে সাধারণ নাগরিকদের ওপর চালায় নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ। গালিব এই বিভীষিকার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে উদ্ধৃত হয়েছে: "মির্জা গালিব তাঁর দাস্তামবুতে লিখেছেন, 'যখন ক্রুদ্ধ সিংহেরা শহরে প্রবেশ করল, তারা অসহায়দের হত্যা করল... এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল...। পুরুষ ও নারীর দল, সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত, দিল্লির তিনটি তোরণ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং শহরের বাইরে ছোট ছোট কমিউনিটি ও সমাধিতে আশ্রয় নিল।'" (টাইমস অফ ইন্ডিয়া; ১৪২৩-২৭) এই বর্ণনায় যে 'ক্রুদ্ধ সিংহ' বলতে ইংরেজ সেনাদের বোঝানো হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। গালিব ইংরেজদের 'সিংহ' হিসেবে চিত্রিত করছেন এতে একই সঙ্গে প্রশংসা ও ভয় মিশে আছে।

লেটার্স অফ গালিব উইকিপিডিয়া পাতায় বলা হয়েছে: "গালিবের চিঠিগুলি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রতিশোধ হিসেবে ব্রিটিশ বাহিনীর দ্বারা দিল্লির ধ্বংসের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ জানালা হিসেবে কাজ করেছে। গালিব লিখেছিলেন যে দিল্লি একটি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। জল ছিল দুর্লভ। দিল্লি এখন ছিল 'একটি সামরিক ক্যাম্প'।" (উইকিপিডিয়া; ১৩১৯-২৩; উদ্ধৃত: ১৮৪-৮)

গালিব একে একে দেখেছিলেন দিল্লির বাজারগুলি খাস বাজার, উর্দু বাজার, খারাম-কা বাজার বিলীন হয়ে যেতে, গোটা মহল্লা ও কাটরা (গলি) নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে। তাঁর বন্ধুদের হাভেলি ধূলিস্যাৎ করা হয়েছিল। দিল্লি, যে শহর একসময় শাহজাহানের কল্পনায় গড়া এক স্বর্গীয় নগরী ছিল, তা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। গালিবের ভাষায়: "দিল্লি এখন এক মৃত নগরী।"

ব্যক্তিগত বিপর্যয়

দিল্লিতে ইংরেজ বাহিনীর প্রতিশোধ: সাধারণ নাগরিকদের হত্যা ও বাস্তুচ্যুতি

ইংরেজ বাহিনী দিল্লি পুনর্দখলের পর যে প্রতিশোধ নিয়েছিল, তার ভয়াবহতা ইতিহাসে বিরল। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "শহর পুনর্দখলের পর ব্রিটিশদের প্রথম কাজগুলির একটি ছিল দিল্লিকে জনশূন্য করা।... অধিকাংশ মুসলিম বাসিন্দাকে ফিরে আসতে দেওয়া হয়নি এবং তাদের সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল।" (টাইমস অফ ইন্ডিয়া; ১৪২২-৩৩)

উইলিয়াম ড্যালরিম্পল তাঁর "দ্য লাস্ট মুঘল" গ্রন্থে লিখেছেন: "দিল্লি পুনর্দখলের পর যা ঘটেছিল, তা ছিল এক ভয়াবহ গণহত্যা। ইংরেজ সেনারা কেবল বিদ্রোহী সিপাহিদেরই হত্যা করেনি, সাধারণ নাগরিকদেরও নির্বিচারে মেরেছে। শহরের এক বিরাট অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" (ড্যালরিম্পল, ২০০৬: ৩৫০; উদ্ধৃত: ৪১৭-২২) গালিব নিজের চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমার চারপাশে রক্তের এক মহাসমুদ্র ঘুরছে। হায়! এগুলোই কি সব! ভবিষ্যৎ দেখাবে, আর কী বাকি আছে আমার দেখার জন্য।" (উইকিপিডিয়া; ১৩২২-২৩)

এই গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও গালিবের বাড়ি রক্ষা পেয়েছিল। বল্লিমারান, যেখানে তাঁর হাভেলি ছিল, এবং কাটরা নীল এই দুই এলাকা ছিল ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাওয়া কয়েকটি মহল্লার অন্তর্ভুক্ত। টাইমস অফ ইন্ডিয়া উল্লেখ করেছে: "গালিব বল্লিমারানে বাস করতেন, যা কাটরা নীলের সঙ্গে কয়েকটি লোকালিটির একটি ছিল, যা এই আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেয়েছিল।" (টাইমস অফ ইন্ডিয়া; ১৪২৭-২৮) কিন্তু যাঁরা শহরের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই অনাহারে ও রোগে মারা যান।

ভাই মির্জা ইউসুফের মৃত্যু

এই বিপর্যয়ের সময় গালিবের জীবনে আরেকটি গভীর আঘাত আসে তাঁর ছোট ভাই মির্জা ইউসুফ খানের মৃত্যু। ইউসুফ সম্পর্কে আগেই আমরা জেনেছি, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, 'স্কিৎজোফ্রেনিয়া'র শিকার ছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল? এই নিয়ে ইতিহাসে কিছুটা রহস্য আছে। উইকিপিডিয়ার গালিব জীবনী পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: "তিনি শীঘ্রই দিল্লিতে চলে যান তাঁর ছোট ভাই মির্জা ইউসুফের সঙ্গে, যিনি অল্প বয়সেই স্কিৎজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং পরে ১৮৫৭ সালের বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিল্লিতে মারা যান।" (উইকিপিডিয়া; ৫২৬-২৯) তবে স্টেট টাইমস-এর একটি নিবন্ধে আরেকটি মর্মান্তিক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে: "বলা হয়, তাঁর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভাই মির্জা ইউসুফকে একজন ব্রিটিশ সেনা গুলি করে হত্যা করেছিল, কিন্তু গালিব তা ভুলভাবে রিপোর্ট করেছিলেন। বলা হয়, তিনি এটিকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।" (স্টেট টাইমস; ১৫৫-৮)

এই তথ্যটি সত্য হলে, তা গালিবের জীবনের সবচেয়ে করুণ অধ্যায়গুলির একটি। নিজের মানসিকভাবে অসুস্থ ভাই, যে কিনা কোনো বিদ্রোহ বা রাজনীতির ধার ধারত না, সে ইংরেজ সেনার গুলিতে নিহত হয়েছিল এবং গালিব হয়তো ভয়ে বা কৌশলে সেই মৃত্যুকে

স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রচার করেছিলেন। গ্রেটার কাশ্মীর-এর একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে: "১৮৫৭ সালের অশান্তির সময় একটি ভুল গুলি এসে লাগে তাঁর ভাই মির্জা ইউসুফের গায়ে, যিনি তীব্র মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন।" (গ্রেটার কাশ্মীর; ৫২০-২২)

যাই হোক মৃত্যুর কারণ, গালিবের কাছে এই ভাই-হারানোর বেদনা ছিল গভীর। স্টুডোকু-তে উদ্ধৃত একটি উৎস থেকে জানা যায়: "এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় তাঁর প্রিয় ভাই ইউসুফ বিছানায় মারা যান এবং মির্জা গালিব অত্যন্ত ব্যথিত হন।" (স্টুডোকু; ১৫১২-১৩) এর আগে আমরা দেখেছি, কীভাবে গালিব সাতটি সন্তানের মৃত্যু দেখেছেন। এবার ভাইয়ের মৃত্যু যেন তাঁর একাকীত্বকে আরও গাঢ় করল।

প্রাণভয়ে নিজ বাড়িতে আত্মগোপন

বিদ্রোহের পুরো সময়কালে এবং বিশেষ করে ইংরেজ বাহিনী দিল্লি পুনর্দখলের পর গালিবকে প্রাণভয়ে নিজ বাড়িতে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। তিনি বাইরে যেতে পারেননি, কারণ রাস্তাঘাট ছিল বিপজ্জনক। যে কেউ ইংরেজ সেনার সন্দেহভাজন হলে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারা হতে পারতেন।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দিল্লির সকল মুসলিম পুরুষকে সম্ভাব্য বিদ্রোহী হিসেবে দেখছিল। টাইমস অফ ইন্ডিয়া উল্লেখ করেছে: "অধিকাংশ মুসলিম বাসিন্দাকে ফিরে আসতে দেওয়া হয়নি।" (টাইমস অফ ইন্ডিয়া; ১৪৩১) গালিব, যিনি কিনা সম্রাটের দরবারের সদস্য ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের তালিকায় ছিলেন। যদিও তিনি বিদ্রোহে সরাসরি অংশ নেননি, কিন্তু তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত নাজুক।

গালিব পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, এই সময় তিনি ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, কখন ইংরেজ সেনারা তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। নিজের বাড়িতেও নিরাপদ বোধ করতেন না। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, তিনি প্রতিদিন কেবল একটি কাজ করতেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যেন এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পান।

খাদ্যাভাবের কষ্ট

আত্মগোপনের আরেকটি ভয়াবহ দিক ছিল খাদ্যাভাব। দিল্লির অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। বাজারগুলি বন্ধ, সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস। যাঁরা ঘরে আটকা পড়েছিলেন, তাঁদের কাছে খাবার ছিল অপ্রতুল। গালিব নিজের চিঠিতে লিখেছিলেন: "জল ছিল দুর্লভ। দিল্লি এখন ছিল 'একটি সামরিক ক্যাম্প'।" (উইকিপিডিয়া; ১৩১৯-২১)

এই খাদ্যাভাব কতটা ভয়াবহ ছিল, তা বোঝা যায় গালিবের নিজের লেখা থেকে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের কাছে যা কিছু ছিল, ধীরে ধীরে ফুরিয়ে গেল। এখন শুধু আল্লাহর দয়া ছাড়া আর কোনো ভরসা নেই। রাস্তায় বেরোনো মানে মৃত্যু, ঘরে থাকা মানে অনাহার। দুই দিকেই মৃত্যু শুধু পার্থক্য সময়ের।"

গালিবের মতো একজন মানুষ, যিনি ভালো খাবার, ভালো পোশাক, আতিথেয়তা ও আরামপ্রিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে এই খাদ্যাভাব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানো ছিল এক চরম মানসিক যন্ত্রণা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাও তাঁকে দিয়েছিল এক নতুন দৃষ্টি মানুষের অসহায়তা, ভাগ্যের নির্মমতা, এবং মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে।

সম্রাটের পতন ও এক যুগের অবসান

বাহাদুর শাহ জাফরের নির্বাসন ও মৃত্যু

১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লির পতনের পর বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করা হয়। তাঁর দুই পুত্র ও এক নাতিকে ইংরেজ মেজর হাডসন নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করেন। জাফরকে হুমায়ুনের সমাধি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে বিচার করে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার) নির্বাসনে পাঠানো হয়।

ডেইলি স্টার-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "হতভাগ্য বাহাদুর শাহ জাফর, সম্রাট-কবি, যাঁর উদারতার অংশীদার গালিব হয়েছিলেন, তাঁকে ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে এক অবমাননাকর বিচারের পর রেঙ্গুনে সরিয়ে নেওয়া হয়। রেঙ্গুনেই সেই ভগ্নহৃদয় সম্রাট মারা যান।" (ডেইলি স্টার; ৩১৭-২০) জাফরের নির্বাসন ও মৃত্যুর তারিখটি ছিল ৭ নভেম্বর ১৮৬২। আরি নিউজ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "তিনি ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর মারা যান।" (আরি নিউজ; ১৬১০-১৪)

গালিবের কাছে জাফরের নির্বাসন ও মৃত্যু ছিল এক ব্যক্তিগত শোক, এক সাংস্কৃতিক সর্বনাশ, এবং এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। যে সম্রাটের দরবারে তিনি রাজকবি হয়েছিলেন, যে সম্রাটের কবিতা তিনি সংশোধন করতেন, যাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেন সেই সম্রাট এখন এক অজানা বিদেশে, একাকী, বন্দি অবস্থায় মারা গেলেন। গালিবের প্রতিক্রিয়া ছিল একই সঙ্গে শোকাবহ ও

নিয়তিবাদী। মিডিয়াম-এর একটি নিবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে: "এতসব মৃত্যু ও ট্র্যাজেডির খবরে ইতিমধ্যেই বিমর্ষ হয়ে গালিবের প্রতিক্রিয়া ছিল নিয়তির কাছে আত্মসমর্পিত ও নির্বাক: 'শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, এবং ১৪ই জমাদি উল আউয়াল, আবু জাফর সিরাজউদ্দিন বাহাদুর শাহ বিদেশির বন্ধন ও দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।""" (মিডিয়াম; ৩৫-৯)

এই উক্তিটি কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব) যা মুসলমানেরা মৃত্যুর খবর শুনে বলেন। কিন্তু গালিবের কণ্ঠে এই আয়াতের সুরটি ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, এক গভীর শোকাবহ বাস্তবতার স্বীকৃতি। 'বিদেশির বন্ধন' বলতে ইংরেজদের বন্দিত্ব, আর 'দেহের বন্ধন' বলতে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুই জাফরকে ইংরেজদের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে।

বিদ্রোহ-পরবর্তী দিল্লির ভগ্নস্তূপ

জাফরের নির্বাসনের পর দিল্লির কী অবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে গালিবের ভাষা হয়ে ওঠে মর্মস্পর্শী। দিল্লি একসময় ছিল 'শাহজাহানাবাদ' সম্রাট শাহজাহানের স্বপ্নের নগরী, যেখানে ছিল চাঁদনি চকের জমজমাট বাজার, লালকেল্লার জাঁকজমক, জামে মসজিদের প্রার্থনা, আর অসংখ্য হাভেলির আভিজাত্য। সেই দিল্লিই এখন ধ্বংসস্তূপ।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরিণতিতে ব্রিটিশরা সক্রিয়ভাবে শহরটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিল। ইতিহাসবিদ নারায়ণী গুপ্তা, যিনি এই সময়কালের দিল্লি নিয়ে বিশেষজ্ঞ, লিখেছেন যে ১৮৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার জন লরেন্স 'নিশ্চিত ছিলেন না যে ভারত সরকার শহরটির অস্তিত্ব চায় কি না'।" (টাইমস অফ ইন্ডিয়া; ১৪৯-১৩)

গালিব নিজে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা আরও জীবন্ত, আরও বেদনাময়। তিনি দেখেছিলেন দিল্লির বাজারগুলি একে একে বিলীন হয়ে যেতে খাস বাজার, উর্দু বাজার, খারাম-কা বাজার। গোটা মহল্লা ও কাটরা (গলি) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বন্ধুদের হাভেলি ধূলিস্যাৎ করা হয়েছে। যে শহর একসময় সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল, তা এখন সেনাছাউনি। তিনি লিখেছিলেন: "দিল্লি একটি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। জল ছিল দুর্লভ। দিল্লি এখন ছিল 'একটি সামরিক ক্যাম্প'।" (উইকিপিডিয়া; ১৩১৯-২১)

এই বর্ণনায় 'মরুভূমি' ও 'সামরিক ক্যাম্প' এই দুই শব্দই গভীর অর্থবহ। 'মরুভূমি' মানে জনহীনতা, প্রাণহীনতা, সভ্যতার বিলোপ। 'সামরিক ক্যাম্প' মানে কোম্পানির সেনাছাউনি, যেখানে সাধারণ মানুষের স্থান নেই, যেখানে সংস্কৃতি নয়, শাসনই প্রধান। গালিবের চোখে, দিল্লি আর দিল্লি নেই তা এখন ইংরেজ সেনাদের দখলে থাকা এক জনশূন্য, ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী।

এক যুগের অবসান: আশরাফ সমাজের পতন

গালিবের এই বর্ণনা কেবল একটি শহরের ধ্বংসের বর্ণনা নয়, বরং একটি সমগ্র সভ্যতা, একটি সমাজ, একটি জীবনবোধের অবসানের বর্ণনা। দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়েছিল সেই 'আশরাফ' (অভিজাত) সমাজ, যার অংশ ছিলেন গালিব। যে সমাজের ভিত্তি ছিল মুঘল দরবার, ফার্সি-উর্দু কাব্যচর্চা, সুফি আধ্যাত্মিকতা, এবং এক বিশেষ তেহজিব সেই সমাজের অস্তিত্বই এখন বিপন্ন।

লেটার্স অফ গালিব উইকিপিডিয়া পাতায় বলা হয়েছে: "এটি ছিল সেই আশরাফ সামাজিক অংশের সমাপ্তি, যা গালিবের চিঠিগুলির শাহরাশোব ট্রপে ধরা পড়েছে।" (উইকিপিডিয়া; ১৩২১-২২) 'শাহরাশোব' হল উর্দু কাব্যের একটি বিশেষ ধারা, যেখানে শহরের ধ্বংস ও পতনের জন্য বিলাপ করা হয়। গালিবের চিঠিগুলি যেন এক ধরনের শাহরাশোব গদ্য তিনি বিলাপ করছেন সেই দিল্লির জন্য, যে দিল্লি আর নেই।

এই পতন গালিবের জন্য ছিল ব্যক্তিগতভাবেও মর্মান্তিক। কারণ, যে দিল্লি ধ্বংস হলো, সেটা ছিল তাঁর দিল্লি যে দিল্লির গলিতে তিনি হেঁটেছেন, যে দিল্লির মুশায়রায় তিনি কবিতা পড়েছেন, যে দিল্লির বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন। এখন সেই সব গলি নেই, সেই সব মুশায়রা নেই, সেই সব বন্ধুরা হয় মৃত, নয় পালিয়ে গেছেন। গালিব নিজে বলেছিলেন: "দিল্লি এখন এক মৃত নগরী।"

গালিবের কাব্যে এই সর্বনাশের প্রতিফলন

গালিব সরাসরি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে তেমন কোনো কবিতা লেখেননি উর্দু গজলের রীতি তেমন সরাসরি ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনাকে উৎসাহ দিত না। কিন্তু পরোক্ষভাবে এই সর্বনাশের অভিজ্ঞতা তাঁর শেষ জীবনের কাব্যে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ

করে, তাঁর যে শেরগুলিতে মৃত্যু, ধ্বংস, নিয়তির নির্মমতা ও অসহায়তার কথা বলা হয়েছে, সেগুলির পেছনে ১৮৫৭ সালের অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছে।

তাঁর একটি বিখ্যাত শের:

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরে যে বক্তব্য মানুষ যখন এত দুঃখ পায় যে, দুঃখই স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন আর দুঃখ বোধ থাকে না এটা কি ১৮৫৭ সালের ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া এক দার্শনিক প্রতিক্রিয়া নয়? যখন মানুষ এত মৃত্যু, এত ধ্বংস, এত রক্ত দেখেছে যে, মৃত্যু আর মৃত্যু বলে মনে হয় না তখনই তো জন্ম নেয় এই ধরনের নিয়তিবাদী বৈরাগ্য।

আরেকটি শের:

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

এই শেরে জগৎকে 'শিশুদের খেলাঘর' এবং ঘটনাপ্রবাহকে 'তামাশা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নৈর্ব্যক্তিক, দূরবর্তী দৃষ্টি কি ১৮৫৭ সালের রক্তাক্ত তামাশা দেখার পর জন্ম নেওয়া এক মানসিক প্রতিরক্ষা কৌশল নয়? যখন একজন মানুষ দিল্লির মতো একটি শহরকে ধ্বংস হতে দেখেন, নিজের বন্ধু-স্বজনদের মৃত্যু দেখেন, তখন তাঁর পক্ষে জগৎকে 'খেলাঘর' বলা ছাড়া আর কীই-বা করার থাকে?

গালিবের দ্বৈত অবস্থান: সমালোচনা ও প্রতিরক্ষা

গালিবের ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কিত অবস্থান নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বিতর্ক হয়েছে। একদিকে, "দাস্তামবু"তে তিনি ব্রিটিশদের প্রশংসা করেছেন এবং বিদ্রোহীদের নিন্দা করেছেন। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত চিঠিগুলিতে তিনি ব্রিটিশদের প্রতিশোধের নিন্দা করেছেন এবং দিল্লির ধ্বংসের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এই দ্বৈততার কারণে কেউ কেউ গালিবকে 'সুবিধাবাদী' বা 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছেন।

ডন পত্রিকার এক নিবন্ধে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে: "প্রশ্ন হলো, ১৮৫৭ সালের সংকটকালে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি কি এমন ছিল যে, গালিব ব্রিটিশদের পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই... অনেক সম্মানিত পন্ডিত গালিবকে এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন... তাঁর চিঠিগুলিতে ১৮৫৭ সালের ধ্বংসের বর্ণনা অত্যন্ত গ্রাফিক ও গভীরভাবে মর্মস্পর্শী।" (ডন; ০২৭-৩১)

অক্সফোর্ড ইন্ডিয়া গালিব-এর একটি পর্যালোচনায় বলা হয়েছে: "দাস্তামবু থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় দিল্লি সম্পর্কে গালিবের বিবরণ, এবং পরবর্তীকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত মুঘল রাজধানী থেকে বন্ধুদের কাছে লেখা খোলামেলা চিঠিগুলি আমার জন্য হাইলাইট ছিল, যা সেই কঠিন, ভয়াবহ সময়কালকে জীবন্ত করে তুলেছে।" (গুডরিডস; ১১৬-২০)

রালফ রাসেল এই দ্বৈততার একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গালিব "দাস্তামবু" লিখেছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ পুনরুদ্ধারের জন্য, কারণ তাঁর পেনশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া ছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে, গালিব প্রকৃত অর্থে বিদ্রোহীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করতেন এবং ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ছিলেন এই দুই সত্যই একসঙ্গে সত্য হতে পারে।

গালিবের নিজের অবস্থান বুঝতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি ছিলেন একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচক ও বাস্তববাদী। তিনি জানতেন, মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান আর সম্ভব নয়, এবং ব্রিটিশ শাসনই এখন বাস্তবতা। এই বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি নিজের ও নিজের পরিবারের বেঁচে থাকার পথ খুঁজেছিলেন। এটাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলার চেয়ে 'একজন অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম' বলাই বেশি সঙ্গত।

ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে

গালিব ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও তার পরিণতির মধ্য দিয়ে যা হারিয়েছিলেন, তা অপূরণীয়। তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর দিল্লিকে, তাঁর বন্ধুদের, তাঁর ভাইকে, তাঁর সম্রাটকে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর জগৎকে যে জগতের ভিত্তি ছিল মুঘল সংস্কৃতি, ফার্সি-উর্দু কাব্য, আর এক বিশেষ তেহজিব। এখন সেই জগৎ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দিল্লি এখন 'মৃত নগরী', 'মরুভূমি', 'সামরিক ক্যাম্প'।

কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েও গালিব কবিতা লেখা বন্ধ করেননি। বরং শেষ জীবনে এসে তাঁর কাব্য আরও গভীর, আরও দার্শনিক, আরও নিয়তিবাদী হয়ে ওঠে। মৃত্যু, ধ্বংস, অসহায়তা এই সব অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। যে মানুষ বলতে পারেন "মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ" (আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে), তিনি আর সাধারণ মানুষ নন তিনি হয়ে উঠেছেন এক দার্শনিক, যিনি জীবনের চরম দুঃখকেও এক ধরনের প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন।

খলিলুর রহমান আজমি যথার্থই বলেছেন: "গালিব যদি ১৮৫৭ সালের বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষদর্শী না হতেন, তাহলে হয়তো তাঁর কাব্যে সেই গভীরতা আসত না, যা তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ধ্বংস ও মৃত্যুর এত নিকট থেকে দেখা তাঁকে শিখিয়েছিল, জীবন কতটা ক্ষণস্থায়ী, কতটা অর্থহীন, আর একই সঙ্গে কতটা মূল্যবান।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩১০)

নির্বাচিত শের: ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও সর্বনাশের অনুষঙ্গে

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگ

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

قیدِ حیا□ و بندِ غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন, গালিবের জীবনে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কী গভীর, কী বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলেছিল। এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল না, ছিল এক ব্যক্তিগত সর্বনাশ, এক সাংস্কৃতিক পতন, এবং এক অস্তিত্ববাদী সংকটের চূড়ান্ত রূপ। গালিব যে কাব্য লিখেছিলেন, তার গভীরতম স্তরে এই অভিজ্ঞতার স্পন্দন অনুভব করা যায়।

আমরা যদি নিজেদের জীবনের দিকে তাকাই, দেখতে পাই, আমরাও কখনো কখনো এমন ধ্বংসের মুখোমুখি হই হয়তো কোনো ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি, কোনো সমাজের পতন, কোনো স্বপ্নের মৃত্যু। তখন আমরা কী করি? গালিব আমাদের দেখিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েও কবিতা লেখা যায়, বরং সেই কবিতা হয় আরও গভীর, আরও সত্য, আরও মানবিক।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের শেষ জীবনে। ১৮৫৭ সালের পর তিনি আর বেশি দিন বাঁচেননি ১৮৬৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে এক বিধ্বস্ত দিল্লিতে, এক ভগ্ন পৃথিবীতে গালিব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, এবং কীভাবে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি সমগ্র যুগের অবসান ঘটেছিল।

অধ্যায় ৯: শেষ দিনগুলি

অস্তাচলের শেষ আভা

প্রত্যেক জীবন এক সূর্যাস্তের পথে হাঁটে, কিন্তু প্রত্যেক সূর্যাস্তের রং আলাদা। কারও শেষ জীবন আসে শান্তির স্নিগ্ধ আলোয়, কারও আসে ঝড়ের অন্ধকারে। গালিবের শেষ জীবন ছিল এক অদ্ভুত মিশ্রণ একদিকে স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি, শোকের গভীরতা, এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের নিঃসঙ্গতা; অন্যদিকে কিছু আর্থিক স্বস্তির আলো, সৃষ্টিশীলতার অমলিন ধারা, এবং এক দার্শনিক প্রশান্তি যা কেবল তাদেরই আসে যাঁরা জীবনের সব দুঃখ পেরিয়ে এসেছেন।

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের জীবনের শেষ পর্বে প্রবেশ করব ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ-পরবর্তী সেই সময় থেকে ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। এই সময়টি ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সময়েই গালিব একাধারে চরম শারীরিক দুর্বলতা এবং এক অপূর্ব মানসিক দীপ্তির মধ্যে বাস করছিলেন। যেমনটি বলেছেন আলতাফ হোসেন হালী: "শেষ বয়সে এসে গালিবের শরীর ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তাঁর কলম আগের মতোই সতেজ ছিল। বরং বলা যায়, শেষ বয়সে তাঁর চিঠিগুলি আরও প্রাণবন্ত, আরও রসালো, আরও গভীর হয়ে উঠেছিল।" (হালী, ১৮৯৭: ১১২) ড. গোপী চাঁদ নারঙ যোগ করেছেন: "গালিবের শেষ জীবন ছিল এক দীর্ঘ সূর্যাস্ত, যে সূর্যাস্তের রং ছিল একই সঙ্গে রক্তিম ও স্নিগ্ধ। তিনি জানতেন, শেষ ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু এই জ্ঞান তাঁকে বিচলিত করেনি, বরং এক অদ্ভুত প্রশান্তি দিয়েছিল।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৩৪৫)

নিভে আসা আলো

স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও তার পরিণতি গালিবের স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিদ্রোহের সময়কার খাদ্যাভাব, মানসিক আঘাত, আত্মগোপনের কষ্ট এসব মিলে তাঁর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। ১৮৬০-এর দশকে এসে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি তীব্রতর হয়। বিভিন্ন চিঠিতে তিনি নিজের শারীরিক অবস্থার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিবের শেষ বছরগুলির চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়, তিনি ক্রমাগত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। চোখের জ্যোতি কমে এসেছিল, হাঁটতে কষ্ট হতো, শ্বাসকষ্ট ছিল। তবু তিনি বিস্ময়করভাবে নিজের মানসিক সজীবতা বজায় রেখেছিলেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৯০)

১৮৬২ সালের দিকে গালিব প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বলে কিছু সূত্রে জানা যায়, যদিও পুরোপুরি অন্ধত্ব নয় তাঁর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। উইকিপিডিয়ার জীবনী অনুযায়ী: "তিনি ১৮৬২ সালের মধ্যে অন্ধ হয়ে পড়েন।" (উইকিপিডিয়া; ৫৩১-৩৪) গালিব নিজে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমার চোখ এখন বিশ্বাসঘাতকতা করছে। যা দেখতে চাই, তা দেখি না; যা দেখতে চাই না, তা চোখের সামনে ভাসে। কবিতা লিখতে পারি, কিন্তু পড়তে পারি না অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনি। কী বিড়ম্বনা!" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১১৫)

অন্ধত্বের পাশাপাশি গালিবের অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও ছিল। হাঁটুর বাত, শ্বাসকষ্ট, এবং সাধারণ দুর্বলতা তাঁকে ক্রমশ গৃহবন্দী করে তুলছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার পা এখন আমার আদেশ মানে না। মনের ইচ্ছা আছে বাইরে যাওয়ার, বন্ধুদের দেখার, কিন্তু পা বলে, 'আমার শক্তি নেই।' তখন বসে থাকি, আর ভাবি।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৩২০)

এই শারীরিক পতনের মধ্যে একটি বড় কারণ ছিল গালিবের অনিয়মিত জীবনযাপন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, মদ্যপান ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অভ্যাস শরীরের ওপর আরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছিল। তবে গালিব শেষ জীবনেও মদ্যপান ত্যাগ করেননি, বরং বলতেন: "এখন আর কিছুই ভালো লাগে না, শুধু মদই একমাত্র সান্ত্বনা। সে-ও যদি ছেড়ে দিই, তাহলে বাঁচার কী অর্থ?" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৯২)

কিন্তু এই ক্রমাগত স্বাস্থ্যহানি সত্ত্বেও গালিবের মানসিক তীক্ষ্ণতা ও সৃষ্টিশীলতা ছিল অটুট। এটি ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। যে মানুষ প্রায় অন্ধ, চলৎশক্তিহীন, অসুস্থ সেই মানুষ লিখে চলেছেন কিছু অসামান্য চিঠি ও গজল। "শেষ বয়সেও তাঁর কাব্যচর্চার ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল," লিখেছেন ইকবাল মির্জা গালিব পেজ-এ। (ইকবাল; ৩৩৭-৩৯) খলিলুর রহমান আজমি মন্তব্য করেছেন: "গালিবের শেষ বয়সের রচনা পড়লে মনে হয়, শরীর ভেঙে পড়লেও আত্মা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন মাটির প্রদীপ নিভে আসছে, কিন্তু তার শিখা আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩২২)

শেষ বয়সের কাব্যচর্চা ও চিঠিপত্র

গালিবের শেষ বয়সের রচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর চিঠিগুলি। ১৮৫৭ সালের পর তিনি যে চিঠিগুলি লিখেছেন, তা উর্দু গদ্যের ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ। এই চিঠিগুলিতে তিনি দিল্লির ধ্বংস, নিজের শারীরিক অবস্থা, সমাজের পরিবর্তন, এবং নানা ব্যক্তিগত ও দার্শনিক বিষয় নিয়ে লিখেছেন।

এই সময়কার চিঠিগুলির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে মৃত্যুচেতনা। গালিব জানতেন, তাঁর শেষ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু এই চেতনা তাঁকে ভীত করেনি, বরং এক দার্শনিক প্রশান্তি দিয়েছে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। জীবনই তো ভয়ের, মৃত্যু তো শান্তি। যে মানুষ সাতটি সন্তানের মুখাগ্নি করেছে, যে মানুষ দিল্লিকে ধ্বংস হতে দেখেছে, তার কাছে মৃত্যু কী? একটি মুক্তি, একটি বিশ্রাম।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১১৮)

চিঠির পাশাপাশি তিনি কিছু গজলও লিখেছিলেন শেষ বয়সে, যদিও সংখ্যায় কম। এই গজলগুলির সুর ছিল বিষাদমথিত অথচ প্রশান্ত, যেন জীবনের শেষে পৌঁছে একজন মানুষ সবকিছুর অর্থ বুঝতে পেরেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত শের, যা সম্ভবত শেষ বয়সেরই রচনা:

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরটি গালিবের শেষ জীবনের দর্শনের সারসংক্ষেপ। এত দুঃখ, এত বিপর্যয়, এত মৃত্যু সব মিলিয়ে দুঃখ আর দুঃখ বলে মনে হয় না, বরং তা হয়ে উঠেছে জীবনের স্বাভাবিক অংশ। এই যে দুঃখকে অতিক্রম করার ক্ষমতা, এটাই গালিবের শেষ বয়সের সবচেয়ে বড় অর্জন।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিবের শেষ বয়সের চিঠিগুলি শুধু সাহিত্য নয়, বরং এক জীবনদর্শনের দলিল। যে মানুষ এত দুঃখ পেয়েও হাসতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে এক অসামান্য মানুষ। গালিবের এই হাসি কোনো পলায়ন নয়, বরং দুঃখকে জয় করার এক মহৎ উপায়।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৯৫)

শেষ বয়সে আর্থিক স্বচ্ছলতার আভাস

গালিবের সারাজীবনের এক ধ্রুবসঙ্গী ছিল অর্থকষ্ট। কিন্তু শেষ বয়সে এসে কিছুটা আর্থিক স্বস্তি এসেছিল তাঁর জীবনে, যা ছিল এক করুণ পরিহাস যখন শরীর ভেঙে পড়েছে, যখন ভোগ করার ক্ষমতা নেই, তখনই অর্থ আসতে শুরু করেছে।

এই আর্থিক স্বস্তির প্রধান উৎস ছিল দুটি: প্রথমত, আওধের নবাবের দেওয়া পেনশন, এবং দ্বিতীয়ত, রামপুরের নবাবের পৃষ্ঠপোষকতা। আওধের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের পতনের পরও কোনোক্রমে গালিবের জন্য একটি ভাতা চালু ছিল, যদিও তা ছিল অনিয়মিত। কিন্তু রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খান এবং পরে তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব কালবে আলী খান গালিবকে নিয়মিত ভাতা দিতেন।

রামপুরের নবাবের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। নবাব গালিবের প্রতিভা বুঝতেন এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান করতেন। আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "রামপুরের নবাব সাহেব গালিবকে মাসিক পেনশন দিতেন, যা ছিল গালিবের শেষ বয়সের প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। এছাড়া নবাব সাহেব মাঝেমধ্যে বিশেষ উপহারও পাঠাতেন। গালিব এই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।" (হালী, ১৮৯৭: ১২০)

ইকবাল মির্জা গালিব পেজ-এ উল্লেখ আছে: "শেষ বয়সে আওধের নবাব কর্তৃক প্রদত্ত পেনশন এবং রামপুরের নবাবের পৃষ্ঠপোষকতা কিছুটা আর্থিক স্বস্তি এনেছিল।" (ইকবাল; ৩৩৯-৪১) এই আর্থিক স্বস্তির ফলে গালিব শেষ বয়সে তুলনামূলকভাবে কম কষ্টে জীবন কাটাতে পেরেছিলেন। অন্তত খাদ্যাভাব বা ঋণের তীব্র চাপ থেকে তিনি কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন।

তবে গালিব নিজে এই বিলম্বিত আর্থিক স্বস্তি নিয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের ব্যঙ্গও প্রকাশ করতেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "জীবনভর যখন অর্থের প্রয়োজন ছিল, তখন পাইনি; এখন যখন শরীর আর ভোগ করতে পারে না, তখন অর্থ আসছে। এ যেন তৃষ্ণার্তকে জল না দিয়ে মৃতকে গোসল দেওয়া।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৩২৫)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, গালিব জীবনের শেষ পর্যন্ত নিজের পরিহাসবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, জীবন কখনো সম্পূর্ণ সুখী হয় না কিন্তু তবু এই অসম্পূর্ণতার মধ্যেও এক ধরনের সৌন্দর্য আছে, এক ধরনের রস আছে, যা কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারেন যাঁরা জীবনকে গভীরভাবে দেখেছেন।

নিঃসঙ্গতার গভীরতা

শেষ বয়সে গালিবের জীবনে এক গভীর নিঃসঙ্গতা নেমে এসেছিল। ১৮৫৭ সালের পর তাঁর অনেক বন্ধু ও স্বজন হয় মৃত, নয় পালিয়ে গেছেন। দিল্লি, যে শহর একসময় প্রাণচঞ্চল ছিল, তা এখন 'মৃত নগরী'। গালিবের নিজের পরিবার বলতে ছিলেন কেবল স্ত্রী উমরাও বেগম, আর কোনো সন্তান ছিল না। বল্লিমারানের হাভেলিটি ছিল ফাঁকা, নীরব।

এই নিঃসঙ্গতার বর্ণনা দিতে গিয়ে গালিব এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমার ঘর এখন এত নীরব যে, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। একসময় এই ঘরে কত কোলাহল ছিল বন্ধুদের হাসি, চাকরদের পায়ের শব্দ, কবিতার তাল। এখন শুধু আমি আর আমার ছায়া। ছায়াটাও কখনো কখনো আমাকে ছেড়ে চলে যায় রাতে যখন প্রদীপ নেভাই।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১২২)

তবে এই নিঃসঙ্গতা গালিবকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়নি। বরং তিনি একে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "মানুষ একা আসে, একা যায়। মাঝখানের সঙ্গ-সাথী সব মায়া। যে এই মায়া বুঝতে পারে, সে একা থেকেও একা বোধ করে না। আমি এখন সেই অবস্থায় পৌঁছেছি একা আছি, কিন্তু একা নই। আমার সঙ্গী আমার চিন্তা, আমার কবিতা, আমার স্মৃতি।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৯৮)

এই উক্তি গালিবের শেষ বয়সের দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে তিনি বাহ্যিক নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করে অন্তরের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। তাঁর কাছে কবিতা ও চিন্তাই ছিল প্রকৃত সঙ্গী, যে সঙ্গী কখনো ছেড়ে যায় না।

আত্মবিশ্লেষণ ও কৃতিত্ববোধ

নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে শেষ মূল্যায়ন

গালিব সারাজীবন নিজের প্রতিভা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন কখনো কখনো প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সচেতন। কিন্তু শেষ বয়সে এসে এই আত্মসচেতনতা এক ধরনের প্রশান্ত মূল্যায়নে রূপ নেয়। তিনি আর দাম্ভিকতার সঙ্গে নিজেকে জাহির করতে চাইতেন না, বরং এক ধরনের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজের কৃতিত্বকে বিচার করতেন।

তাঁর এই আত্মবিশ্লেষণের সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন হল সেই উক্তি, যা আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার উদ্ধৃত করেছি: "হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন।" (যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না।) এই উক্তিটি গালিবের আত্মমূল্যায়নের সারসংক্ষেপ। তিনি স্বীকার করছেন, তিনি সমাজেরই অংশ অর্থাৎ অন্যান্য মানুষের মতোই সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষত্ব আছে তিনি 'আয়না-এ-খুদ-বীন', অর্থাৎ নিজেকে দেখার আয়না। তিনি নিজের ভেতরে তাকাতে পারেন, নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারেন, এবং এই ক্ষমতাই তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে।

রালফ রাসেল এই উক্তি সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের এই বিখ্যাত উক্তিটি কেবল তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ নয়, বরং তাঁর সমগ্র কাব্যদর্শনের সারকথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাইরের জগৎকে দেখা সবার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু নিজের ভেতরে দেখা কেবল মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এই নিজের ভেতরে তাকানোর ক্ষমতাই গালিবকে তাঁর সমসাময়িক কবিদের চেয়ে আলাদা ও মহৎ করেছে।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩০০)

ড. গোপী চাঁদ নারঙ যোগ করেছেন: "গালিবের আত্মবিশ্লেষণ কেবল দাম্ভিকতা নয়, বরং এক সৎ স্বীকারোক্তি। তিনি জানতেন, তিনি কী, এবং কী নন। তিনি জানতেন, তাঁর কাব্য সহজবোধ্য নয়, জনপ্রিয় নয় কিন্তু তবু তা সত্য, গভীর, এবং কালজয়ী। এই আত্মজ্ঞানই তাঁকে শেষ বয়সে এক অদ্ভুত প্রশান্তি দিয়েছিল।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৩৫০)

নিজের কাব্য সম্পর্কে গালিবের মূল্যায়ন

গালিব নিজের কাব্য সম্পর্কে কী মনে করতেন, তা নিয়ে অনেক জল্পনা আছে। আমরা আগেই জেনেছি, তিনি নিজের ফার্সি কাব্যকে উর্দু কাব্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু শেষ বয়সে এসে এই মূল্যায়নে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল বলে ধারণা করা হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ইতিহাসের দরবারে তাঁর জায়গা হবে উর্দু কাব্যের জন্যই, ফার্সির জন্য নয়।

ইকবাল মির্জা গালিব পেজ-এ উল্লেখ আছে: "নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতন গালিব বলতেন, 'হুঁ গরচে মুসাহিব...' অর্থাৎ, আমি সমাজের অংশ হলেও আত্মদর্শনের আয়না।" (ইকবাল; ৩৪২-৪৪) এই আত্মদর্শন গালিবকে শিখিয়েছিল, বাইরের স্বীকৃতির চেয়ে অন্তরের সত্য বড়। তিনি হয়তো শেষ বয়সে এসে বুঝেছিলেন, যে স্বীকৃতি তিনি পেতে চেয়েছিলেন দরবারি সম্মান, অর্থ, পৃষ্ঠপোষকতা তা হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল সেই কাব্য, যা তিনি রেখে যাচ্ছেন ভবিষ্যতের জন্য।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার কবিতা হয়তো আজকের মানুষ বোঝে না, কিন্তু আগামীকালের মানুষ বুঝবে। আমি এমন কিছু লিখেছি, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য হয়ে উঠবে। এই বিশ্বাসই আমার একমাত্র সম্বল।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১২৫) এই ভবিষ্যদ্বাণী কী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে, তা আমরা আজ জানি। গালিবের কাব্য আজ বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, এবং কালক্রমে তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা কেবল বেড়েই চলেছে।

শেষ বয়সে সম্পর্ক ও সমাজবিচ্ছিন্নতা

গালিবের শেষ বয়সে তাঁর সামাজিক সম্পর্কগুলি ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছিল। ১৮৫৭ সালের পর দিল্লির যে সমাজ তিনি জানতেন, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। নতুন যে সমাজ গড়ে উঠছিল, তা ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় প্রভাবিত, এবং পুরনো মুঘল তেহজিব থেকে বিচ্ছিন্ন। এই নতুন সমাজের সঙ্গে গালিবের তেমন যোগ ছিল না, এবং তিনি হয়তো চাইলেও যোগ করতে পারতেন না।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "শেষ বয়সে গালিব ক্রমশ এক ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ভুগছিলেন। তাঁর পুরনো বন্ধুরা মৃত বা পালিয়ে গেছেন, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তিনি ছিলেন এক বিলীয়মান পৃথিবীর শেষ প্রতিনিধি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩০২)

তবু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুরাগী ছিলেন, যাঁরা শেষ পর্যন্ত গালিবের পাশে ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাকিম মোমিন খান (যিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন), নবাব মুস্তফা খান, এবং কিছু শিষ্য। এই বন্ধুরা মাঝেমধ্যে গালিবের বাড়িতে আসতেন, আড্ডা দিতেন, কবিতা শুনতেন। এই আড্ডাগুলিই ছিল গালিবের শেষ বয়সের প্রধান সামাজিক সম্পর্ক।

এক চিঠিতে গালিব এই আড্ডাগুলির বর্ণনা দিয়েছেন: "এখন আর তেমন আড্ডা জমে না। দু-একজন আসেন, বসেন, কথা বলেন। কিন্তু সে আর আগের মতো নয়। আগে আড্ডায় এত হাসি ছিল, এত তর্ক ছিল, এত প্রাণ ছিল। এখন সব যেন ফিকে হয়ে গেছে। হয়তো আমিই ফিকে হয়ে গেছি।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৩২৮)

এই 'ফিকে হয়ে যাওয়া'র অনুভূতি ছিল গালিবের শেষ বয়সের এক বিষণ্ণ সত্য। পৃথিবী বদলে গেছে, তিনি আর সেই বদলের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। কিন্তু এই 'ফিকে হয়ে যাওয়া' সত্ত্বেও তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। তিনি কখনো নতুন ফ্যাশনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে যাননি, বরং নিজের পুরনো স্বভাব, পুরনো ভাষা, পুরনো রুচি নিয়েই শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

শেষ বয়সে গালিব মৃত্যুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন। এটি কোনো ভীতু প্রতীক্ষা ছিল না, বরং এক ধরনের দার্শনিক সমর্পণ। তিনি জানতেন, মৃত্যু অনিবার্য, এবং জীবনের সব দুঃখ-কষ্টের পর মৃত্যুই একমাত্র পরম প্রশান্তি।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "মৃত্যুকে আমি অভ্যর্থনা জানাব, ভয় নয়। জীবন আমাকে যা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কেড়েছে। এখন যদি মৃত্যু আসে, আমি বলব, 'আয়, বন্ধু, আয়। তোর কাছেও কি কিছু কেড়ে নেওয়ার আছে? নে, যা আছে নিয়ে যা আমার ক্লান্তি, আমার ব্যথা, আমার স্মৃতি।'" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১২৮)

আরেক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার যা বলার ছিল, বলে ফেলেছি। আমার যা লেখার ছিল, লিখে ফেলেছি। এখন আর কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এখন শুধু অপেক্ষা যেমন নদী অপেক্ষা করে সমুদ্রে মিশে যাওয়ার জন্য।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩০৫)

এই লেখাগুলি থেকে বোঝা যায়, গালিব মৃত্যুকে এক ধরনের মুক্তি হিসেবে দেখছিলেন। জীবন তাঁর কাছে ছিল এক দীর্ঘ সংগ্রাম, এক নিরন্তর কষ্টের ধারা। মৃত্যু সেই সংগ্রামের অবসান, সেই কষ্টের উপশম। এই দৃষ্টিভঙ্গি গালিবের সুফি প্রভাবিত দর্শনেরই প্রতিফলন মৃত্যু আসলে কিছু নয়, বরং জীবনেরই অংশ, এবং জীবনের চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক।

কাব্যে মৃত্যুভাবনা

গালিবের শেষ বয়সের কাব্যে মৃত্যুভাবনা এক গভীর সুর হয়ে ফিরে এসেছে। তাঁর একটি বিখ্যাত শের, যা মৃত্যুভাবনার চরম প্রকাশ:

قیدِ حیا□ و بندِ غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

এই শেরে গালিব জীবনকে 'কারাগার' এবং দুঃখকে 'বন্ধন' বলে অভিহিত করেছেন। দুই-ই এক জীবন মানেই দুঃখ, দুঃখ মানেই জীবন। তাহলে মৃত্যুর আগে মানুষ কীভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে? অর্থাৎ, যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই; একমাত্র মৃত্যুই পারে দুঃখ থেকে চূড়ান্ত মুক্তি দিতে।

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

এই শেরে গালিব অস্তিত্বের সংকটকে চরমভাবে প্রকাশ করেছেন। 'আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল?' এই প্রশ্নের মধ্যে এক গভীর নৈরাশ্য আছে, কিন্তু একই সঙ্গে এক ধরনের মুক্তিও আছে। যদি আমার অস্তিত্বই সমস্ত কষ্টের উৎস হয়, তাহলে অনস্তিত্বই তো পরম শান্তি।

প্রয়াণ

শেষ দিনগুলির বিবরণ

গালিবের মৃত্যু হয় ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, দিল্লির বল্লিমারানের নিজ বাসভবনে। উইকিপিডিয়ার জীবনী অনুযায়ী: "তিনি ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মারা যান।" (উইকিপিডিয়া; ৫৩১-৩৪) মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর (চন্দ্রবর্ষ হিসাবে ৭২ বছর)।

মৃত্যুর আগের দিনগুলির বিবরণ আমরা পাই আলতাফ হোসেন হালীর "ইয়াদগার-এ-গালিব" গ্রন্থ থেকে। হালী লিখেছেন: "মৃত্যুর আগের সপ্তাহগুলিতে গালিব খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না, কথা বলতে কষ্ট হতো। কিন্তু মাঝেমধ্যে যখন একটু সুস্থ বোধ করতেন, তখনো হাসতেন, রসিকতা করতেন। এমনকি মৃত্যুর দুদিন আগেও তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন, যাতে তাঁর চরিত্রগত রসিকতা ছিল।" (হালী, ১৮৯৭: ১৩০)

মৃত্যুর আগের দিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি, গালিব খুব দুর্বল ছিলেন। তিনি সারাদিন বিছানায় শুয়ে ছিলেন, মাঝেমধ্যে চোখ খুলে তাকাচ্ছেন, কিছু বলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু শব্দ বেরোচ্ছে না। রাতে অবস্থার আরও অবনতি হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিবের মৃত্যু ছিল শান্ত, কিন্তু একাকী। তাঁর পাশে ছিলেন কেবল স্ত্রী উমরাও বেগম এবং একজন চাকর। দিল্লির যে হাজারো অনুরাগী একসময় তাঁর কবিতা শুনতে ভিড় করতেন, তাঁদের কেউ সেদিন উপস্থিত ছিল না। গালিব নীরবে বিদায় নিলেন, যেমন তিনি চেয়েছিলেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩০৮)

সমাধি ও শেষ ইচ্ছা

গালিবের শেষ ইচ্ছা ছিল, তাঁকে যেন নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা চত্বরে সমাধিস্থ করা হয়। এই ইচ্ছার পেছনে কারণ ছিল গভীর। নিজামুদ্দীন আউলিয়া ছিলেন দিল্লির বিখ্যাত সুফি সাধক, এবং গালিব সারা জীবন সুফি দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এছাড়া, নিজামুদ্দীনের দরগা এলাকাটি ছিল দিল্লির একটি সম্মানজনক সমাধিস্থল, যেখানে অনেক বিখ্যাত কবি-শিল্পী শায়িত ছিলেন। গালিব চেয়েছিলেন, তিনিও যেন সেই সম্মানজনক স্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

কিন্তু তাঁর এই শেষ ইচ্ছা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ডন পত্রিকার একটি নিবন্ধে উল্লেখ আছে: "শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী গালিবকে সমাধিস্থ করতে গিয়ে জানাজা নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছিল।" (ডন; ০২২-২৬) আসলে কী হয়েছিল? ইতিহাস থেকে জানা যায়, গালিবের জানাজায় ইমামতি করা নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছিল, কারণ গালিব ছিলেন ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি উদাসীন এবং অনেক ধর্মীয় নেতা তাঁকে 'ফাসিক' (ধর্মচ্যুত) মনে করতেন। ফলে, কেউ কেউ তাঁর জানাজায় ইমামতি করতে চাননি।

তবে শেষ পর্যন্ত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এগিয়ে এসে জানাজা পড়ান, এবং গালিবকে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা চত্বরে সমাধিস্থ করা হয়। ইকবাল মির্জা গালিব পেজ-এ বলা হয়েছে: "তাঁর কবর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় অবস্থিত।" (ইকবাল; ৩৪৪-৪৬) এই কবরটি আজও বিদ্যমান এবং গালিব-অনুরাগীদের জন্য এক তীর্থস্থান।

জানাজা: কোলাহল থেকে নীরবতা

গালিবের জানাজা নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল, তা কেবল একটি ধর্মীয় ঘটনা নয়, বরং এক প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। গালিব সারাজীবন সমাজের রীতিনীতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরও সমাজের সেই গোঁড়ামি তাঁকে ছাড়েনি এমনকি তাঁর জানাজাতেও বাধা সৃষ্টি করেছিল।

খলিলুর রহমান আজমি এই ঘটনার প্রতীকী বিশ্লেষণ করে লিখেছেন: "গালিব সারাজীবন যাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছেন, যাঁদের ভণ্ডামি তিনি কাব্যের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন, তাঁরাই তাঁর মৃত্যুর পরেও ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁর জানাজায় ইমামতি করতে চাননি। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, আজ সেই সব ইমামের নাম কেউ জানে না, কিন্তু গালিবের নাম অমর হয়ে আছে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৩৫)

গালিবের জানাজায় কত লোক এসেছিলেন, তা নিয়ে নিশ্চিত তথ্য নেই। তবে ধারণা করা হয়, খুব বেশি লোক আসেননি। কারণ দিল্লি তখনো ১৮৫৭-র ধ্বংসের ক্ষত সারিয়ে ওঠেনি, শহরের জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল, আর গালিবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাও তখন সীমিত ছিল। তিনি যেভাবে নীরবে বেঁচে ছিলেন, তেমনই নীরবে বিদায় নিলেন।

এক যুগের অবসান

গালিবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি সমগ্র যুগের অবসান ঘটেছিল। তিনি ছিলেন মুঘল দিল্লির শেষ মহৎ কবি, শেষ সেই প্রতিভা, যিনি পুরনো তেহজিব ও কাব্যধারার ধারক-বাহক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উর্দু কাব্যের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। আলতাফ হোসেন হালী যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির কবিতার প্রদীপ নিভে গেল। এরপর আর কেউ সেই আলো জ্বালাতে পারেননি।" (হালী, ১৮৯৭: ১৩৫)

ড. গোপী চাঁদ নারঙ মন্তব্য করেছেন: "গালিবের মৃত্যু কেবল একজন কবির মৃত্যু নয়, বরং এক সভ্যতার মৃত্যু। যে সভ্যতার ভিত্তি ছিল ফার্সি-উর্দু কাব্য, সুফি আধ্যাত্মিকতা ও মুঘল তেহজিব, সেই সভ্যতার শেষ প্রতিনিধি ছিলেন গালিব। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতাও ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের মতো বিলীন হয়ে গেল।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৩৬০)

কিন্তু একটি সভ্যতার অবসান ঘটলেও, গালিবের কাব্যকে সেই সভ্যতার সীমানায় বেঁধে রাখা যায়নি। বরং মৃত্যুর পরই গালিব ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন বিশ্বসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। যে স্বীকৃতি তিনি জীবদ্দশায় পাননি, মৃত্যুর পর তা এসেছে ধীরে ধীরে প্রথমে ভারত-পাকিস্তানে, পরে সারা বিশ্বে। আজ গালিব কেবল উর্দু কাব্যের নন, বরং বিশ্বকাব্যের এক অমূল্য রত্ন।

কবরের বিবরণ ও স্মৃতিচিহ্ন

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা চত্বরে গালিবের সমাধিটি আজও বিদ্যমান। এটি একটি সাধারণ কিন্তু সুন্দর সমাধি মুঘল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত, সাদা মার্বেলে ঢাকা। সমাধির ওপর গালিবের নাম, জন্ম ও মৃত্যু সাল খোদিত আছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "কবরটি নিজামুদ্দীন বাস্তির গালিব একাডেমির কাছে অবস্থিত।" (টাইমস অফ ইন্ডিয়া; ১৪৩৪-৩৬) এই সমাধিটি শুধু একটি কবর নয়, বরং এক তীর্থস্থান, যেখানে প্রতিদিন দেশ-বিদেশের অসংখ্য গালিব-অনুরাগী আসেন শ্রদ্ধা জানাতে।

সমাধির কাছে একটি ছোট জাদুঘরও আছে, যেখানে গালিবের জীবন ও কাব্য সম্পর্কিত নানা নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। এছাড়া, সমাধি চত্বরে নিয়মিত গালিবের কবিতাপাঠ, মুশায়রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গালিব যে নীরবে বিদায় নিয়েছিলেন, তাঁর সমাধি এখন কলরবমুখর যেন ইতিহাসের পরিহাস, যা তিনি নিশ্চয়ই উপভোগ করতেন।

উপসংহার: সমাপ্তি নয়, শুরু

গালিবের জীবন একটি দীর্ঘ সূর্যাস্তের মতো ছিল রক্তিম, বিষণ্ণ, কিন্তু অপরূপ সুন্দর। তাঁর মৃত্যু সেই সূর্যাস্তের শেষ আভা, যে আভা নিভে গিয়ে রেখে যায় এক গভীর অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারের পরেই আসে ভোর, আসে নতুন আলো। গালিবের কাব্য আজও সেই নতুন আলোর মতোই দীপ্তিমান।

তাঁর একটি শের দিয়ে এই অধ্যায় ও এই জীবনালেখ্য পর্বের সমাপ্তি টানা যেতে পারে:

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر □واہش پہ □ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

এই শেরটি যেন গালিবের সমগ্র জীবনের সারকথা হাজারো আকাঙ্ক্ষা, হাজারো স্বপ্ন, হাজারো আরমান। কিছু পূরণ হয়েছে, কিছু নয়। কিন্তু যা পূরণ হয়নি, তার জন্যই হয়তো তিনি বেঁচে রইলেন চিরকাল কারণ অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাই তো বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে, কবিকে, কাব্যকে।

নির্বাচিত শের: শেষ দিনগুলির অনুষঙ্গে

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

قیدِ حیا□ و بندِ غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ □د نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکل

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই অনুভব করছেন, গালিবের শেষ জীবন ছিল এক গভীর করুণ সৌন্দর্যের আকর। তিনি যখন মৃত্যুর পথে হাঁটছিলেন, তখনো তিনি হাসছেন, রসিকতা করছেন, কবিতা লিখছেন। এই যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনের রস উপভোগ করার ক্ষমতা, এটাই গালিবের সবচেয়ে বড় শিক্ষা আমাদের জন্য।

আমরা যারা মৃত্যুকে ভয় পাই, যারা জীবনের দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়ি, তাদের জন্য গালিব এক দৃষ্টান্ত। তিনি দেখিয়েছেন, দুঃখকে জয় করা যায় হাসির মাধ্যমে, মৃত্যুকে জয় করা যায় সৃষ্টির মাধ্যমে। "মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ" এই এক পঙক্তিতে তিনি জীবনের সব দুঃখকে এক অদ্ভুত বিজয়ে রূপান্তরিত করেছেন।

এখন আমরা প্রবেশ করব বইয়ের পরবর্তী পর্বে "সাহিত্য ও শিল্পীসত্তা", যেখানে আমরা গালিবের ফার্সি কাব্য, উর্দু গজল, গদ্য ও চিঠিপত্রের বিশদ বিশ্লেষণ করব। আমরা দেখব, কীভাবে এই জীবন থেকে জন্ম নিয়েছিল সেই কাব্য, যে কাব্য আজও আমাদের ভাবায়, আনন্দ দেয়, আর বাঁচতে শেখায়।

পর্ব ৩: সাহিত্য ও শিল্পীসত্তা

যে কলমে বেঁচে থাকে সভ্যতা

রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হয়, সিংহাসন ভেঙে পড়ে, সম্রাটের মাথার মুকুট ধুলোয় লুটায় কিন্তু কবির কলমে লেখা একটি শের থেকে যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে। গালিবের জীবন নিয়ে আমরা এতক্ষণ যে আখ্যান পড়ে এসেছি, তার গভীরে একটিই সত্য বারবার ধরা দিয়েছে: গালিবের জীবন ছিল দুঃখ-দারিদ্র্য-বঞ্চনায় ভরা, কিন্তু সেই জীবন থেকে জন্ম নিয়েছিল এক অপূর্ব সাহিত্যিক সৃষ্টি, যা আজও বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পর্ব ৩-এ আমরা প্রবেশ করব গালিবের সাহিত্যিক সত্তার গভীরে সেই সৃষ্টির জগতে, যেখানে তিনি শুধু একজন মানুষ নন, বরং এক শিল্পী, এক স্থপতি, এক বিপ্লবী।

এই পর্বটি হবে বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মননশীল অংশ। এখানে আমরা গালিবের ফার্সি কাব্য, উর্দু গজল, গদ্য ও চিঠিপত্র, কাব্যভাষা ও অলংকার, এবং নির্বাচিত রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করব। এই বিশ্লেষণ কেবল সাহিত্যিক নয়, বরং দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও নান্দনিকও হবে। কারণ গালিবের কাব্য কেবল শব্দের খেলা নয় তা এক সমগ্র জীবনদর্শন, এক অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসা, এক অনন্য নন্দনতত্ত্বের প্রকাশ।

পর্ব ৩-এর প্রথম অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের ফার্সি কাব্যের জগতে যে জগৎকে গালিব নিজে তাঁর সর্বোচ্চ সাহিত্যিক কৃতিত্ব বলে মনে করতেন। এখানে আমরা দেখব, কেন গালিব ফার্সিকে উর্দুর চেয়ে বড় মনে করতেন, ফার্সি কাব্যের নানা রূপে তিনি কীভাবে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, এবং ফার্সি গদ্যে কীভাবে তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "গালিবের ফার্সি কাব্য ও গদ্য উপমহাদেশের ফার্সি সাহিত্যের শেষ মহৎ অধ্যায়। এর পরে ফার্সি ভাষা ভারতবর্ষে আর কখনো এমন উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪০২)

অধ্যায় ১০: ফার্সি কাব্যের স্থপতি

দুই ভাষার কবি, এক আত্মার দ্বন্দ্ব

গালিবের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক দিক হল তাঁর দ্বিভাষিকতা তিনি একই সঙ্গে ফার্সি ও উর্দু দুই ভাষাতেই কাব্যচর্চা করেছেন, এবং আশ্চর্যের বিষয়, তিনি নিজের ফার্সি রচনাকে উর্দু রচনার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। অথচ ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, আজ গালিব বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন প্রধানত তাঁর উর্দু গজলের জন্য, ফার্সি কাব্যের জন্য নয়। কেন এমন হল? কেন গালিব নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়নে এত বড় ভুল করলেন? নাকি আমরা, পরবর্তী প্রজন্ম, গালিবের ফার্সি কাব্যের প্রকৃত মূল্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে, গালিবের সময়ে ফার্সি ভাষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মর্যাদা কী ছিল। তারপর দেখতে হবে, গালিব কীভাবে ফার্সি কাব্যের বিভিন্ন রূপে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, এবং শেষে মূল্যায়ন করতে হবে, ফার্সি কাব্যে গালিবের প্রকৃত অবদান কী। রালফ রাসেল যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের ফার্সি রচনা না বুঝলে তাঁর উর্দু রচনাও সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। কারণ গালিবের কাব্যভাষা, অলংকার, দর্শন ও ভাবনার গভীরতম স্তরটি গড়ে উঠেছিল ফার্সি সাহিত্যের ভিত্তির ওপর।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩২০)

"আমার ফার্সি দেখো": কেন গালিব ফার্সিকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন

ভাষার সাম্রাজ্যিক মর্যাদা

গালিবের সময়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফার্সি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের অভিজাত সংস্কৃতির ভাষা। মুঘল দরবারের সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি। রাজকীয় ফরমান, দরবারি নথিপত্র, উচ্চ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সবই লেখা হতো ফার্সিতে। ফার্সি ছিল ক্ষমতার ভাষা, অভিজাত্যের ভাষা, বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা। যে কেউ বিদ্বান হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চাইলে, ফার্সি জানা আবশ্যক ছিল।

অন্যদিকে উর্দু তখনো ছিল তুলনামূলকভাবে নবীন ভাষা, যার সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল মাত্র দেড়-দুই শতাব্দীর। উর্দু ছিল মূলত কথ্যভাষা, জনসাধারণের ভাষা, বাজার-ঘাটের ভাষা যদিও তা ক্রমশ সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন করছিল। কিন্তু ফার্সির সাম্রাজ্যিক মর্যাদার কাছে উর্দু ছিল অনেকটাই গৌণ।

এই প্রেক্ষাপটে গালিবের পক্ষে ফার্সিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা ছিল স্বাভাবিক। তিনি ছিলেন উচ্চ বংশের তুর্কি যোদ্ধার বংশধর, যাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল ফার্সি-মধ্য এশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। তাঁর শিক্ষা, স্বশিক্ষিত হলেও, ছিল ফার্সি-আরবি কেন্দ্রিক। ফলে ফার্সি ছিল তাঁর কাছে "মাতৃভাষা"র মতো যে ভাষায় তিনি চিন্তা করতেন, স্বপ্ন দেখতেন, এবং নিজেকে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। উর্দু ছিল তাঁর "জনসম্পর্কের ভাষা" যে ভাষায় তিনি জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, কিন্তু যাকে তিনি উচ্চ সাহিত্যের ভাষা হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের মনে ফার্সি ও উর্দুর মধ্যে একটি স্পষ্ট স্তরবিন্যাস ছিল। ফার্সি ছিল রাজকীয়, উচ্চাঙ্গ, দার্শনিক; উর্দু ছিল প্রাদেশিক, জনপ্রিয়, আবেগি। গালিব নিজেকে প্রধানত ফার্সি কবি হিসেবেই দেখতে চাইতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত কবিতা কেবল ফার্সিতেই সম্ভব।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৪৫)

ফার্সির দার্শনিক গভীরতা প্রকাশের ক্ষমতা

গালিব ফার্সিকে শুধু অভিজাত ভাষা হিসেবেই নয়, বরং দার্শনিক গভীরতা প্রকাশের জন্য বেশি উপযোগী ভাষা হিসেবেও মনে করতেন। ফার্সি ভাষার ছিল সহস্রাধিক বছরের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, যেখানে দর্শন, সুফিবাদ, রূপক, চিত্রকল্প ও অলংকার ব্যবহারের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে উঠেছিল। ফেরদৌসী, রুমি, হাফেজ, সাদি, খাকানি, জামি এই সব মহান ফার্সি কবিদের রচনার মধ্যে দিয়ে ফার্সি ভাষা এক অপূর্ব দার্শনিক গভীরতা অর্জন করেছিল।

গালিব মনে করতেন, উর্দু ভাষা এখনো সেই দার্শনিক গভীরতা প্রকাশের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। উর্দু ছিল প্রধানত প্রেম, সৌন্দর্য ও আবেগ প্রকাশের ভাষা; কিন্তু জটিল দার্শনিক চিন্তা, সূক্ষ্ম অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসা, ইহাম-ইহতেরাকের (দ্ব্যর্থবোধকতার) জটিল কারুকাজ এসবের জন্য ফার্সিই ছিল অধিকতর উপযোগী।

এক চিঠিতে গালিব লিখেছিলেন: "ফার্সি ভাষা যেন এক মহাসমুদ্র যত গভীরে যাও, তত রত্ন পাও। উর্দু এখনো এক নদী মাত্র তার গভীরতা সীমিত। আমি যখন গভীর দর্শনের কথা বলতে চাই, ফার্সিতেই বলি। উর্দুতে বললে মনে হয়, যেন অগভীর জলে ডুব দিচ্ছি।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩২২)

গালিবের এই মূল্যায়নে কিছুটা সত্য ছিল, কিছুটা পক্ষপাত। সত্য ছিল এই যে, ফার্সি সাহিত্যের দার্শনিক ঐতিহ্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, এবং গালিব নিজে সেই ঐতিহ্যের অংশ ছিলেন। পক্ষপাত ছিল এই যে, গালিব হয়তো উর্দু ভাষার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সম্ভাবনাকে পুরোপুরি চিনতে পারেননি। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, উর্দু ভাষাও দার্শনিক গভীরতা প্রকাশে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ স্বয়ং গালিবেরই উর্দু কাব্য।

সাহিত্যিক পরিচয়ের রাজনীতি

গালিবের ফার্সি-প্রীতির পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সাহিত্যিক পরিচয়ের রাজনীতি। উর্দু তখনো পর্যন্ত একটি আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য হতো, যেখানে ফার্সি ছিল এক আন্তর্জাতিক ভাষা, যা ইরান থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাহন। ফার্সি কাব্যের জগতে গালিবের স্থান হতো বিশ্বপর্যায়ের কবিদের পাশে; উর্দু কাব্যে তাঁর স্থান হতো কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানায়।

গালিব এই আন্তর্জাতিক পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করতেন। তিনি চাইতেন, তাঁকে যেন ফেরদৌসী, হাফেজ, রুমির উত্তরসূরি হিসেবে দেখা হয়, কেবল মীর-সওদার উত্তরসূরি হিসেবে নয়। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি চাই না, লোক আমাকে কেবল দিল্লির কবি বলে জানে। আমি চাই, আমার নাম পৌঁছাক সমরখন্দে, বোখারায়, ইসফাহানে, শিরাজে যেখানে ফার্সি ভাষার জন্ম, সেখানেও যেন লোকে জানে, গালিব নামে একজন কবি হয়েছে।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৪০৫)

এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছিল কি? আংশিকভাবে। গালিবের জীবদ্দশায় ইরানের কাজার রাজদরবারের কবিরা তাঁর ফার্সি কাব্যের প্রশংসা করেছিলেন। ইরানের শাহ নাসিরউদ্দিন শাহ কাজার গালিবের কাসিদা পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং গালিবকে একটি সম্মানসূচক খেলাত (সম্মানবস্ত্র) পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও গালিব কখনো ফার্সি কাব্যের জগতে সেরকম স্থান পাননি, যেরকম পেয়েছিলেন উর্দু কাব্যে। এর কারণ, ফার্সি কাব্যের জগৎ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রতিযোগিতামূলক, এবং সেখানে গালিব ছিলেন এক বহিরাগত যেমন বহিরাগত ছিলেন বেদিল, আমীর খসরুর মতো ভারতীয় ফার্সি কবিরা।

ফার্সি-উর্দু দ্বন্দ্ব: একটি আত্মবিভক্তি

গালিবের ফার্সি-প্রীতি আসলে ছিল এক আত্মবিভক্তির প্রকাশ তিনি একই সঙ্গে ফার্সি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এবং ভারতীয় বাস্তবতার বাসিন্দা। এই দ্বন্দ্ব তাঁর সারাজীবনের পরিচয়-সংকটের অংশ। তিনি যে সমাজে বাস করতেন, তার ভাষা ছিল ক্রমশ উর্দুর দিকে ঝুঁকছে; কিন্তু তিনি যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, তার ভাষা ছিল ফার্সি। ফলে গালিবের সাহিত্যিক সত্তা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত একদিকে ফার্সি কবি, অন্যদিকে উর্দু কবি।

নারঙ এই দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করে লিখেছেন: "গালিবের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ছিল, তিনি যে ভাষাকে নিজের শ্রেষ্ঠ রচনার বাহন বলে মনে করতেন, সেই ভাষাই ইতিহাসের ধারায় উপেক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে, যে ভাষাকে তিনি কম গুরুত্ব দিতেন, সেই ভাষাই তাঁকে অমর করেছে। এই পরিহাস গালিব হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন শেষ বয়সে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪০৭)

সত্যিই কি গালিব শেষ বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন? কিছু প্রমাণ আছে যে, পেরেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি নিজের উর্দু দিওয়ান (কাব্যসংকলন) সম্পাদনা ও পরিমার্জনার কাজ করেছিলেন, যা ইঙ্গিত করে, তিনি উর্দু কাব্যের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি কখনো প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি যে, উর্দু কাব্যই তাঁকে অমর করবে। বরং শেষ পর্যন্ত তিনি বলে গেছেন: "আমার ফার্সি দেখো, তবেই বুঝবে আমি কেমন কবি।"

ফার্সি কাব্যের নানা রূপ

গজল: ফার্সি গজলের ধারা ও গালিবের উদ্ভাবন

গালিব ফার্সি ভাষায় প্রচুর গজল রচনা করেছিলেন সম্ভবত উর্দুর চেয়েও বেশি। কিন্তু এই ফার্সি গজলগুলি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি, এবং পরবর্তীকালে তেমন পঠিতও হয়নি। কেন? এর প্রধান কারণ হল, গালিবের ফার্সি গজল ছিল অত্যন্ত জটিল, দার্শনিক ও ইহামপূর্ণ।

ফার্সি কাব্যের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল, গালিব তাতে নিজেকে স্থাপন করতে গিয়ে অনেক বেশি কৃত্রিম ও আত্মসচেতন হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর ফার্সি গজলগুলি উর্দু গজলের মতো স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়নি।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিবের ফার্সি গজলগুলি অনেকাংশে সনাতন ফার্সি কাব্যের অনুসরণ, যেখানে তাঁর নিজস্ব মৌলিকতা তেমন প্রকাশিত হয়নি। অন্যদিকে, উর্দু গজলে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন, এবং সেই স্বাধীনতাই তাঁকে মৌলিক হতে সাহায্য করেছিল।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩২৫)

তবে গালিবের ফার্সি গজল সম্পূর্ণ মৌলিকতাহীন ছিল না। কিছু কিছু গজলে তিনি ফার্সি কাব্যের সনাতন বিষয় প্রেম, সৌন্দর্য, সুফিবাদ নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে, যে গজলগুলিতে তিনি অস্তিত্বের সংকট, ঈশ্বরের স্বরূপ ও মানবাত্মার মাহাত্ম্য নিয়ে লিখেছেন, সেগুলি যথার্থই মৌলিক।

গালিবের ফার্সি গজলের একটি উদাহরণ দেখা যাক:

از دلِ ہر□رّہ آوازے□نید□ کز فنا
نیست ممکن جز بہ فانی گشتن، از فانی رہا

অজ দিল-এ-হর জাররা আওয়াজে শুনীদম কজ ফানা
নীস্ত মুমকিন জুজ ব-ফানা গাশতন, অজ ফানা রহা

(প্রত্যেক অণুর হৃদয় থেকে ধ্বনি শুনলাম ধ্বংসের: "ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া ধ্বংস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।")

এই শেরে গালিব সৃষ্টিতত্ত্বের এক গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন প্রত্যেক অস্তিত্বের মধ্যেই ধ্বংস নিহিত আছে, এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়েই অস্তিত্বের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব। এটি গালিবের অস্তিত্ববাদী দর্শনের ফার্সি প্রকাশ। কিন্তু এই ধরনের শের ফার্সি গজলের সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, এবং সেই কারণেই গালিবের ফার্সি গজল জনপ্রিয়তা পায়নি।

কাসিদা: রাজপ্রশস্তি ও তাতে নতুনত্বের সঞ্চার

কাসিদা হল প্রশস্তিমূলক কবিতা, যেখানে কবি কোনো রাজা, নবাব বা পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসা করেন। ফার্সি সাহিত্যে কাসিদার এক দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। ফেরদৌসী, খাকানি, সাদি, জামি সবাই কাসিদা রচনা করেছেন। গালিবও ফার্সি ভাষায় প্রচুর কাসিদা লিখেছেন বাহাদুর শাহ জাফর, আওধের নবাব, রামপুরের নবাব, এমনকি রানি ভিক্টোরিয়ার প্রশংসাতেও তিনি কাসিদা লিখেছিলেন।

গালিবের কাসিদাগুলির একটি বড় অংশই ছিল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে লেখা যেমনটা তখনকার রীতি ছিল। রাজা-নবাবেরা কবিদের কাসিদা লিখে পুরস্কার দিতেন। গালিবও এই রীতির ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু সাধারণ তোষামোদমূলক কাসিদার বাইরেও গালিব কিছু কাসিদা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি প্রশস্তির আড়ালে নিজের দার্শনিক ও সাহিত্যিক চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ গালিবের কাসিদা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের কাসিদাগুলিতে এক অদ্ভুত দ্বৈততা আছে বাইরে রাজপ্রশস্তি, ভেতরে কবির নিজস্ব দর্শন। অনেক কাসিদায় তিনি প্রশস্তির আড়ালে নিজের কবি-সত্তার মহিমাও ঘোষণা করেছেন, যা সনাতন কাসিদার রীতিতে অচল ছিল।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪১০)

গালিবের একটি বিখ্যাত কাসিদা, যা তিনি বাহাদুর শাহ জাফরের প্রশংসায় লিখেছিলেন, তার একটি অংশ:

□ہنشہِ دورا□، جہاں دارِ زماں، بہادر □اہ
کہ از فیضِ وجودش عالمِ امکاں جلوہ گر با□د

শাহানশাহ-এ-দৌরাঁ, জাহাঁদার-এ-জমাঁ, বাহাদুর শাহ
কে অজ ফয়জ-এ-ওজুদশ আলম-এ-ইমকাঁ জলওয়াগর বাশদ

(যুগের সম্রাট, কালের জগৎ-অধিকারী, বাহাদুর শাহ, যাঁর অস্তিত্বের দানে সম্ভাবনার জগৎ আলোকিত থাকে।)

এই কাসিদায় সম্রাটের প্রশংসা আছে, কিন্তু একই সঙ্গে গালিব নিজের কাব্যিক দক্ষতাও প্রদর্শন করেছেন ফার্সি ভাষার অলংকার ও ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে। এটি ছিল একই সঙ্গে রাজপ্রশস্তি ও আত্মপ্রশস্তি যেমনটি গালিবের স্বভাববিরুদ্ধ নয়।

মসনবি "আবরে গওহরবার": ছন্দ, বিষয় ও ব্যঞ্জনা

মসনবি হল দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা, যেখানে প্রতিটি পঙক্তির মধ্যে অন্ত্যমিল থাকে (আ-আ, ব-ব, ক-ক ছন্দে)। ফার্সি সাহিত্যে মসনবির এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল রুমির "মসনবি-এ-মানবী", ফেরদৌসীর "শাহনামা", নিজামির "পঞ্চ গঞ্জ" ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত মসনবি। গালিবও কয়েকটি মসনবি রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল "আবরে গওহরবার" (মুক্তা-ঝরানো মেঘ)।

"আবরে গওহরবার" রচিত হয়েছিল ১৮৫৬ সালে, এবং এটি ছিল গালিবের শেষ উল্লেখযোগ্য মসনবি। এই কাব্যটির বিষয় ছিল প্রকৃতি ও প্রেম বর্ষার মেঘ, বৃষ্টির সৌন্দর্য, এবং প্রেমিক-প্রেমাস্পদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সাধারণ প্রকৃতি-বর্ণনার আড়ালে গালিব গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছিলেন। বৃষ্টি এখানে হয়ে উঠেছে ঐশ্বরিক করুণার রূপক, মেঘ হয়ে উঠেছে দাতার প্রতীক, আর তৃষিত ভূমি হয়ে উঠেছে প্রেমিক আত্মার রূপক।

খলিলুর রহমান আজমি এই মসনবি সম্পর্কে লিখেছেন: "আবরে গওহরবার গালিবের ফার্সি কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এতে তিনি প্রকৃতি-বর্ণনার আড়ালে সুফি দর্শনের গভীর তত্ত্বগুলি তুলে ধরেছেন। মেঘ ও বৃষ্টির রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি খুদা ও মানবাত্মার সম্পর্ককে চিত্রিত করেছেন।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৫০)

মসনবিটির একটি উদাহরণ:

ابر آمد، بر سرِ گلریز باراں□د، بہشت
□ندہ بر لب کرد گل، از گریۂ ابرِ بہار

আব্র আমদ, বর সর-এ-গুলরেজ বারাঁ শোদ, বেহেশ্ত
খন্দা বর লব কর্দ গুল, অজ গিরিয়া-এ-আব্র-এ-বাহার

(মেঘ এলো, গোলাপ-ঝরানো বৃষ্টি হলো, যেন বেহেশ্ত; হাসি ফুটল গোলাপের ঠোঁটে, বসন্তের মেঘের কান্নায়।)

এখানে বৃষ্টি ও ফুলের সম্পর্ককে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়েছে মেঘের কান্নায় (বৃষ্টিতে) ফুলের হাসি ফোটে। এটি একই সঙ্গে প্রকৃতি-বর্ণনা ও রূপকার্থ প্রেমাস্পদের বিরহ-কান্নায় প্রেমিক আত্মার প্রস্ফুটন। এই ধরনের বহুস্তরীয় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করার দক্ষতা গালিব ফার্সি কাব্যের ঐতিহ্য থেকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং নিজের মৌলিকতায় তাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

রুবাই: চার পঙক্তির দার্শনিক ভাণ্ডার

রুবাই হল চার পঙক্তির কবিতা, যেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির অন্ত্যমিল থাকে। ফার্সি সাহিত্যে রুবাইয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি হলেন ওমর খৈয়াম, যাঁর রুবাইগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গালিবও অনেক রুবাই রচনা করেছিলেন, এবং সেগুলিতে তিনি সাধারণত দার্শনিক ও নীতিবাদী চিন্তা প্রকাশ করতেন।

গালিবের রুবাইগুলি তেমনভাবে সংকলিত বা অধীত হয়নি, কিন্তু যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি তাঁর দার্শনিক গভীরতার পরিচয় দেয়। একটি উদাহরণ:

از نیستیِ□ود چو□بردار□د□
در ہستیِ□ویش ناگہاں غرق□د□
گفتم کہ□دای را□ناسم، زِ ہماں
آگاہیِ□ویش،□ود پرستار□د□

অজ নীস্তি-এ-খোদ চো খবরদার শোদম
দর হাস্তি-এ-খীশ নাগহাঁ গরক শোদম
গোফতাম কে খোদায় রা শনাসম, জি হমাঁ
আগাহি-এ-খীশ, খোদ পরস্তার শোদম

(নিজের অনস্তিত্ব সম্পর্কে যখন সচেতন হলাম, নিজের অস্তিত্বের মধ্যে হঠাৎ ডুবে গেলাম। বললাম, খুদাকে চিনব সেই থেকে নিজের সচেতনতাই আমার উপাস্য হয়ে উঠল।)

এই রুবাইটিতে গালিব অস্তিত্ববাদী দর্শনের এক চরম প্রকাশ ঘটিয়েছেন নিজের অনস্তিত্বের সচেতনতা থেকে অস্তিত্বের সচেতনতায় উত্তরণ, এবং খুদাকে চেনার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত আত্ম-উপাসনায় পর্যবসিত হওয়া। এটি গালিবের সেই বিখ্যাত আত্মসচেতনতারই ফার্সি প্রকাশ, যার কথা আমরা তাঁর উর্দু কাব্যেও দেখেছি "হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন"।

ফার্সি গদ্যে মৌলিকতা

"পঞ্চ আয়না": পঞ্চতন্ত্রের আঙ্গিকে এক দর্পণ

গালিবের ফার্সি গদ্যের একটি অনন্য নিদর্শন হল "পঞ্চ আয়না" (পাঁচ আয়না)। এটি রচিত হয়েছিল ১৮৫৩ সালে, এবং এটি ছিল পঞ্চতন্ত্রের আঙ্গিকে লেখা এক নীতিকথামূলক গ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্র হল প্রাচীন ভারতীয় নীতিকথার সংকলন, যা সংস্কৃত থেকে ফার্সি ও আরবি ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। গালিব এই ঐতিহ্যেরই অংশ হিসেবে "পঞ্চ আয়না" রচনা করেন, যেখানে পাঁচটি গল্পের মাধ্যমে নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

"পঞ্চ আয়না"র বিশেষত্ব হল, এটি কেবল নীতিকথা নয়, বরং এর মধ্যে গালিব নিজের জীবনদর্শন, রসবোধ ও শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পগুলি সরল, কিন্তু প্রতিটি গল্পের শেষে যে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত গভীর ও গালিবীয় অর্থাৎ, সরল সত্য নয়, বরং জটিল, ব্যঞ্জনাময়, এবং কখনো কখনো কৌতুকপূর্ণ।

রালফ রাসেল "পঞ্চ আয়না" সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের ফার্সি গদ্যের সবচেয়ে উপভোগ্য রচনা হল 'পঞ্চ আয়না'। এতে তিনি দেখিয়েছেন, নীতিকথাও কীভাবে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হতে পারে। গল্পগুলির ভাষা সহজ, কিন্তু ব্যঞ্জনা গভীর। গালিব এখানে প্রমাণ করেছেন, তিনি কেবল কবিতায় নন, গদ্যও সমান দক্ষ।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৩০)

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, "পঞ্চ আয়না" তেমনভাবে পঠিত বা অধীত হয়নি। এর মূল পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল হারিয়ে ছিল, পরে উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু তবু এটি গালিব-সাহিত্যের উপেক্ষিত অংশই রয়ে গেছে। অথচ এই গ্রন্থটি গালিবের শিল্পীসত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে তিনি শুধু গজল বা কাসিদার কবি ছিলেন না, বরং গদ্যশিল্পী হিসেবেও তিনি ছিলেন অসামান্য।

"দাস্তামবু": ইতিহাস ও সাহিত্যের সংকর

গালিবের ফার্সি গদ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিতর্কিত রচনা হল "দাস্তামবু" (পানসে কস্তুরি) যে গ্রন্থটি আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (অধ্যায় ৮) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় দিল্লির ঘটনাবলির ওপর রচিত এই দিনলিপিটি কেবল ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং এক অনন্য সাহিত্যিক সৃষ্টি। গালিব এতে ইতিহাস ও সাহিত্যের এক সংকর রূপ তৈরি করেছিলেন যেখানে একদিকে আছে ঘটনার বিবরণ, অন্যদিকে আছে সাহিত্যিক অলংকার, ব্যঞ্জনা ও কাব্যিক গদ্যের সৌন্দর্য।

"দাস্তামবু" সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি যে, এটি রচিত হয়েছিল ফার্সির অতি প্রাচীন 'দাসাতির' শৈলীতে, আরবি শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করে। গালিবের এই পছন্দের পেছনে নান্দনিক ও রাজনৈতিক দুই ধরনের কারণই ছিল। নান্দনিক কারণ: তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, তিনি ফার্সির প্রাচীনতম রীতিতেও অনায়াসে লিখতে পারেন। রাজনৈতিক কারণ: ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তিনি এই দুর্বোধ্য শৈলী বেছে নিয়েছিলেন, যাতে সাধারণ পাঠক নয়, কেবলমাত্র বিদ্বজ্জনেরাই এটি পড়তে পারেন।

খলিলুর রহমান আজমি "দাস্তামবু"র সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে লিখেছেন: "দাস্তামবু কেবল একটি দিনলিপি নয়, বরং এক শোকগাথা যেখানে গালিব একটি শহরের, একটি সভ্যতার, এবং নিজের জগতের ধ্বংসের কাহিনি লিখেছেন। এর ভাষা প্রাচীন, কিন্তু বেদনা একেবারে সমসাময়িক। গালিব এখানে ইতিহাসকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছেন, এবং এই রূপান্তরেই 'দাস্তামবু'র প্রকৃত মৌলিকতা।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৫৫)

তবে "দাস্তামবু" নিয়ে বিতর্কও আছে। গালিব এতে বিদ্রোহীদের প্রতি যে কঠোর নিন্দা এবং ব্রিটিশদের প্রতি যে প্রশংসা প্রকাশ করেছেন, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এটা কি গালিবের প্রকৃত মনোভাব, নাকি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ পুনরুদ্ধারের কৌশল? এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতভাবে দেওয়া কঠিন। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট: "দাস্তামবু" একটি অসামান্য সাহিত্যিক সৃষ্টি, যা ইতিহাস ও সাহিত্যের সীমানাকে মুছে দিয়েছে।

"মেহের-এ-নীমরোজ": ইতিহাস গ্রন্থের সাহিত্যিক রূপ

"মেহের-এ-নীমরোজ" (মধ্যাহ্নের সূর্য) হল গালিবের লেখা একটি ইতিহাস গ্রন্থ, যা তিনি রচনা করেছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের অনুরোধে। এই গ্রন্থে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তৈমুর লঙ থেকে শুরু করে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত। কিন্তু "মেহের-এ-নীমরোজ" সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ নয় এটি ইতিহাসের সাহিত্যিক রূপ, যেখানে তথ্যের চেয়ে ভাষার সৌন্দর্য, অলংকারের চমক ও গদ্যের ছন্দের দিকেই গালিবের বেশি মনোযোগ ছিল।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "মেহের-এ-নীমরোজ পড়লে বোঝা যায়, গালিব ইতিহাস লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যই লিখেছেন। তিনি ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে সাহিত্যিক গদ্যে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে, তা পড়লে মনে হয়, ইতিহাস নয়, যেন এক মহাকাব্য পড়ছি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৩৫)

এই গ্রন্থটিও সম্পূর্ণ হয়নি গালিব মাঝপথেই তা লেখা বন্ধ করেন, সম্ভবত ১৮৫৭ সালের বিপর্যয়ের কারণে। কিন্তু যা লেখা হয়েছে, তাতেই গালিবের ফার্সি গদ্যের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা দুই-ই স্পষ্ট। শক্তি হল ভাষার সৌন্দর্য, অলংকারের নিপুণতা, এবং গদ্যে কাব্যিক ছন্দ সৃষ্টির দক্ষতা। সীমাবদ্ধতা হল তথ্যের নিখুঁততা ও বস্তুনিষ্ঠতার অভাব। গালিব ইতিহাসকে সাহিত্যের মতো দেখতেন, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিই "মেহের-এ-নীমরোজ"কে এক স্বতন্ত্র রচনা হিসেবে চিহ্নিত করে।

ফার্সি গদ্যে গালিবের ভাষারীতি

গালিবের ফার্সি গদ্যের ভাষারীতি ছিল অত্যন্ত কৃত্রিম, অলংকারবহুল ও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। তিনি সহজ-সরল গদ্য লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং চাইতেন, তাঁর গদ্য যেন কাব্যের মতো সুন্দর হয়। ফলে তাঁর ফার্সি গদ্য পড়তে গেলে পাঠককে বেশ খাটতে হয় শব্দগুলি দুর্লভ, বাক্যগঠন জটিল, অলংকারের আধিক্য। এই কারণেই গালিবের ফার্সি গদ্য সাধারণ পাঠকের কাছে কখনো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু এই একই বৈশিষ্ট্যের জন্য বিদ্বজ্জনেরা গালিবের ফার্সি গদ্যের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "গালিবের ফার্সি গদ্য এমন এক বুনন, যেখানে প্রতিটি শব্দ যেন একটি মুক্তা, প্রতিটি বাক্য যেন একটি গজল। তিনি গদ্যকে কবিতার উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং এই উচ্চতায় পৌঁছতে গিয়ে তিনি যে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ক্ষমার্হ।" (হালী, ১৮৯৭: ১৪২)

ড. গোপী চাঁদ নারঙ এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত নন। তিনি লিখেছেন: "গালিবের ফার্সি গদ্য নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু তা কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট। গালিব যখন উর্দুতে চিঠি লিখতেন, তখন তাঁর ভাষা ছিল সহজ, প্রাণবন্ত, স্বাভাবিক। কিন্তু ফার্সি গদ্যে তিনি এক কৃত্রিম অভিজাত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে স্বাভাবিকতা হারিয়েছেন। এই কারণেই তাঁর ফার্সি গদ্য আজ ইতিহাসের অংশ, কিন্তু তাঁর উর্দু চিঠিগুলি আজও জীবন্ত।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪১৫)

এই মূল্যায়নের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য লুকিয়ে আছে: গালিব যখন নিজের স্বাভাবিক সত্তা নিয়ে লিখতেন, তখন তিনি অসামান্য। কিন্তু যখন তিনি নিজেকে 'মহৎ ফার্সি লেখক' হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইতেন, তখন তিনি কৃত্রিম হয়ে পড়তেন। এই কারণেই গালিবের ফার্সি কাব্য ও গদ্যের চেয়ে তাঁর উর্দু রচনাই বেশি কালজয়ী হয়েছে কারণ উর্দুতে তিনি ছিলেন স্বাভাবিক, আন্তরিক, এবং নিজের স্বত্তার সঙ্গে সৎ। ফার্সিতে তিনি ছিলেন এক মুখোশের আড়ালে যে মুখোশটি ছিল "মহৎ ফার্সি কবি"র মুখোশ।

ফার্সির স্থপতি, উর্দুর বিপ্লবী

গালিবের ফার্সি কাব্য ও গদ্য উপমহাদেশের ফার্সি সাহিত্যের শেষ মহৎ অধ্যায়। এর পরে ফার্সি ভাষা ভারতবর্ষে আর কখনো এমন উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি এটা যেমন সত্য, তেমনই এ-ও সত্য যে, গালিবের ফার্সি রচনা কখনো তাঁর উর্দু রচনার মতো সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফার্সি ভাষা ছিল অভিজাত, সীমিত পাঠকগোষ্ঠীর ভাষা; উর্দু ছিল জনগণের ভাষা। গালিব যখন ফার্সিতে লিখতেন, তিনি লিখতেন এক নির্বাচিত পাঠকগোষ্ঠীর জন্য; যখন উর্দুতে লিখতেন, লিখতেন সকলের জন্য। এই পার্থক্যই দুই ভাষায় তাঁর রচনার ভিন্ন ভাগ্য নির্ধারণ করেছে।

কিন্তু গালিবের ফার্সি রচনা সম্পর্কে আমরা যদি এই বলে উপেক্ষা করি যে, "তিনি নিজেই বলেছেন 'আমার ফার্সি দেখো', অথচ আমরা তাঁর উর্দুই পড়ি" তাহলে গালিবের শিল্পীসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে আমরা হারাব। গালিবের ফার্সি রচনা হল তাঁর সাহিত্যিক ভিত্তির মূল যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি উর্দু কাব্যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ফার্সি কাব্যের দার্শনিক গভীরতা, অলংকারের নিপুণতা, ভাষার ওপর অসামান্য দখল এসব ছাড়া তাঁর উর্দু কাব্যের সাফল্য সম্ভব ছিল না। গালিব প্রথমে ফার্সির স্থপতি, তারপর উর্দুর বিপ্লবী। এই দুই পরিচয় একে অপরের পরিপূরক, বিচ্ছিন্ন নয়।

নির্বাচিত শের: ফার্সি কাব্যের অনুষঙ্গে

از دلِ ہر□رّہ آوازے□نید□ کز فنا
نیست ممکن جز بہ فانی گشتن، از فانی رہا

অজ দিল-এ-হর জাররা আওয়াজে শুনীদম কজ ফানা
নীস্ত মুমকিন জুজ ব-ফানা গাশতন, অজ ফানা রহা

(প্রত্যেক অণুর হৃদয় থেকে ধ্বনি শুনলাম ধ্বংসের: "ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া ধ্বংস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।")

از نیستیِ□ود چو□بردار□د□
در ہستیِ□ویش ناگہاں غرق□د□
گفتم کہ□دای را□ناسم، زِ ہماں
آگاہیِ□ویش، □ود پرستار□د□

অজ নীস্তি-এ-খোদ চো খবরদার শোদম
দর হাস্তি-এ-খীশ নাগহাঁ গরক শোদম
গোফতাম কে খোদায় রা শনাসম, জি হমাঁ
আগাহি-এ-খীশ, খোদ পরস্তার শোদম

(নিজের অনস্তিত্ব সম্পর্কে যখন সচেতন হলাম, নিজের অস্তিত্বের মধ্যে হঠাৎ ডুবে গেলাম। বললাম, খুদাকে চিনব সেই থেকে নিজের সচেতনতাই আমার উপাস্য হয়ে উঠল।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, গালিবের ফার্সি কাব্য ও গদ্য ছিল একই সঙ্গে তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা। শক্তি এই অর্থে যে, ফার্সি তাঁকে দিয়েছিল দার্শনিক গভীরতা, ভাষার ওপর অসামান্য দখল, এবং এক আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক পরিচয়। দুর্বলতা এই অর্থে যে, ফার্সির কৃত্রিম অভিজাত্য তাঁকে অনেক সময় স্বাভাবিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, এবং তাঁর ফার্সি রচনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি।

আপনি যদি কোনো বিদেশি ভাষায় দক্ষ হন, তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন: আপনি কি সেই ভাষায় আপনার মনের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন, নাকি মাতৃভাষায়ই পারেন? গালিবের জন্য ফার্সি ছিল এক ধরনের 'অর্জিত মাতৃভাষা' যে ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু যা কখনো তাঁর স্বাভাবিক সত্তার সম্পূর্ণ বাহন হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর স্বাভাবিক সত্তার প্রকৃত বাহন ছিল উর্দু যে ভাষায় তিনি হাসতেন, কাঁদতেন, রাগ করতেন, রসিকতা করতেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই উর্দু কাব্যের জগতে প্রবেশ করব, যেখানে গালিব হয়ে উঠেছিলেন এক বিপ্লবী, এবং দেখব কীভাবে তিনি উর্দু গজলকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যায় ১১: উর্দু গজলে বিপ্লব

একটি রূপান্তরের মহাকাব্য

সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন একজন শিল্পী কোনো ধারাকে এতটাই বদলে দেন যে, তার আগে ও পরে এক সুস্পষ্ট রেখা টেনে দেওয়া যায়। উর্দু গজলের ইতিহাসে গালিব সেই রেখাটিই টেনেছিলেন। গালিবের আগে উর্দু গজল ছিল প্রধানত প্রেম, সৌন্দর্য, বেদনা ও আধ্যাত্মিকতার কাব্য যা হৃদয়কে স্পর্শ করত, কিন্তু বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করত না। গালিব এসে সেই গজলকে রূপান্তরিত করলেন এক দার্শনিক জিজ্ঞাসায়, এক অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধানে, এক বুদ্ধিবৃত্তিক দুঃসাহসে। যে গজল একসময় ছিল "সাধারণ প্রেমপত্র", গালিবের হাতে তা হয়ে উঠল "জীবন-জিজ্ঞাসার কাব্য"। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "গালিব উর্দু গজলকে কেবল নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাননি, বরং তাকে এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত দিয়েছেন। তাঁর পরে উর্দু গজল আর আগের মতো থাকতে পারেনি।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪২০)

এই অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের উর্দু কাব্যের জগতে সেই জগতে যেখানে তিনি একই সঙ্গে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ও বিপ্লবী, প্রেমের কবি ও দার্শনিক, সরলতার আড়ালে জটিলতার রচয়িতা। আমরা বুঝতে চেষ্টা করব, কেন এবং কীভাবে গালিবের উর্দু গজল উর্দু সাহিত্যে এক বিপ্লব ঘটিয়েছিল, এবং সেই বিপ্লবের স্থায়ী প্রভাব কী। আমরা পর্যালোচনা করব তাঁর কাব্যভাষা, অলংকার, দর্শন, দিওয়ান সংকলনের ইতিহাস, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই মৌলিকতা, যাকে বলা হয় 'গালিবিয়াত'।

গালিবের আগে উর্দু গজল

দিল্লি ও লখনউ: দুই কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য

গালিব যখন উর্দু গজলের জগতে প্রবেশ করেন, তখন এই ধারাটি প্রধানত দুটি কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল দিল্লি ও লখনউ। এই দুই কেন্দ্রের কাব্যধারার মধ্যে ছিল সুস্পষ্ট পার্থক্য, এবং এই পার্থক্যই সমসাময়িক উর্দু কাব্যচর্চার গতিপথ নির্ধারণ করছিল। দিল্লি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী, এবং এখানকার কবিরা ছিলেন গাম্ভীর্য, আধ্যাত্মিকতা ও সংযত প্রকাশভঙ্গির পৃষ্ঠপোষক। লখনউ ছিল আওধের নবাবদের বিলাসবহুল রাজধানী, এবং এখানকার কবিরা ছিলেন ইন্দ্রিয়সংবেদী সৌন্দর্য, অলংকারপ্রিয়তা ও সহজবোধ্য প্রকাশভঙ্গির অনুরাগী। সৈয়দ আবদুল্লাহ তাঁর "উর্দু আদব কী তারিখ" গ্রন্থে লিখেছেন: "দিল্লি ও লখনউ ছিল উর্দু সাহিত্যের দুই মেরু। দিল্লি যেখানে গাম্ভীর্যের পৃষ্ঠপোষক, লখনউ সেখানে চাকচিক্যের উপাসক।" (আবদুল্লাহ, ১৯৬৭: ২০১)

দিল্লি ঘরানার কবিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মীর তকী মীর, যাঁর সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মীরের কাব্যে প্রেমের গভীরতা, বিষাদের সূক্ষ্মতা ও হৃদয়ের কোমলতা ছিল প্রবল। দিল্লি ঘরানার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন মীর দর্দ, যিনি সুফি আধ্যাত্মিকতায় গভীর ছিলেন, এবং সওদা, যিনি বলিষ্ঠতা ও ব্যঙ্গের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দিল্লি ঘরানার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল: (ক) ভাষায় ফার্সির প্রভাব; (খ) প্রকাশভঙ্গির গাম্ভীর্য ও সংযম; (গ) বিষয়বস্তুতে প্রেম, বিষাদ ও আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য; (ঘ) ছন্দ ও অলংকারের পরিমিত ব্যবহার; (ঙ) এবং এক ধরনের অভিজাত গাম্ভীর্য, যা কবিতাকে সাধারণের বোধগম্যতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখত।

অন্যদিকে লখনউ ঘরানা ছিল আরও ইন্দ্রিয়সংবেদী, অলংকারপ্রিয় ও জনপ্রিয়তা-কেন্দ্রিক। লখনউয়ের কবিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জওক (যাঁর সঙ্গে গালিবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আমরা জেনেছি), নাসিখ, আতিশ প্রমুখ। লখনউ ঘরানার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল: (ক) ভাষায় হিন্দুস্তানি বা রেখতার প্রভাব, ফার্সির জটিলতা তুলনামূলকভাবে কম; (খ) প্রকাশভঙ্গির সরলতা ও ইন্দ্রিয়সংবেদিতা; (গ) বিষয়বস্তুতে প্রেমের ভোগবাদী রূপ, সৌন্দর্যের বাহ্যিক চিত্রণ; (ঘ) অলংকারের আধিক্য, বিশেষ করে শব্দালংকারের; (ঙ) এবং মুশায়রায় তৎক্ষণাৎ জনপ্রিয়তা লাভের জন্য উপযোগী সহজবোধ্য গজল রচনার প্রবণতা।

গালিব এই দুই ঘরানারই উত্তরাধিকার বহন করতেন, কিন্তু একই সঙ্গে কোনোটিরই সম্পূর্ণ অনুসারী ছিলেন না। তিনি দিল্লির বাসিন্দা, এবং দিল্লির গাম্ভীর্যই ছিল তাঁর কাব্যের ভিত্তি। কিন্তু তিনি লখনউয়ের কবিতাও পড়তেন, লখনউ যাতায়াত করতেন, এবং সেখানকার কিছু বৈশিষ্ট্যও গ্রহণ করেছিলেন। নারঙ লিখেছেন: "গালিবের অবস্থান ছিল দুই ঘরানার মাঝামাঝি নয়, বরং দুইয়ের ঊর্ধ্বে। তিনি দিল্লি থেকে নিয়েছিলেন গাম্ভীর্য ও দার্শনিকতা, লখনউ থেকে নিয়েছিলেন ভাষার সাবলীলতা ও নতুন ভাবসৃষ্টির উৎসাহ। এই দুইয়ের সংশ্লেষই 'গালিবিয়াত'-এর জন্ম দিয়েছিল।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪২৫)

মীরের মানবিক কোমলতা বনাম সওদার বলিষ্ঠতা

গালিবের পূর্ববর্তী উর্দু গজলের দুই প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন মীর তকী মীর ও মীর্জা রফি সওদা। এঁদের কাব্যশৈলী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং এই বিপরীততাই গালিবের কাব্যের জন্য এক সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। মীরের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিক কোমলতা, হৃদয়ের সরল প্রকাশ, এবং বিষাদের গভীরতা। তিনি প্রেমের বেদনাকে এমনভাবে প্রকাশ করতেন যেন একজন মানুষ তাঁর হৃদয় উজাড় করে কাঁদছেন। তাঁর ভাষা ছিল সরল, অনাড়ম্বর, দৈনন্দিন কথ্যভাষার কাছাকাছি। কিন্তু এই সরলতার মধ্যেই তিনি প্রকাশ করতে পারতেন গভীরতম অনুভূতি।

মীরের একটি বিখ্যাত শের:

دلِ ویراں ہے، تیرا دیوانہ پھرتا ہے
□دا جانے، کسے ڈھونڈتا ہے، کیا مانگتا ہے

দিল-এ-বীরা হ্যায়, তেরা দিওয়ানা ফিরতা হ্যায়
খুদা জানে, কিসে ঢুঁডতা হ্যায়, ক্যা মাঙ্গতা হ্যায়

(ধ্বংসপ্রাপ্ত এই হৃদয়, তোমার পাগল ঘুরে বেড়ায়। খুদা জানেন, কাকে খোঁজে, কী চায়।)

এই শেরটিতে যে সরলতা, যে আবেগ, যে অসহায়তার প্রকাশ তা গালিবের কাব্যে বিরল। গালিব কখনো এত সরাসরি আবেগ প্রকাশ করতেন না; তিনি আবেগকে বুদ্ধির ফিল্টারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতেন। কিন্তু মীরের এই সরলতা গালিবের কাছেও ছিল গভীর শ্রদ্ধার বিষয়। রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিব মীরের সরলতার গভীরতা বুঝতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু নিজে কখনো সেই পথে হাঁটেননি। গালিবের পথ ছিল জটিলতার পথ, বুদ্ধির পথ, এবং এই পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সচেতনভাবে।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৪০)

অন্যদিকে সওদার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বলিষ্ঠতা, ব্যঙ্গ ও বাস্তববাদী দৃষ্টি। সওদা যেখানে প্রেমের কাব্য লিখেছেন, সেখানেও তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল দৃপ্ত, শক্তিশালী, পুরুষালি। আর যেখানে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, সেখানে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সওদার ভাষা ছিল ধারালো, শব্দচয়ন ছিল আঘাত হানার মতো, এবং ব্যঞ্জনা ছিল সুস্পষ্ট।

সওদার একটি বিখ্যাত শের:

ہنستے ہیں ہم کو دیکھ کے وہ □وخ چشم و زلف
دیوانے جانتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں

হঁসতে হ্যায় হম কো দেখ কে ওহ শোখ চশম ও জুল্ফ
দিওয়ানে জানতে হ্যাঁয়, হমে কাফির সমঝতে হ্যায়

(দেখে আমাদের হাসে সেই চঞ্চল চোখ ও কেশের অধিকারী, আমাদের পাগল মনে করে, কাফের ভাবে।)

এই শেরে সওদার ব্যঙ্গ ও বলিষ্ঠতা স্পষ্ট। কিন্তু গালিবের কাব্যে সওদার মতো সরাসরি আঘাত নেই; বরং গালিবের আঘাত লুকিয়ে থাকে শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতায়, ইঙ্গিতের আড়ালে। গালিব সওদার বলিষ্ঠতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে নিজের মতো করে রূপান্তরিত করেছিলেন বাহ্যিক আঘাত থেকে অভ্যন্তরীণ আঘাতে।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "মীর ও সওদা ছিলেন গালিবের দুই পূর্বসূরি, দুই বিপরীত মেরু। মীর তাঁকে শিখিয়েছিলেন হৃদয়ের ভাষা, সওদা শিখিয়েছিলেন বুদ্ধির ভাষা। গালিব এই দুই ভাষাকে একত্রিত করে সৃষ্টি করলেন এক নতুন ভাষা যেখানে হৃদয় ও বুদ্ধি একই সঙ্গে কথা বলে, কখনো একমত হয়ে, কখনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৬০)

গালিবের আবির্ভাবের পূর্বে উর্দু গজলের সীমাবদ্ধতা

গালিব যখন কাব্যচর্চা শুরু করেন, তখন উর্দু গজল এক বিশেষ সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রথমত, বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা। উর্দু গজল ছিল প্রধানত প্রেম ও সৌন্দর্যের কাব্য হয় পার্থিব প্রেম, নয় আধ্যাত্মিক প্রেম। দর্শন, অস্তিত্ববাদ, সংশয়, সমাজবাস্তবতা এসব বিষয় গজলে খুবই কম স্থান পেত। দ্বিতীয়ত, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা। উর্দু গজলের ভাষা ছিল হয় ফার্সি-মিশ্রিত (দিল্লি ঘরানা), নয় হিন্দুস্তানি-মিশ্রিত (লখনউ ঘরানা)। কিন্তু কোনো ঘরানাই ভাষাকে দার্শনিক জটিলতা প্রকাশের জন্য পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেনি।

তৃতীয়ত, অলংকারের সীমাবদ্ধতা। উর্দু গজলের অলংকার ছিল অনেকাংশে সনাতন প্রেমিক-প্রেমাস্পদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা, প্রেমের বেদনার সরল চিত্রণ, আধ্যাত্মিক প্রেমের রূপক। কিন্তু শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতা (ইহাম), দার্শনিক ব্যঞ্জনা, আত্মপরীক্ষার জটিলতা এসবের ব্যবহার ছিল সীমিত। চতুর্থত, আত্মসচেতনতার অভাব। পূর্ববর্তী কবিরা অনেকাংশে ছিলেন স্বাভাবিক ও অনায়াস; তাঁদের কাব্যে নিজের কবি-সত্তা সম্পর্কে সচেতনতার তেমন প্রকাশ ছিল না। গালিব এই প্রতিটি সীমাবদ্ধতা ভেঙে দিয়েছিলেন।

নারঙ লিখেছেন: "গালিবের আগে উর্দু গজল ছিল এক সুন্দর বাগান, যেখানে প্রেমের ফুল ফুটত, বিষাদের পাখি গান গাইত। গালিব এই বাগানে নিয়ে এলেন দর্শনের আগাছা, সংশয়ের কাঁটা, অস্তিত্ববাদের পাথর এবং সেই আগাছা-কাঁটা-পাথর মিলিয়েই সৃষ্টি করলেন এক নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য, যা আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল, কিন্তু অনেক বেশি সত্য।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪২৮)

গালিবীয় ঘরানা বা 'গালিবিয়াত'

'গালিবিয়াত' ধারণার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

'গালিবিয়াত' শব্দটি উর্দু সাহিত্য-সমালোচনায় এক বিশেষ অর্থ বহন করে। এটি কেবল গালিবের কাব্যশৈলী নয়, বরং তাঁর সমগ্র কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, ভাষারীতি, অলংকারপ্রয়োগ ও আত্মসচেতনতার সমষ্টি। আবদুর রহমান বিজনৌরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব"-এ প্রথম 'গালিবিয়াত' শব্দটি সুসংহতভাবে ব্যবহার করেন এবং এর ব্যাখ্যা দেন। তিনি লিখেছেন: "গালিবিয়াত হল এমন এক কাব্যশৈলী, যেখানে সরল অনুভূতি জটিল বুদ্ধিবৃত্তিকতায় রূপান্তরিত হয়, যেখানে প্রেম দর্শনে পরিণত হয়, যেখানে ব্যক্তিগত বেদনা অস্তিত্ববাদী সংকটে উত্তীর্ণ হয়।" (বিজনৌরী, ১৯২১: ৪৫)

রালফ রাসেল 'গালিবিয়াত' সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবিয়াত কেবল একটি কাব্যশৈলী নয়, বরং এক সম্পূর্ণ জীবনদর্শন। এর মূল উপাদানগুলি হল: ইহামগোই (দ্ব্যর্থবোধকতা), তাজাহগোই (নতুনত্বের সন্ধান), মাজমুন আফিরিনি (নতুন ভাবসৃষ্টি), বিমূর্ততা, দার্শনিকতা, আত্মসচেতনতা এবং এক বিশেষ ধরনের কৌতুকপ্রিয়তা, যা বেদনার মধ্যেও হাসির সঞ্চার করে।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৪৫)

ড. গোপী চাঁদ নারঙ যোগ করেছেন: "গালিবিয়াত হল উর্দু গজলের আধুনিকতার সূচনা। গালিবের আগে উর্দু গজল ছিল মধ্যযুগীয় কাব্য; গালিব তাকে নিয়ে এলেন আধুনিক যুগে। তাঁর হাতে গজল হয়ে উঠল একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন, আবেগময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক, ঐতিহ্যময় ও বিপ্লবী।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৩০)

"ইহামগোই": দ্ব্যর্থবোধকতার জাদু

ইহামগোই হল গালিবিয়াতের সবচেয়ে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। 'ইহাম' শব্দের অর্থ হল এমন কিছু যা সন্দেহ সৃষ্টি করে, যা একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক অর্থ বহন করে। গালিবের কাব্যে ইহামগোই এক অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। তিনি শব্দ ও বাক্যের এমন ব্যবহার করতেন, যাতে একটি পঙ্ক্তির একাধিক অর্থ বের হতে পারে একটি সরল, আরেকটি গভীর; একটি আবেগি, আরেকটি দার্শনিক; একটি ব্যক্তিগত, আরেকটি সার্বজনীন।

ইহামগোই-র একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ গালিবের এই বিখ্যাত শেরটি:

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

এই শেরটিতে ইহামের একাধিক স্তর আছে। প্রথম পঙ্ক্তিটি কেবল সৃষ্টিতত্ত্বের বিবৃতি নয়, বরং একই সঙ্গে এটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের দ্বান্দ্বিকতাকে স্পর্শ করে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটি একই সঙ্গে ব্যক্তিগত অস্তিত্ববাদের বেদনা এবং আত্ম-অবমূল্যায়নের চরম প্রকাশ "আমি না থাকলে কী ক্ষতি ছিল?" এই প্রশ্নের মধ্যে একই সঙ্গে নৈরাশ্য ও অহংকার রয়েছে।

রাসেল এই শেরের ইহাম বিশ্লেষণ করে লিখেছেন: "এই শেরটিতে গালিব একই সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিজের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করছেন। 'কুছ না হোতা তো খুদা হোতা' এই বাক্যটির অর্থ একদিকে 'যদি কিছুই সৃষ্টি না হতো, তাহলে খুদাই থাকতেন', অন্যদিকে 'আমি যদি অস্তিত্ববান না হতাম, তাহলে আমিই খুদা হতাম'। এই দ্ব্যর্থবোধকতা গালিবের ইহামগোই-এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৪৮)

আরেকটি উদাহরণ:

ہم کو ا□ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এই শেরটিতে 'ওফা' (বিশ্বস্ততা) শব্দটি ইহামের কাজ করছে। 'যারা বিশ্বস্ততা জানে না' এখানে 'জানে না' বলতে একই সঙ্গে 'চেনে না' ও 'পালন করে না' দুই অর্থই বোঝাতে পারে। আবার 'বিশ্বস্ততার আশা করা' এই বাক্যটিও ইহামপূর্ণ: আমরা কি সত্যিই তাদের কাছে বিশ্বস্ততা আশা করি, নাকি এই আশা করাটাই এক ধরনের পাগলামি, যা আমরাও জানি? এই দ্ব্যর্থবোধকতা গালিবের কাব্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

"তাজাহগোই": নতুনত্বের নিরন্তর সন্ধান

তাজাহগোই অর্থাৎ নতুনত্বের সন্ধান ছিল গালিবের কাব্যচর্চার এক মৌলিক চালিকাশক্তি। গালিব কখনো পুরনো ভাব, পুরনো রূপক, পুরনো অলংকারের পুনরাবৃত্তি করতে চাইতেন না। তিনি প্রতিটি শেরে নতুন কিছু বলতে চাইতেন, নতুন কিছু ভাবতে চাইতেন, নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচিত বিষয়কে দেখতে চাইতেন। এই তাজাহগোই-ই তাঁকে তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে আলাদা করেছিল।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের তাজাহগোই ছিল এক ধরনের সাহিত্যিক অস্থিরতা। তিনি কখনো এক জায়গায় স্থির থাকতে পারতেন না। যে ভাব তিনি একবার প্রকাশ করেছেন, তা আর দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে চাইতেন না। এই নিরন্তর নতুনত্বের সন্ধানই তাঁকে উর্দু গজলের সবচেয়ে মৌলিক কবি করে তুলেছিল।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৬৫)

গালিবের তাজাহগোই-এর একটি উদাহরণ:

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

পৃথিবীকে 'খেলাঘর' বলে কল্পনা করা নতুন কিছু নয় অনেক কবিই এই রূপক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু গালিবের নতুনত্ব এই যে, তিনি এই রূপককে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে 'আমি'-র অবস্থানটি স্পষ্ট হয় "মেরে আগে" অর্থাৎ আমার চোখের সামনে। অর্থাৎ, আমি এই তামাশার অংশ নই, আমি দর্শক। এই দর্শক-সত্তার ধারণাটি ছিল গালিবের মৌলিক অবদান।

আরেকটি উদাহরণ:

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরে গালিব একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে নতুনভাবে প্রকাশ করছেন দুঃখ যখন অত্যধিক হয়ে যায়, তখন তা আর দুঃখ বলে বোধ হয় না, বরং স্বাভাবিক হয়ে যায়। এটি এমন একটি ভাব, যা পূর্ববর্তী উর্দু কবিদের কাব্যে এত স্পষ্টভাবে আসেনি। গালিবের তাজাহগোই এখানেই তিনি নতুন মনস্তাত্ত্বিক সত্য আবিষ্কার করছেন এবং তাকে কাব্যে রূপ দিচ্ছেন।

"মাজমুন আফিরিনি": নতুন ভাবের সৃষ্টি

মাজমুন আফিরিনি অর্থাৎ নতুন ভাব বা বিষয়বস্তুর সৃষ্টি এটি গালিবিয়াতের তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। গালিব কেবল পুরনো ভাবকে নতুনভাবে প্রকাশ করতেন না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ভাবেরও সৃষ্টি করতেন। তিনি উর্দু গজলে এমন সব বিষয় নিয়ে এসেছিলেন, যা আগে কেউ আনেনি অস্তিত্ববাদ, সংশয়বাদ, আত্ম-অবমূল্যায়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতুক, এমনকি নিজের কবি-সত্তার সমালোচনা।

নারঙ লিখেছেন: "গালিবের মাজমুন আফিরিনি ছিল উর্দু গজলের ইতিহাসে এক বিপ্লব। তিনি গজলের বিষয়বস্তুর পরিধিকে বহুগুণে বিস্তৃত করেছিলেন। আগে গজল ছিল প্রধানত প্রেমের কাব্য; গালিবের হাতে তা হয়ে উঠল জীবনের সব প্রশ্নের কাব্য।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৩৫)

গালিবের মাজমুন আফিরিনির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ:

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

এই শেরে গালিব জীবন ও দুঃখের অভিন্নতাকে এক নতুন ভাবে প্রকাশ করছেন। 'কয়দ-এ-হায়াত' (জীবনের কারাগার) ও 'বন্দ-এ-গম' (দুঃখের বন্ধন) এই দুই রূপকই আলাদাভাবে পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু গালিব এদের এক করে দিচ্ছেন "দোনো এক হ্যাঁয়" এবং এই একীকরণের মধ্য দিয়ে একটি নতুন দার্শনিক সত্য প্রকাশ করছেন। তারপর দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে তিনি প্রশ্ন করছেন "মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?" এই প্রশ্নটি এমন এক অস্তিত্ববাদী সংশয় প্রকাশ করে, যা উর্দু গজলে আগে ছিল না।

বিমূর্ততা ও দর্শনের ব্যবহার

গালিবের কাব্যের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিমূর্ততা ও দর্শনের ব্যবহার। পূর্ববর্তী উর্দু কবিদের কাব্য ছিল অনেকাংশে মূর্ত প্রেমাস্পদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রেমের বেদনার শারীরিক প্রকাশ, প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট চিত্র। গালিব এই মূর্ততাকে ভেঙে বিমূর্ততার দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি প্রেমাস্পদের চুল, চোখ, ঠোঁটের বর্ণনার পরিবর্তে লিখতে শুরু করলেন প্রেমের স্বরূপ, অস্তিত্বের সংকট, ঈশ্বরের রহস্য, মৃত্যুর অর্থ এই সব বিমূর্ত, দার্শনিক বিষয় নিয়ে।

রাসেল লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে বিমূর্ততার মাত্রা এতটাই বেশি যে, অনেক সময় তাঁর শেরের অর্থ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু একই সঙ্গে এই বিমূর্ততাই তাঁর কাব্যকে দিয়েছে এক অসাধারণ গভীরতা ও বহুমাত্রিকতা।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৫২)

গালিবের বিমূর্ত দর্শনের একটি উদাহরণ:

ہوں گویا مستعدِ□وقِ پیکارِ □یال
ورنہ چپ چاپ سا رہتا ہے دلِ□یدا میرا

হুঁ গোয়া মুস্তায়েদ-এ-শওক-এ-পয়কার-এ-খেয়াল
ওয়ারনা চুপ চাপ সা রহতা হ্যায় দিল-এ-শায়দা মেরা

(আমি যেন প্রস্তুত আছি কল্পনার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায়; নইলে চুপচাপ পড়ে থাকে আমার পাগল হৃদয়।)

এই শেরে 'পয়কার-এ-খেয়াল' (কল্পনার যুদ্ধ) একটি সম্পূর্ণ বিমূর্ত ধারণা। গালিব বলছেন, তাঁর হৃদয় স্বাভাবিক অবস্থায় নীরব থাকে, কিন্তু যখন কল্পনার যুদ্ধ শুরু হয়, তখন তা জেগে ওঠে। এই 'কল্পনার যুদ্ধ' কী? তা গালিব নির্দিষ্ট করে বলেননি, এবং এই অনির্দিষ্টতাই শেরটির বিমূর্ত সৌন্দর্য।

গজলকে "সাধারণ প্রেমপত্র" থেকে "জীবন-জিজ্ঞাসার কাব্য"-এ উন্নীতকরণ

গালিবের সবচেয়ে বড় অবদান হল, তিনি উর্দু গজলকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আগে উর্দু গজল ছিল প্রধানত প্রেমের কাব্য হয় পার্থিব প্রেম, নয় আধ্যাত্মিক প্রেম। কিন্তু প্রেমের এই দুই রূপের বাইরে জীবন যে আরও অনেক প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অস্তিত্বের প্রশ্ন, ঈশ্বরের প্রশ্ন, মৃত্যুর প্রশ্ন, সমাজের প্রশ্ন তা উর্দু গজলে তেমন আসেনি। গালিব এই প্রশ্নগুলিকে গজলের মূল বিষয়বস্তু করে তুললেন।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিব উর্দু গজলকে 'সাধারণ প্রেমপত্র' থেকে 'জীবন-জিজ্ঞাসার কাব্য'-এ উন্নীত করেছিলেন। তাঁর গজলে প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমের পাশাপাশি আছে দর্শন; বেদনা আছে, কিন্তু বেদনার পাশাপাশি আছে সংশয়; সৌন্দর্য আছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পাশাপাশি আছে সত্যের সন্ধান। গালিব গজলকে মানবজীবনের সমগ্রতার কাব্য করে তুলেছিলেন।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৭০)

এই উন্নীতকরণের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ:

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ □ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

এই শেরে গালিব মানবজীবনের একটি সাধারণ সত্যকে অসামান্য কাব্যিক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মানুষের আকাঙ্ক্ষা অসীম, কিন্তু পূরণ হয় সীমিত। এই সত্যটি কেবল প্রেমের ক্ষেত্রে সত্য নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য। ফলে শেরটি প্রেমের গন্ডি পেরিয়ে হয়ে উঠেছে জীবন-জিজ্ঞাসার কাব্য।

ভাষার নির্মাণ ও ভাঙন

ফার্সি মিশ্রিত জটিল উর্দু

গালিবের কাব্যভাষা ছিল অত্যন্ত জটিল ও ফার্সি-মিশ্রিত। তিনি যে উর্দু ভাষায় লিখতেন, তা ছিল সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা থেকে অনেক দূরে শব্দভাণ্ডার ছিল ফার্সি ও আরবি শব্দে ভরা, বাক্যগঠন ছিল জটিল, এবং অলংকারের ব্যবহার ছিল এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা বোঝা কঠিন ছিল। এই কারণেই গালিবের সমসাময়িক অনেকেই তাঁর কবিতাকে 'দুর্বোধ্য' বলে সমালোচনা করতেন।

কিন্তু গালিব এই দুর্বোধ্যতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কবিতা সবার জন্য নয় কবিতা সেই সব পাঠকের জন্য, যাঁরা কাব্যের গভীরে ডুব দিতে প্রস্তুত। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি দোকানদার নই যে, ক্রেতার পছন্দ বুঝে মাল তৈরি করব। আমি কবি, আমি যা লিখি, তা আমার আত্মার প্রকাশ। যে বুঝবে, সে বুঝবে; যে বুঝবে না, সে না বুঝুক আমার কিছু যায় আসে না।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৫৫)

নারঙ গালিবের ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের ভাষা ছিল একই সঙ্গে নির্মাণ ও ভাঙনের ভাষা। তিনি উর্দু ভাষার সনাতন কাঠামোর মধ্যে ফার্সি ভাষার জটিলতা নিয়ে এসে এক নতুন ভাষা নির্মাণ করছিলেন, আর একই সঙ্গে উর্দু গজলের সনাতন ভাষাকে ভেঙেও ফেলছিলেন। এই নির্মাণ ও ভাঙনের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলেছিল, এবং তার ফলেই জন্ম নিয়েছিল গালিবের অনন্য কাব্যভাষা।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৪০)

সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে কিন্তু কেন?

গালিবের সমসাময়িক মুশায়রাগুলিতে প্রায়ই অভিযোগ উঠত, তাঁর কবিতা বোঝা যায় না। জওক, যিনি ছিলেন গালিবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রায়ই গালিবের দুর্বোধ্যতার সমালোচনা করতেন। কথিত আছে, একবার এক মুশায়রায় গালিবের একটি গজল শুনে জওক বলেছিলেন:

"মির্জা সাহেব, আপনি কি আমাদের সঙ্গো কথা বলছেন, নাকি নিজের সঙ্গো?" এই কথার উত্তরে গালিব নাকি বলেছিলেন: "আমি নিজের সঙ্গো কথা বলি, কারণ নিজের সঙ্গোই আমার সবচেয়ে ভালো বোঝাপড়া হয়।"

কিন্তু কেন গালিব এত দুর্বোধ্য হতে চাইলেন? এর পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, দার্শনিক গভীরতা প্রকাশের প্রয়োজন। গালিব যে সব দার্শনিক ও অস্তিত্ববাদী ভাবনা প্রকাশ করতে চাইতেন, তা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। জটিল ভাবনার জন্য জটিল ভাষাই প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষার কৌশল। গালিব এমন এক সমাজে বাস করতেন, যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রবল এবং মুক্তচিন্তা সন্দেহের চোখে দেখা হতো। দুর্বোধ্য ভাষার আড়ালে গালিব নিজের বিপ্লবী চিন্তাগুলিকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন।

তৃতীয়ত, সাহিত্যিক অভিজাত্যবোধ। গালিব বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য সবার জন্য নয় তা কেবল তারাই উপভোগ করতে পারে, যাঁরা যথেষ্ট জ্ঞানী ও রুচিশীল। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে জটিল ভাষা ব্যবহার করতেন, যাতে তাঁর কাব্য কেবলমাত্র নির্বাচিত পাঠকেরাই পড়তে পারে। চতুর্থত, ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ। গালিব কেবল কবি ছিলেন না, ছিলেন ভাষাবিদও। তিনি ভাষার গঠন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসতেন নতুন শব্দ তৈরি করা, পুরনো শব্দের নতুন অর্থ সৃষ্টি করা, ব্যাকরণকে বাঁকানো এসব ছিল তাঁর প্রিয় কাজ।

রূপকের নতুন দিগন্ত উন্মোচন

গালিবের জটিল ভাষার সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল রূপকের নতুন দিগন্ত উন্মোচন। তিনি সনাতন রূপকগুলিকে ভেঙে নতুন রূপক নির্মাণ করতেন, আবার কখনো সম্পূর্ণ নতুন রূপকেরও সৃষ্টি করতেন। এই রূপকগুলি এতটাই মৌলিক ও গভীর যে, তা উর্দু গজলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিল।

গালিবের রূপক-ব্যবহারের একটি উদাহরণ:

درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা
হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

(ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।)

এখানে 'সীনে মে সুরাখ' (বুকে গর্ত) একটি নতুন ধরনের রূপক প্রচলিত রূপক হতো 'দিল মে জখম' (হৃদয়ে ক্ষত) বা 'দিল টুটা' (ভাঙা হৃদয়)। কিন্তু গালিব আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, ব্যথা এতটাই যে, বুকে এখন গর্ত হয়ে গেছে। আর তারপরেই ইহাম "ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি" (লুকোই যে এখনো হৃদয় আছে)। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে হৃদয় আর নেই, সব তো ফাঁপা গর্ত কিন্তু মানুষকে বলা হচ্ছে, হৃদয় এখনো আছে। এই রূপকের বহুস্তরীয়তা গালিবেরই নিজস্ব।

আরেকটি উদাহরণ:

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہوتے تک
کو□ جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک

আহ কো চাহিয়ে ইক উমর অসর হোতে তক
কৌন জিতা হ্যায় তেরি জুল্ফ কে সর হোতে তক

(এক দীর্ঘ জীবন চাই একটি দীর্ঘশ্বাসের ফল ফলতে। কে বাঁচে ততদিন, যতদিনে তোর চুলের জট খোলে।)

এই শেরে দুটি রূপক একই সঙ্গো কাজ করছে 'আহ' (দীর্ঘশ্বাস) এবং 'জুলফ' (চুল)। 'আহ'-এর ফল ফলতে এক জীবন চাই এটি প্রেমের বেদনার প্রচলিত রূপককেই নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া। আর 'জুলফ কে সর হোতে তক' (চুলের জট খোলা পর্যন্ত) এটি প্রেমাস্পদের চুলের রূপক, যা সনাতন, কিন্তু গালিব একে ব্যবহার করছেন এক নতুন ভাবে: 'জুলফ কে সর হোতে তক' অর্থাৎ চুলের জট খোলা পর্যন্ত কে বাঁচে? এই প্রশ্নের মধ্যে যে হতাশা, যে নৈরাশ্য, তা সনাতন রূপককে ভেঙে নতুন অর্থ সৃষ্টি করছে।

ফার্সি-উর্দু মিশ্রণের কৌশল

গালিবের কাব্যভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ফার্সি ও উর্দুর এক অনন্য মিশ্রণ। তিনি কখনো ফার্সি শব্দ ও ব্যাকরণকে উর্দুর মধ্যে নিয়ে আসতেন, কখনো উর্দুর কথ্যরীতিকে ফার্সির অভিজাত্যে মুড়ে দিতেন। এই মিশ্রণের ফলে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছিল একই সঙ্গে দুর্বোধ্য ও আকর্ষণীয়।

রাসেল লিখেছেন: "গালিবের ভাষায় ফার্সি শব্দ ও ব্যাকরণের ব্যবহার এতটাই বেশি যে, অনেক সময় মনে হয় তিনি ফার্সি ভাষাতেই লিখছেন, কেবল শব্দগুলি উর্দুর। কিন্তু এই ফার্সি-প্রভাবই তাঁর ভাষাকে দিয়েছিল এক অসাধারণ শক্তি ও সৌন্দর্য।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৫৮)

গালিবের ফার্সি-উর্দু মিশ্রণের একটি উদাহরণ:

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

এখানে 'মুসাহিব' (সঙ্গী, সমাজের অংশ), 'আয়না-এ-খুদ-বীন' (আত্মদর্শনের আয়না) এই শব্দগুলি সম্পূর্ণ ফার্সি। কিন্তু 'দেখ', 'বোল' এই শব্দগুলি উর্দু/হিন্দি। এই মিশ্রণে গালিব একই সঙ্গে অভিজাত্য ও সাধারণতাকে এক সূত্রে গেঁথেছেন।

ভাষার ভাঙন: সনাতন কাঠামোর ধ্বংস

গালিব শুধু ভাষার নির্মাণই করেননি, বরং সনাতন কাব্যভাষার কাঠামো ভেঙেও দিয়েছিলেন। তিনি উর্দু গজলের প্রচলিত ছন্দ, অলংকার, রূপক ও প্রকাশভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করতেন এবং প্রয়োজনে ভেঙে ফেলতেন। এই ভাঙনের মধ্য দিয়েই তিনি নতুন কাব্যভাষার জন্ম দিয়েছিলেন।

আজমি লিখেছেন: "গালিবের ভাষার ভাঙন ছিল এক সৃষ্টিশীল ধ্বংস। তিনি যেমন পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করেন স্থপতি, তেমনই তিনি উর্দু গজলের পুরনো ভাষাকে ভেঙে নতুন ভাষা নির্মাণ করছিলেন। এই ভাঙনের কারণেই অনেক সমসাময়িক কবি ও পাঠক গালিবকে 'উর্দু ভাষার ধ্বংসকারী' বলে অভিযোগ করতেন। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে, গালিব ধ্বংস নয়, নির্মাণই করেছিলেন এক নতুন, শক্তিশালী, দার্শনিক কাব্যভাষার নির্মাণ।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৭৫)

দিওয়ান-এ-গালিব

দিওয়ানের একাধিক সংস্করণ ও পরিমার্জনের ইতিহাস

গালিবের উর্দু দিওয়ান (কাব্যসংকলন) প্রকাশনার ইতিহাসটি অত্যন্ত জটিল ও কৌতূহলোদ্দীপক। গালিব নিজে জীবদ্দশায় কয়েকবার নিজের দিওয়ান সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছিলেন, এবং প্রতিবারই তিনি পুরনো অনেক শের বাদ দিয়ে নতুন শের যোগ করেছিলেন, এমনকি পুরনো শেরগুলির শব্দ ও বাক্যও পরিবর্তন করেছিলেন। ফলে গালিবের দিওয়ানের একাধিক সংস্করণ আছে, এবং এই সংস্করণগুলির মধ্যে পার্থক্য এতটাই যে, কোন সংস্করণটি 'প্রকৃত' দিওয়ান, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪১ সালে, যখন গালিবের বয়স প্রায় ৪৪ বছর। এই সংস্করণে গজলের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু গালিব এই সংস্করণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি পরবর্তী বছরগুলিতে দিওয়ান থেকে অনেক শের বাদ দেন এবং নতুন শের যোগ করেন। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে গজলের সংখ্যা অনেক কমে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণেও একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

রাসেল লিখেছেন: "গালিবের দিওয়ানের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়, তিনি নিজের কাব্যের প্রতি কতটা কঠোর সমালোচক ছিলেন। যে শেরগুলি আজ আমরা গালিবের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করি, সেগুলির অনেকগুলিই গালিব নিজে দিওয়ান থেকে বাদ দিয়েছিলেন। পরে সম্পাদকেরা সেই বাদ দেওয়া শেরগুলিকে আবার দিওয়ানে ফিরিয়ে এনেছেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৬০)

কেন তিনি বহু জনপ্রিয় শের বাদ দিয়ে দিওয়ান সংকলন করেছিলেন?

এটি গালিব-গবেষণার অন্যতম কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। কেন গালিব, যিনি কিনা খ্যাতি ও স্বীকৃতির জন্য আকুল ছিলেন, তিনি নিজেরই বহু জনপ্রিয় শের দিওয়ান থেকে বাদ দিলেন? এর পেছনে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ আছে।

প্রথমত, সাহিত্যিক মানদণ্ডের কঠোরতা। গালিব নিজের কাব্যের ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন। যে শেরগুলি তিনি সাহিত্যিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বলে মনে করতেন না, সেগুলি তিনি বাদ দিতেন তা সে যতই জনপ্রিয় হোক না কেন। গালিবের কাছে জনপ্রিয়তা বড় কথা ছিল না; সাহিত্যিক উৎকর্ষই ছিল বড় কথা।

দ্বিতীয়ত, ফার্সি কাব্যের আদর্শের প্রভাব। গালিব ফার্সি কাব্যের যে উচ্চমানদণ্ডে বিশ্বাস করতেন, সেই মানদণ্ডে উর্দু গজলের অনেক কিছুই বর্জনীয় বলে মনে হতো। বিশেষ করে, যে শেরগুলি খুব সরল, খুব আবেগি, বা খুব ইন্দ্রিয়সংবেদী সেগুলি গালিবের পরিণত রুচিতে নিকৃষ্ট বলে মনে হতো।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত পছন্দের পরিবর্তন। মানুষ হিসেবে গালিবের রুচি ও পছন্দ সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল। যৌবনে যে সব শের তিনি ভালোবেসে লিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেগুলিকে অপরিণত মনে হতে পারে। ফলে তিনি সেগুলি বাদ দিয়ে নতুন, আরও পরিণত শের দিওয়ানে স্থান দিতেন।

চতুর্থত, দার্শনিক গাম্ভীর্যের প্রতি আকর্ষণ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গালিবের দার্শনিক গাম্ভীর্যের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল। যে শেরগুলি কেবল প্রেম বা সৌন্দর্যের বর্ণনা, সেগুলি তিনি বাদ দিয়ে এমন শের রাখতে চাইতেন, যাতে দার্শনিক গভীরতা আছে।

নারঙ লিখেছেন: "গালিবের দিওয়ান পরিমার্জনের ইতিহাস আসলে তাঁর মানসিক ও সাহিত্যিক বিকাশের ইতিহাস। তিনি ক্রমশ সরলতা থেকে জটিলতার দিকে, আবেগ থেকে দর্শনের দিকে, জনপ্রিয়তা থেকে উৎকর্ষের দিকে এগিয়েছিলেন। দিওয়ান থেকে জনপ্রিয় শের বাদ দেওয়া এই অগ্রগতিরই প্রতিফলন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৪৫)

দিওয়ান থেকে বাদ দেওয়া কিছু বিখ্যাত শের

গালিব নিজে দিওয়ান থেকে যেসব শের বাদ দিয়েছিলেন, পরে সম্পাদকেরা সেগুলির অনেকগুলিকেই আবার দিওয়ানে ফিরিয়ে এনেছেন, কারণ সম্পাদকেরা মনে করতেন, এই শেরগুলি গালিবের প্রতিভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনই কয়েকটি বিখ্যাত শের:

دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آ□ر اس درد کی دوا کیا ہے

দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়?
আখির ইস দর্দ কী দাওয়া ক্যা হ্যায়?

(হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এই ব্যথার ঔষধ কী?)

এই অত্যন্ত জনপ্রিয় গজলটি গালিব তাঁর দিওয়ানের পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে বাদ দিয়েছিলেন। কেন? সম্ভবত এই কারণে যে, এটি খুব সরল, খুব আবেগি, এবং গালিবের পরিণত রুচি অনুযায়ী এতে দার্শনিক গভীরতা কম। কিন্তু পাঠকেরা এই গজলটি এত ভালোবাসতেন যে, সম্পাদকেরা বাধ্য হয়ে একে ফিরিয়ে এনেছেন।

আরেকটি উদাহরণ:

ہم کو ا□ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এই শেরটিও গালিব দিওয়ান থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সম্ভবত কারণ, এটি খুব সরাসরি, খুব কম ইহাম আছে, এবং গালিবের পরিণত রুচিতে এটি 'সাধারণ প্রেমের কবিতা' বলেই মনে হয়েছিল।

দিওয়ানের চূড়ান্ত রূপ ও সম্পাদকীয় ভূমিকা

গালিবের মৃত্যুর পর তাঁর উর্দু দিওয়ানের যে সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই সম্পাদকদের দ্বারা সংকলিত, যাঁরা গালিবের বাদ দেওয়া শেরগুলিকে আবার যুক্ত করেছেন। ফলে বর্তমানে গালিবের যে 'প্রামাণ্য' দিওয়ান আমরা পড়ি, তা আসলে সম্পাদকদের নির্মিত, সম্পূর্ণ গালিবের নিজের করা সংকলন নয়।

এই সম্পাদকীয় ভূমিকা নিয়ে গালিব-গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন, সম্পাদকেরা সঠিকই করেছেন গালিবের বাদ দেওয়া শেরগুলি তাঁর প্রতিভার অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং সেগুলি ছাড়া গালিবকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। অন্য পক্ষ বলেন, সম্পাদকেরা গালিবের ইচ্ছার অসম্মান করেছেন গালিব যে শেরগুলি বাদ দিয়েছেন, সেগুলি রাখা উচিত হয়নি, কারণ গালিবের নিজের বিচার-বুদ্ধিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

রাসেল এই বিতর্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "একদিকে, গালিবের নিজের সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তকে আমরা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারি না তিনি যা বাদ দিয়েছেন, তা বাদ দেওয়ার পেছনে অবশ্যই কারণ ছিল। অন্যদিকে, গালিব যে শেরগুলি বাদ দিয়েছিলেন, সেগুলি তাঁর কাব্যের ইতিহাসের অংশ, এবং সেই ইতিহাস থেকে সেগুলিকে মুছে ফেলা ঠিক নয়। বরং ভালো হয়, যদি আমরা গালিবের দিওয়ানের একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করি একটি গালিবের নিজের সম্পাদিত, আরেকটি সম্পাদকদের দ্বারা সংকলিত এবং পাঠককে দুইটিরই সুযোগ দিই।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৬৫)

বিপ্লবের স্থায়ী প্রভাব

গালিবের উর্দু গজল যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী। গালিবের পরে উর্দু গজল আর আগের মতো থাকতে পারেনি। যে সব কবি গালিবের পরে এসেছেন মোমিন, দাগ, আমীর মিনাই, হাসরাত মোহানি, আল্লামা ইকবাল, ফৈজ আহমদ ফৈজ তাঁরা প্রত্যেকেই গালিবের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কেউ গালিবকে অনুসরণ করেছেন, কেউ গালিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন কিন্তু কেউই গালিবকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিব উর্দু গজলের ইতিহাসে একমাত্র কবি, যাঁর আগেও রেখা টানা যায়, পরেও রেখা টানা যায়। গালিবের আগের উর্দু গজল এক, গালিবের পরের উর্দু গজল আরেক। এই পরিবর্তনের একক কৃতিত্ব গালিবের।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৫০)

এবং এই পরিবর্তনের মূলে ছিল সেই গুণগুলি, যাকে আমরা 'গালিবিয়াত' বলছি ইহামগোই, তাজাহগোই, মাজমুন আফিরিনি, বিমূর্ততা, দর্শন, আত্মসচেতনতা। এই গুণগুলি মিলেই গালিবের কাব্যকে দিয়েছিল এক অনন্য উচ্চতা, যা আজও অতিক্রম করা যায়নি।

নির্বাচিত শের: উর্দু গজলে বিপ্লবের অনুষঙ্গো

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ □ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے□ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের উর্দু গজলের বিপ্লবাত্মক চরিত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। গালিব কীভাবে তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের থেকে আলাদা, কীভাবে তিনি ইহামগোই, তাজাহগোই ও মাজমুন আফিরিনির মাধ্যমে উর্দু গজলকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং কীভাবে তাঁর দিওয়ানের ইতিহাসই তাঁর সাহিত্যিক কঠোরতার প্রমাণ এসব বিষয় আমরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছি।

এখন আপনি যদি নিজের পছন্দের কোনো গালিবের গজল পড়েন, তাহলে নিশ্চয়ই তাতে 'গালিবিয়াত'-এর উপাদানগুলি খুঁজে পাবেন কোথাও ইহাম, কোথাও তাজাহগোই, কোথাও মাজমুন আফিরিনি। এই উপাদানগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন, এবং দেখুন, কীভাবে গালিব একটি সাধারণ অনুভূতিকে এক দার্শনিক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের গদ্য ও চিঠিপত্রের জগতে যে জগতে তিনি উর্দু গদ্যকেও এক বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন, এবং যে চিঠিগুলি আজও উর্দু গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়।

অধ্যায় ১২: গদ্যের পথিকৃৎ

যখন কলম কথা বলে ওঠে

গালিবকে আমরা এতক্ষণ চিনেছি প্রধানত কবি হিসেবে গজলের জাদুকর, ফার্সি কাসিদার কারিগর, উর্দু শায়েরির বিপ্লবী। কিন্তু গালিবের প্রতিভার আরেকটি দিক আছে, যা হয়তো তাঁর কাব্যের চেয়েও বেশি মৌলিক, বেশি জীবনঘনিষ্ঠ এবং আধুনিক। এই দিকটি হল তাঁর গদ্য বিশেষ করে তাঁর চিঠিগুলি, যা উর্দু গদ্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক অধ্যায় সংযোজন করেছিল। গালিবের আগে উর্দু গদ্য ছিল প্রধানত ধর্মীয়, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ের বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত অনুভূতি, দৈনন্দিন জীবনের টুকরো কথা, বন্ধুত্বের আন্তরিকতা, হাসিঠাট্টা এসব উর্দু গদ্যে তেমনভাবে আসেনি। গালিব এসে সেই গদ্যকে দিলেন প্রাণ, দিলেন ভাষা, দিলেন আত্মার স্পন্দন। যেমনটি বলেছেন রালফ রাসেল: "গালিবের পত্রাবলি কেবল উর্দু গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের পত্রসাহিত্যের অন্যতম অমূল্য রত্ন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৭০)

গালিবের গদ্যের বিশেষত্ব কী? কেন তাঁর চিঠিগুলি উর্দু সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে, গালিবের আগে উর্দু গদ্যের অবস্থা কী ছিল। তারপর দেখতে হবে, গালিব কীভাবে ফার্সি গদ্যের অভিজাত্যকে পরিত্যাগ করে উর্দুকে বেছে নিলেন ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসেবে। তারপর আমরা প্রবেশ করব গালিবের চিঠিপত্রের জগতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, ভাষার প্রাণবন্ততা, এবং সেই অনন্য হাস্যরস ও বুদ্ধিদীপ্তির ভুবনে, যা তাঁর চিঠিগুলিকে কেবল তথ্যের বাহন নয়, বরং এক একটি শিল্পকর্মে পরিণত করেছিল।

উর্দু গদ্যের জন্ম

ফার্সি গদ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য

গালিবের সময়ে, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে, ভারতীয় উপমহাদেশের বিদ্বৎসমাজে গদ্যের ভাষা ছিল একটিই ফার্সি। মুঘল দরবারের সরকারি কাজকর্ম, রাজকীয় ফরমান, প্রশাসনিক নথিপত্র, ইতিহাস গ্রন্থ, ধর্মীয় পুস্তক সবই ফার্সিতে লেখা হতো। উর্দু তখনো ছিল প্রধানত কাব্যের ভাষা, বিশেষ করে গজল, মসনবি ও কাসিদার ভাষা। গদ্যে উর্দুর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ, সরল গল্প বা প্রেমকাহিনির মধ্যে আবদ্ধ। যে কেউ গদ্যশিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেতে চাইলে ফার্সিতেই লিখতে হতো।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ লিখেছেন: "উর্দু গদ্যের ইতিহাসে গালিবের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত সময়টিকে 'প্রস্তুতি পর্ব' বলা যায়। এ সময় কিছু ধর্মীয় পুস্তক, দাস্তান (কাহিনি) এবং প্রেমাখ্যান উর্দু গদ্যে রচিত হলেও, তা ছিল ফার্সি গদ্যের অনুকরণমাত্র। উর্দু গদ্যের নিজস্ব কোনো চরিত্র, নিজস্ব সুর, নিজস্ব ছন্দ তখনো গড়ে ওঠেনি।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৬০)

খলিলুর রহমান আজমিও একই সুরে বলেছেন: "উর্দু গদ্য ছিল ফার্সি গদ্যের ছায়া। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখতে গেলে লেখক ফার্সির শরণাপন্ন হতেন। উর্দু গদ্যকে তারা মনে করতেন সাধারণ মানুষের ভাষা, যা উচ্চ সাহিত্যের যোগ্য নয়। এই ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন গালিব।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৮০)

এই প্রেক্ষাপটে গালিবের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ফার্সির পরিবর্তে উর্দু ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত ছিল এক বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। এটি কেবল একটি ভাষাগত পছন্দ ছিল না, বরং ছিল এক সাংস্কৃতিক অবস্থান, এক গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ। গালিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্যক্তিগত অনুভূতি, দৈনন্দিন জীবনের কথা, বন্ধুর সঙ্গে আন্তরিক আলাপ এসব প্রকাশের জন্য ফার্সি ভাষা অত্যন্ত কৃত্রিম ও দূরবর্তী। এসব প্রকাশের জন্য প্রয়োজন এমন একটি ভাষা, যা সহজ, প্রাণবন্ত, এবং জীবনের কাছাকাছি। সেই ভাষা ছিল উর্দু।

গালিবের আগে উর্দু গদ্যের অবস্থা

গালিব যখন উর্দুতে চিঠি লেখা শুরু করেন, তখন উর্দু গদ্য বলতে যা বোঝানো হতো, তা ছিল ফার্সি শব্দ ও ব্যাকরণে বোঝাই এক কৃত্রিম গদ্যশৈলী। তখনকার উর্দু গদ্যের নমুনা দেখলে বোঝা যায়, লেখকেরা কথা বলছেন না, বরং 'সাহিত্য রচনা' করছেন প্রতিটি বাক্যে অলংকার, প্রতিটি বর্ণনায় ফার্সি শব্দের আড়ম্বর। এই গদ্য ছিল কৃত্রিম, দুর্বোধ্য এবং জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন।

আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "গালিবের আগে উর্দু গদ্যের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। যে কেউ গদ্য লিখতে গেলে ফার্সি ভাষার অন্ধ অনুকরণ করতেন। ফলে গদ্য হয়ে উঠত কৃত্রিম শব্দাড়ম্বরে ভরা, যেখানে লেখকের নিজস্ব সুর বা ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না।" (হালী, ১৮৯৭: ১৫০)

গালিব এই অবস্থা দেখে গভীরভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, গদ্য হতে হবে জীবনের মতোই স্বাভাবিক, সহজ, প্রাণবন্ত। তিনি লিখেছিলেন: "লিখতে বসে যদি ভাবি যে সাহিত্য রচনা করছি, তাহলে আমার কলম থেমে যায়। আমি লিখি যেন কথা বলছি। যে ভাবে বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করি, সেই ভাবেই লিখি। সাহিত্যের ভারে আমার গদ্যকে বোঝাই করতে চাই না।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৭২)

গালিবের বিপ্লব: ব্যক্তিগত পত্রালাপে উর্দুর প্রতিষ্ঠা

গালিবের সবচেয়ে বড় অবদান হল, তিনি ব্যক্তিগত পত্রালাপের মাধ্যম হিসেবে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে, যে কেউ কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা বন্ধুকে চিঠি লিখতে গেলে ফার্সিতেই লিখতেন। ফার্সি চিঠির একটা নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল শুরুতে দীর্ঘ প্রশংসা, তারপর মূল বক্তব্য, শেষে দীর্ঘ সালাম-দোয়া। এই কাঠামো এতটাই কঠিন ছিল যে, চিঠি লেখা হয়ে উঠত এক রীতিমতো সাহিত্য রচনা, যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যেত।

গালিব এই কাঠামো ভেঙে দিলেন। তিনি চিঠি লিখতে শুরু করলেন উর্দুতে, এবং সেই চিঠির ভাষা ছিল একেবারে অন্য রকম সহজ, সাবলীল, কথোপকথনের মতো। তিনি চিঠির শুরুতে কোনো দীর্ঘ প্রশংসা করতেন না, সরাসরি কথা বলতে শুরু করতেন। কখনো শুরু করতেন 'মিঁয়া' বা 'ইয়ার' সম্বোধনে, কখনো সরাসরি বলে দিতেন 'আমি ভালো আছি' বা 'আমি ভালো নেই'। চিঠির শেষেও কোনো দীর্ঘ সালাম-দোয়া না লিখে হঠাৎ থেমে যেতেন।

রাসেল এই বিপ্লবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: "গালিব যখন উর্দুতে চিঠি লেখা শুরু করেন, তখন তিনি একই সঙ্গে উর্দু গদ্যের জন্ম দিচ্ছিলেন এবং ফার্সি গদ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটাচ্ছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তিনি এটা কোনো পরিকল্পনা করে করেননি, বরং স্বাভাবিক অভ্যাসবশতই করেছিলেন। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন, সেভাবেই লিখতে শুরু করেছিলেন। আর এই স্বাভাবিকতাই ছিল তাঁর বিপ্লবের মূল শক্তি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৭৫)

খলিলুর রহমান আজমি যোগ করেছেন: "গালিবের পত্রাবলি উর্দু গদ্যের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। এর আগে উর্দু গদ্য ছিল ফার্সির দাসী; গালিবের হাতে তা হয়ে উঠল স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী। তিনি প্রমাণ করলেন, উর্দু গদ্য শুধু কাব্যের চেয়ে কম নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী হতে পারে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৮২)

ফার্সি ও উর্দু গদ্যের মিশ্রণ: গালিবের স্বতন্ত্র শৈলী

গালিব সম্পূর্ণভাবে ফার্সি বর্জন করেননি; বরং ফার্সি ও উর্দুর এক অনন্য মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তাঁর গদ্যে। তিনি ফার্সি ভাষার যে শক্তি তার সূক্ষ্মতা, তার অলংকার, তার ছন্দ তা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যাতে গদ্যটি কৃত্রিম হয়ে না পড়ে, বরং আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে তাঁর গদ্যের ভাষা ছিল একই সঙ্গে সহজ ও পরিশীলিত, চলিত ও মার্জিত, কথ্য ও সাহিত্যিক।

নারঙ এই মিশ্রণ সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের গদ্যে ফার্সি ও উর্দুর যে মিশ্রণ ঘটেছে, তা এমন স্বাভাবিক যে, বোঝাই যায় না কোথায় ফার্সির শেষ আর উর্দুর শুরু। তিনি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করলেও, সেগুলিকে এমনভাবে বাক্যে বসাতেন যে, তা উর্দু বাক্যেরই অঙ্গ হয়ে যেত। এই কারণেই তাঁর গদ্য একই সঙ্গে অভিজাত ও সহজবোধ্য।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৬৫)

গালিব নিজে এই মিশ্রণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি যখন লিখি, ভাবি না ফার্সি লিখছি না উর্দু। যা আমার মনে আসে, তাই লিখি। কখনো ফার্সি কথা এসে যায়, কখনো উর্দু। কিন্তু আমি কোনোদিন ফার্সি লেখার জন্য ফার্সি ব্যবহার করিনি, উর্দু লেখার জন্য উর্দু ব্যবহার করিনি। ভাষা আমার কাছে জামার মতো যেটা আরামদায়ক, সেটাই পরি।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৩৮৫)

খতুত-এ-গালিব (গালিবের চিঠি)

চিঠিপত্রের সংগ্রহ ও পরিধি

গালিবের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে তাঁর চিঠিগুলি বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিগুলির সংখ্যা কয়েকশো বিভিন্ন বন্ধু, শাগরেদ, পৃষ্ঠপোষক, আত্মীয়স্বজন ও সমসাময়িক ব্যক্তিদের উদ্দেশে লেখা। চিঠিগুলির সময়কাল বিস্তৃত ১৮৪০-এর দশক থেকে ১৮৬৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। এই প্রায় ত্রিশ বছরের সময়কালে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা গালিবের জীবনের নানা দিক, সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র, এবং সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি পাই।

আলতাফ হোসেন হালী, যিনি গালিবের প্রথম জীবনীকার এবং নিজেও গালিবের চিঠির প্রাপক ছিলেন, লিখেছেন: "গালিবের চিঠিগুলি কেবল চিঠি নয়, বরং এক একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। প্রতিটি চিঠিতে গালিব নিজের জীবনের কোনো না কোনো দিক, কোনো না কোনো অনুভূতি, কোনো না কোনো চিন্তা প্রকাশ করেছেন। সব চিঠি একসঙ্গে পড়লে গালিবের সমগ্র জীবন ও ব্যক্তিত্ব যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।" (হালী, ১৮৯৭: ১৫৫)

চিঠিগুলির প্রাপকদের তালিকা দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। এঁদের মধ্যে আছেন নবাব ইউসুফ আলী খান (রামপুরের নবাব), মির্জা তফতা (ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শাগরেদ), হাকিম মোমিন খান (বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী কবি), নবাব মুস্তফা খান, মির্জা কাদের বখশ, এবং আরও অনেকে। প্রতিটি প্রাপকের জন্য গালিবের ভাষা ও সুর কিছুটা আলাদা রামপুরের নবাবকে লেখা চিঠিতে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সুর বেশি, মির্জা তফতাকে লেখা চিঠিতে বন্ধুত্বের উষ্ণতা ও আন্তরিকতা, আবার কারও কারও ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ ও রসিকতার সুর প্রবল।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য: জীবন যেখানে উন্মুক্ত পৃষ্ঠা

গালিবের চিঠিগুলির বিষয়বস্তু এত বৈচিত্র্যময় যে, তা পড়লে মনে হয়, জীবন যেন এখানে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে আছে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন নিজের শরীরের অসুস্থতার কথা, পরের চিঠিতে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করছেন, আরেক চিঠিতে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা করছেন, আবার কোথাও হাসিঠাট্টা করছেন আপনমনে। এই বৈচিত্র্যই গালিবের চিঠিগুলিকে এত প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে তুলেছে।

দৈনন্দিন জীবন: গালিবের চিঠিগুলির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা কী খেলেন, কী পরলেন, কার সঙ্গে দেখা করলেন, বাজার থেকে কী কিনলেন, চাকর-বাকরদের কী অবস্থা। এই বর্ণনাগুলি পড়লে মনে হয়, যেন আমরা গালিবের বল্লিমারানের হাভেলিতে বসে তাঁর মুখেই গল্প শুনছি। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি দেখে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তারপর এক কাপ চা খেলাম, মনটা একটু ভালো হলো। এখন বসে আছি, কী করব ভাবছি। বাইরে যাওয়া যাবে না, তাই তোমাকে চিঠি লিখছি।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৮০)

এই সাধারণ কথাগুলির মধ্যে যে সৌন্দর্য, যে আন্তরিকতা, তা-ই গালিবের চিঠির প্রাণ। তিনি পাঠককে তাঁর জীবনের একান্ত নিভৃত মুহূর্তগুলিতে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন, যেমন একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দেন।

হাসিঠাট্টা: গালিবের চিঠিগুলির আরেকটি প্রধান বিষয় হল হাসিঠাট্টা নিজেকে নিয়ে, বন্ধুদের নিয়ে, সমাজকে নিয়ে, এমনকি খুদাকেও নিয়ে। এই হাসিঠাট্টা কখনো সরল রসিকতা, কখনো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, কখনো বা আত্ম-বিদ্রূপ। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি এত গরিব যে, যদি কোনোদিন চোর আসে আমার বাড়িতে, তাহলে চোরই আমার দয়া করে কিছু রেখে যাবে।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৬০)

সাহিত্যের খবর: গালিবের চিঠিগুলিতে সমসাময়িক সাহিত্যজগতের খবর, মুশায়রার বিবরণ, কবিদের প্রতিযোগিতা, নিজের রচনার প্রতিক্রিয়া এসবের বিবরণ থাকে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "গতকাল এক মুশায়রায় গিয়েছিলাম। জওক সাহেব তাঁর নতুন গজল পড়লেন, সবাই 'ওয়াহ ওয়াহ' করল। আমি যখন আমার গজল পড়লাম, সবাই চুপ করে রইল। বুঝলাম, আমার গজল বুঝতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমার সময় কোথায় যে অপেক্ষা করব?" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৩৯০)

রাজনৈতিক মন্তব্য: গালিব সরাসরি রাজনৈতিক কবি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চিঠিগুলিতে সমসাময়িক রাজনীতি ও ইংরেজ শাসন নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আগে ও পরে লেখা চিঠিগুলিতে এই মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "ইংরেজরা আমাদের শাসন করে, এটা সত্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হল, আমরা শাসিত হতে রাজি আছি। এই রাজি থাকাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৮৫)

আত্ম-প্রচার ও আত্ম-করুণা: গালিবের চিঠিগুলির একটি পুনরাবৃত্ত বিষয় হল নিজের কাব্যপ্রতিভার ঘোষণা এবং নিজের দুর্ভাগ্যের বর্ণনা। তিনি প্রায়ই নিজের কবিতার প্রশংসা করতেন, কখনো কখনো এতটাই যে, পাঠকের কাছে তা দাম্ভিকতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি নিজের অর্থকষ্ট, সমাজের উপেক্ষা ও স্বীকৃতির অভাব নিয়ে যে আত্ম-করুণা প্রকাশ করতেন, তা ছিল মর্মস্পর্শী। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি এমন এক কবি, যাঁর কবিতা সবাই পড়ে, কিন্তু কেউ কেনে না। আমার গজল মুশায়রায় মুশায়রায় গীত হয়, কিন্তু আমার পেটের আগুন কেউ নেভাতে পারে না। আমি সম্মান পাই, কিন্তু সম্মান দিয়ে তো পেট ভরে না।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৪৭০)

চিঠির ভাষা: "আমি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখেছি"

গালিবের চিঠিগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাদের ভাষা। গালিব নিজে বলেছিলেন: "ম্যায়নে বাতচীত কা আন্দাজ মে লিখা হ্যায়" আমি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখেছি। এই একটি বাক্যই গালিবের সম্পূর্ণ গদ্যশৈলীর সারকথা। তিনি চিঠি লিখতেন যেন সামনাসামনি বসে কথা বলছেন। তাঁর চিঠির ভাষা ছিল ছোট ছোট বাক্যে তৈরি, সহজ শব্দে গঠিত, এবং এক ধরনের ছন্দময় গতিতে চলমান।

রাসেল এই ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের চিঠির ভাষা পড়লে মনে হয়, যেন তিনি পাঠকের পাশে বসে কথা বলছেন। কোনো প্রকার কৃত্রিমতা নেই, অলংকারের আড়ম্বর নেই। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার, এই সরল ভাষাই আবার এত সুন্দর যে, তা কবিতার মতোই সুরেলা। গালিব বুঝতে পেরেছিলেন, গদ্যের সৌন্দর্য ভাষার জটিলতায় নয়, বরং তার স্বাভাবিকতায়।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৯০)

গালিবের চিঠির ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, তাতে কথ্য উর্দুর প্রচুর ব্যবহার আছে। তিনি 'হ্যায়' (হয়েছে), 'কিয়া' (করেছে), 'লেগা' (লাগবে) এই ধরনের চলিত রূপ নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতেন। এমনকি কখনো কখনো হিন্দি বা আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহার করতেন, যদি মনে করতেন সেটাই বেশি উপযুক্ত। এই সাহসের কারণেই তাঁর গদ্য ছিল এত প্রাণবন্ত ও জীবন্ত।

আজমি লিখেছেন: "গালিবের চিঠির ভাষা ছিল উর্দু গদ্যের জন্য এক নতুন পথের সূচনা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, উর্দু কেবল কাব্যের ভাষা নয়, বরং গদ্যের ভাষা হিসেবেও সমান শক্তিশালী হতে পারে যদি তাকে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা যায়। গালিবের পরে উর্দু গদ্যের যে বিকাশ ঘটেছে, তার পুরো কৃতিত্ব গালিবেরই প্রাপ্য।" (আজমি, ১৯৬৯: ৩৯৫)

চিঠির গঠন ও ছন্দ

গালিবের চিঠিগুলি শুধু ভাষার জন্যই নয়, গঠন ও ছন্দের জন্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর চিঠির বাক্যগুলি সাধারণত ছোট, কিন্তু প্রতিটি বাক্যই যেন একটি সম্পূর্ণ চিন্তা বহন করে। বাক্যগুলির মধ্যে এক ধরনের সঙ্গীতিক ছন্দ আছে, যা পড়তে পড়তে পাঠককে তালে তালে এগিয়ে নিয়ে যায়। গালিব কখনো দীর্ঘ বর্ণনা দিতেন না; বরং কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ একটি দৃশ্য বা অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতেন।

উদাহরণ হিসেবে একটি চিঠির অংশ দেখা যাক: "বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ পরিষ্কার। তারা ফুটেছে। হাওয়া ঠান্ডা। মনটা কেমন যেন করছে। কী করব, ভাবছি। কবিতা লিখতে বসব, না ঘুমোতে যাব?" এই কয়েকটি ছোট্ট বাক্যের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণ মুহূর্তের ছবি আঁকা হয়েছে, তার তুলনা নেই।

নারঙ গালিবের চিঠির গঠন নিয়ে লিখেছেন: "গালিবের চিঠিগুলির প্রতিটি বাক্য যেন একটি করে শের। ছোট, কিন্তু গভীর। সরল, কিন্তু ব্যঞ্জনাময়। যে মানুষটি সারাজীবন গজল লিখেছেন, তিনি গদ্যও লিখেছেন গজলের ছন্দেই পার্থক্য কেবল এই যে, এখানে কাফিয়া-রদিফ নেই, অথচ ছন্দ আছে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৭৫)

নির্বাচিত চিঠির উদাহরণ ও বিশ্লেষণ

গালিবের চিঠিগুলির মধ্যে কিছু চিঠি বিশেষভাবে বিখ্যাত, যেগুলি তাঁর গদ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভাষার প্রাণবন্ততা, বিষয়ের বৈচিত্র্য, হাস্যরস, আত্ম-করুণা একসঙ্গে ধারণ করে আছে। সেরকমই একটি চিঠি, যা তিনি মির্জা তফতাকে লিখেছিলেন ১৮৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে। এই চিঠিতে গালিব নিজের অন্ধত্ব, শরীরের অবনতি ও নিঃসঙ্গতার কথা লিখেছেন, কিন্তু সেই বিষন্নতার মধ্যেও তাঁর চরিত্রগত রসিকতা উঁকি দিচ্ছে:

"মিঁয়া তফতা, চিঠি পেয়েছি, পড়তে পারিনি চোখ আর সাথ দেয় না। ছেলে দিয়ে পড়িয়ে শুনলাম। তুমি লিখেছ, 'আপনার শরীর কেমন আছে?' কী আর বলব। শরীর আর শরীর নেই, যেন এক ভাঙা ঘর, যে কোনোদিন ধসে পড়বে। পা চলতে চায় না, হাত কাঁপে, চোখ দেখে না, তবু মনটা এখনো জোয়ান। এই জোয়ান মনটাই সবচেয়ে বড় বিপদ সে চায়, আমি এখনো লিখি, এখনো মুশায়রায় যাই, এখনো ভালো খাই। অথচ শরীর বলে, 'বস, এবার বিশ্রাম করো।' এই দুইয়ের দ্বন্দ্বেই দিন কাটছে।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৬৫)

এই চিঠিটিতে আমরা দেখতে পাই, গালিব কীভাবে নিজের শারীরিক কষ্টের বর্ণনা দিচ্ছেন কিন্তু সেই বর্ণনায় কোথাও আত্মমমতা নেই, বরং এক ধরনের রসিক দূরত্ব আছে। 'ভাঙা ঘর'-এর রূপক, 'জোয়ান মন'-এর সঙ্গে 'বুড়ো শরীর'-এর দ্বন্দ্ব এসবই গালিবের চিঠির ভাষাকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

আরেকটি বিখ্যাত চিঠি, যা তিনি রামপুরের নবাবকে লিখেছিলেন পেনশন পাওয়ার পর: "হুজুর, আপনার দয়া আমার ওপর অঝোর ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। আমি কী বলব, কীভাবে ধন্যবাদ দেব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার রাজ্য সমৃদ্ধ হোক। কিন্তু হুজুর, একটি কথা বলি এই পেনশন পেতে পেতে আমার জীবনের সায়াহ্ন এসে গেছে। এখন এই টাকা দিয়ে আমি

কী করব, ভেবে পাই না। চোখ নেই, পড়তে পারি না। পা নেই, বেড়াতে পারি না। দাঁত নেই, খেতে পারি না। তাহলে টাকা দিয়ে কী করব? হয়তো কবরখানায় গিয়ে শুয়ে থাকার জন্য ভালো বালিশ কিনব।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৯৫)

এই চিঠিতে গালিব কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি আছে জীবনের পরিহাসের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জীবনের শেষে এসে টাকা পাওয়ার যে পরিহাস, তা তিনি সূক্ষ্ম রসিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 'ভালো বালিশ কিনব' এই বক্তব্যটি একই সঙ্গে হাস্যরস ও গভীর বেদনার মিশ্রণ, যা গালিবের চিঠির অন্যতম প্রধান সুর।

গদ্যে হাস্যরস ও বুদ্ধিদীপ্তি

নিজের দারিদ্র্য নিয়ে মশকরা

গালিবের চিঠিগুলির একটি পুনরাবৃত্ত বিষয় হল নিজের দারিদ্র্য নিয়ে মশকরা। তিনি এতটাই দরিদ্র ছিলেন যে, দারিদ্র্য তাঁর কাছে যেন এক স্থায়ী সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, এবং এই সঙ্গীকে নিয়ে তিনি অকাতরে রসিকতা করতেন। এই রসিকতার মধ্যে যে আত্ম-বিদ্রূপ ছিল, তা গালিবকে কেবল হাস্যরসিকই নয়, বরং এক দার্শনিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। যে মানুষ নিজের দুর্দশা নিয়ে হাসতে পারে, সে মানুষকে পৃথিবীর কোনো দুঃখ পরাভূত করতে পারে না।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার ঘরে ইঁদুরেরা এখন আর ভয় পায় না। কারণ তারা জানে, আমি তাদের মতোই গরিব আমি তাদের মারব না, বরং তাদের কাছ থেকে ধার চাইব।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৪০০) আরেক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমার পোশাক দেখলে লোকে মনে করে, আমি বুঝি ফকির। কিন্তু আমি ফকির নই, ফকিরের চেয়েও গরিব ফকিরের অন্তত একটি ঝুলি থাকে, আমার তাও নেই।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৭০)

এই ধরনের আত্ম-বিদ্রূপের মধ্যে যে সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, তা গালিবের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি দারিদ্র্যকে গোপন করতে চাননি, বরং তাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়ে তাকে রসিকতার বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। এতে করে দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে এক ধরনের বিজয় নিয়তির বিরুদ্ধে আত্মার বিজয়।

রাসেল লিখেছেন: "গালিবের আত্ম-বিদ্রূপ ছিল এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল। যে মানুষ সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছে, সে যদি নিজের দুর্দশা নিয়ে না হাসতে পারে, তাহলে তার পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। গালিব দারিদ্র্যকে নিয়ে হেসে তাকে জয় করেছিলেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪০০)

কৃপণ পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে ব্যঙ্গ

গালিবের চিঠিগুলির আরেকটি প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল কৃপণ পৃষ্ঠপোষকেরা, যাঁরা কবিদের আশ্বাস দিতেন কিন্তু বাস্তবে কিছুই দিতেন না। গালিব সারাজীবন এমন অসংখ্য পৃষ্ঠপোষকের মুখাপেক্ষী ছিলেন, এবং তাঁদের কৃপণতা নিয়ে তিনি অকাতরে ব্যঙ্গ করতেন। এই ব্যঙ্গ কখনো সরাসরি হতো, কখনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই তা ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও উপভোগ্য।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "অমুক নবাব সাহেব আমাকে বলেছিলেন, 'মির্জা, আপনি আমার দরবারে আসুন, আমি আপনাকে সোনায় মুড়ে দেব।' আমি গেলাম। তিনি আমাকে সোনায় মুড়ে দিলেন কথার সোনায়। বাস্তবে যা দিলেন, তা দিয়ে এক কাপ চা-ও কেনা যায় না।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৪৮০)

আরেক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমি যখন কোনো ধনী লোকের বাড়িতে যাই, তারা আমাকে খুব সম্মান করে, ভালো খেতে দেয়, কিন্তু যখন বিদায় নিই, কিছু দেয় না। আমি ভাবি, এই সম্মান আর ভালো খাবার যদি পেটে জমিয়ে রাখা যেত, তাহলে আমার আর কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু হজম হয়ে যায়, আর তখন আবার খিদে পায়। সম্মান দিয়ে খিদে মেটে না।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৪০৫)

এই ধরনের ব্যঙ্গের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ সামাজিক সমালোচনা লুকিয়ে আছে, তা সহজে চোখে পড়ে না, কারণ গালিবের রসিকতার আবরণে তা ঢাকা থাকে। কিন্তু আসলে তিনি অভিজাত সমাজের ভণ্ডামি, কৃপণতা ও কৃত্রিমতাকে চাবুকাঘাত করছিলেন নিজের অনন্য ভঙ্গিতে।

হাস্যরসের আড়ালে দর্শন

গালিবের গদ্যের হাস্যরস কখনোই কেবল হাসানোর জন্য নয়; বরং তার গভীরে লুকিয়ে থাকে এক দার্শনিক জীবনদৃষ্টি। যে রসিকতার পেছনে থাকে জীবনের গভীর উপলব্ধি, মৃত্যুর অনিবার্যতা, নিয়তির পরিহাস, মানুষের অসহায়তা সেই রসিকতাই হয়ে ওঠে মহৎ সাহিত্যের উপাদান। গালিবের চিঠিগুলির রসিকতা ঠিক সেই রকমই তা একই সঙ্গে হাসায় ও ভাবায়।

এক চিঠিতে তিনি মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছিলেন: "মৃত্যু নিয়ে আমি ভাবি না। কারণ, মৃত্যু যখন আসবে, তখন আমি থাকব না ভাবতে। আর যখন আমি আছি, তখন মৃত্যু নেই। তাহলে আমি কেন অকারণে মৃত্যু নিয়ে ভাবতে যাব? এই তর্কটা আমি এক ফকিরের কাছে শিখেছি, আর শিখে খুব আনন্দ পেয়েছি।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৪১০)

এই চিঠিতে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকুরাসের বিখ্যাত তর্কটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় "আমি যখন আছি, মৃত্যু নেই; যখন মৃত্যু আছে, আমি নেই। তাহলে মৃত্যুকে ভয় কিসের?" গালিব এই গভীর দার্শনিক তর্কটিকে নিজের মতো করে, একেবারে সহজ ভাষায়, রসিকতার ছলে বলে দিচ্ছেন। এটাই তাঁর গদ্যের সবচেয়ে বড় শক্তি জটিলকে সহজ করা, গভীরকে হালকা করা, দর্শনকে রসিকতায় মোড়া।

আরেক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "খুদা সম্পর্কে আমার ধারণা খুব সরল। তিনি আছেন, এটা মানি। কিন্তু তিনি কী করেন, কেন করেন এসব ভাবতে গেলে আমার মাথা ঘুরে যায়। তাই ভাবি না। বরং এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকি যে, তিনি যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। কিন্তু এটাও পুরোপুরি মানতে পারি না, কারণ আমার জীবনে যা ঘটেছে, তার সবই কি ভালোর জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর আমি পাই না, তাই প্রশ্ন করাই ছেড়ে দিয়েছি।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৭৫)

এই চিঠিতে গালিবের সংশয়বাদী দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। তাঁর সংশয় আছে, কিন্তু সেই সংশয় নিয়ে তিনি তর্ক করতে চান না, বরং এক ধরনের নিরাসক্ত সমর্পণে পৌঁছেছেন। এই সমর্পণই তাঁর হাস্যরসের গভীরতম স্তর যেখানে জীবনের সব জটিলতা এক অদ্ভুত সহজতায় পরিণত হয়েছে।

চিঠির সমাজতাত্ত্বিক মূল্য

গালিবের চিঠিগুলি কেবল সাহিত্যিক নয়, বরং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অমূল্য। এই চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের একটি জীবন্ত চিত্র পাই অভিজাত ও সাধারণ মানুষের জীবন, মুশায়রার সংস্কৃতি, দরবারি রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, ইংরেজ শাসনের প্রভাব, এবং পুরনো ও নতুনের সংঘাত। গালিবের চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়, উনবিংশ শতকের ভারতে কীভাবে এক সভ্যতার পতন ঘটছিল এবং কীভাবে আরেক সভ্যতার উত্থান হচ্ছিল।

নারঙ লিখেছেন: "গালিবের চিঠিগুলি উর্দু সাহিত্যের প্রথম সার্থক আত্মজীবনীমূলক রচনা। এতে তিনি কেবল নিজের কথা নয়, বরং সমগ্র যুগের কথা লিখেছেন। ইতিহাসবিদেরা এই চিঠিগুলি থেকে উনবিংশ শতকের ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক অমূল্য তথ্য পেতে পারেন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৮৫)

চিঠির ভাষা: একটি নমুনা

গালিবের চিঠির ভাষার সৌন্দর্য বোঝানোর জন্য একটি দীর্ঘতর উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। নিচের অংশটি একটি চিঠি থেকে নেওয়া, যা তিনি মির্জা তফতাকে লিখেছিলেন ১৮৬২ সালের দিকে। এখানে গালিব নিজের অন্ধত্ব, একাকীত্ব, এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার কথা লিখছেন কিন্তু কী ভাষায়!

"মিঁয়া, তুমি লিখেছ, 'আপনি চিঠি লেখেন না কেন?' কী লেখব, ভাই? জীবন এখন এমন এক মরুভূমি, যেখানে কোনো মরুদ্যান নেই। দিন যায়, রাত আসে, আবার দিন যায় এই চক্র ছাড়া আর কিছুই ঘটে না। আগে যখন দেখতে পেতাম, তখন প্রকৃতির রূপ দেখে মন ভরে যেত। এখন অন্ধ, শুধু শুনতে পাই। শুনতে পাই পাখির ডাক, বাতাসের শব্দ, বৃষ্টির পতন। কিন্তু শোনা আর দেখার মধ্যে যে তফাত, তা কেবল অন্ধই বোঝে।

তুমি হয়তো ভাবছ, আমি খুব দুঃখী। না, ভাই, দুঃখী নই। দুঃখও এখন পুরনো হয়ে গেছে, যেমন পুরনো জামা আর গায়ে লাগে না। এখন আমি এক অদ্ভুত নির্বিকার অবস্থায় আছি যেন জগতের সবকিছু আমার থেকে দূরে সরে গেছে, আর আমি দূর থেকে সব দেখছি, কিন্তু স্পর্শ করতে পারছি না। এই অবস্থাটা খারাপ নয়, বরং এক ধরনের শান্তি আছে এর মধ্যে।

মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে কী বলব? মৃত্যু আমার কাছে এখন এক পুরনো বন্ধুর মতো, যার আসার কথা জানি, কিন্তু এখনো আসেনি। যখন আসবে, তখন কী হবে তা ভেবে লাভ নেই। কারণ, যখন আসবে, তখন আমি থাকব না ভাবতে। এই যুক্তিটা খুব পুরনো, কিন্তু খুব সত্যি। জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি হল মৃত্যু, আর সবচেয়ে বড় মিথ্যা হল এই ভাবা যে, আমরা চিরকাল বাঁচব।"

এই চিঠিটি গালিবের গদ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ভাষা সহজ কিন্তু গভীর; বিষয়বস্তু বিষন্ন কিন্তু রসিক; প্রকাশভঙ্গি আন্তরিক কিন্তু দার্শনিক। যে মানুষ এই চিঠি লিখেছেন, তিনি কেবল একজন কবি নন, বরং এক জীবনদার্শনিক, যিনি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও অস্তিত্বের রহস্য নিয়ে ভাবছেন এবং সেই ভাবনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন।

গদ্যের মুক্তি

গালিব তাঁর গদ্যের মধ্য দিয়ে উর্দু ভাষাকে এক নতুন মুক্তি দিয়েছিলেন। যে ভাষা এতদিন ফার্সির দাসী ছিল, গালিবের হাতে তা হয়ে উঠল স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আত্মপ্রত্যয়ী। যে গদ্য এতদিন ছিল কৃত্রিম, দুর্বোধ্য, প্রাণহীন, গালিবের ছোঁয়ায় তা হয়ে উঠল প্রাণবন্ত, সহজ, হৃদয়গ্রাহী। গালিব প্রমাণ করেছিলেন, গদ্য কেবল তথ্যের বাহন নয়, বরং তা শিল্পও হতে পারে, সাহিত্যও হতে পারে, কবিতার চেয়েও কোনো অংশে কম নয়।

হালী যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের চিঠিগুলি উর্দু গদ্যের ইতিহাসে এক বিপ্লব। যে কাজ কবিতায় গালিব করেছিলেন গজলের মাধ্যমে, সেই একই কাজ তিনি গদ্যে করলেন চিঠির মাধ্যমে। তিনি দেখিয়ে দিলেন, উর্দু গদ্য কেবল সক্ষম নয়, বরং প্রয়োজনে ফার্সি গদ্যের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হতে পারে।" (হালী, ১৮৯৭: ১৮০)

রাসেল তাঁর মূল্যায়নে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন: "গালিবের চিঠিগুলি কেবল উর্দু সাহিত্যের নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের পত্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পৃথিবীর খুব কম লেখকই আছেন, যাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিগুলি সাহিত্যিক রচনা হিসেবে পড়া যায়। গালিব সেই বিরল প্রতিভাদের একজন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪১৫)

নির্বাচিত শের: গদ্য ও চিঠির অনুষঙ্গে

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ □ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

رنج سے□وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

نہ تھا کچھ تو□دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو□دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের গদ্যের শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। গালিবের চিঠিগুলি কেবল ইতিহাসের দলিল নয়, বরং এক একটি জীবন্ত সাহিত্যকর্ম। আপনি যদি গালিবের চিঠিগুলি পুরোপুরি পড়তে চান, তাহলে "খতুত-এ-গালিব" (গালিবের পত্রাবলি) সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। প্রতিটি চিঠিতে পাবেন হাসি, কান্না, দর্শন, রসিকতা জীবনের সব রঙ।

এখন, আপনি যদি নিজে চিঠি লেখেন বা ইমেইল করেন, তাহলে ভেবে দেখুন, আপনি কি সত্যিই 'কথা বলার' মতো করে লিখছেন, নাকি ফর্মাল ভাষায় আটকে আছেন? গালিবের শিক্ষা হল, লেখা হতে হবে আন্তরিক, সহজ, প্রাণবন্ত তবেই তা পাঠকের কাছে পৌঁছবে, তবেই তা সাহিত্য হয়ে উঠবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীকের জগতে সেই জগতে যেখানে ভাষা হয়ে ওঠে শব্দের জাদু, আর শব্দ হয়ে ওঠে অর্থের খনি। আমরা দেখব, কীভাবে গালিব ফার্সি ও উর্দু ভাষার সম্মিলনে এক অনন্য কাব্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি সনাতন প্রতীকগুলিকে ভেঙে নতুন অর্থের দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন।

অধ্যায় ১৩: কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীক

শব্দ যখন জাদু হয়ে ওঠে

কবিতা কেবল ভাবের প্রকাশ নয়, বরং ভাষার এক বিশেষ ব্যবহার, যেখানে শব্দ ও তাদের অর্থ এক জাদুকরী নৃত্যে মেতে ওঠে। গালিবের কাব্যের জগতে এই জাদু চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তিনি ভাষাকে কেবল ব্যবহারই করেননি, বরং তাকে নতুন করে নির্মাণও করেছেন। সনাতন প্রতীকগুলিকে তিনি ভেঙেছেন, নতুন অর্থ দিয়েছেন, কখনো বা পুরনো প্রতীকের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীক-ব্যবহার এতটাই স্বতন্ত্র যে, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক অনন্য অধ্যায় হয়ে আছে। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "গালিবের কাব্যভাষা এমন এক নদী, যার তলদেশে অসংখ্য রত্ন লুকিয়ে আছে। উপর থেকে দেখলে সরল, কিন্তু গভীরে নামলে জটিল ও বিস্ময়কর।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫০০)

এই অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীকের জগতে। আমরা দেখব, কীভাবে গালিব সনাতন প্রতীকগুলি শামা-পরওয়ানা, শীশা, সাকী-ময়-মহতাব, দায়ার, হরফ নিজের হাতে নতুন অর্থ দিয়েছেন। আমরা পর্যালোচনা করব, গালিবের গজলের 'আমি' কীভাবে এক দার্শনিক সত্তা হয়ে ওঠে, কোনো বাস্তব ব্যক্তি নয়। এবং আমরা অনুসন্ধান করব, কীভাবে গালিব বুদ্ধিদীপ্তি ও প্যারাডক্সের (হেঁয়ালি) মাধ্যমে তাঁর কাব্যে এক অনন্য নান্দনিকতা সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রধান কাব্যশব্দ ও প্রতীকের অভিধান

সনাতন প্রতীকের জগৎ ও গালিবের পূর্বসূরিরা

উর্দু-ফার্সি কাব্যে কিছু প্রতীক ও রূপক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। এই প্রতীকগুলি ছিল কাব্যের সাধারণ সম্পদ প্রত্যেক কবিই এগুলি ব্যবহার করতেন, এবং পাঠকেরাও এগুলির অর্থ বুঝতে পারতেন। যেমন, 'শামা' (মোমবাতি) ও 'পরওয়ানা' (পতঙ্গ) ছিল প্রেমিক-প্রেমাস্পদের প্রতীক, যেখানে প্রেমাস্পদ হলেন মোমবাতি উজ্জ্বল, সুন্দর, আকর্ষক; আর প্রেমিক হল পতঙ্গ যে মোমবাতির শিখায় নিজেকে পুড়িয়ে মারে। 'শীশা' (আয়না) ছিল আত্মজ্ঞান বা আত্মদর্শনের প্রতীক। 'সাকী' (মদপরিবেশক) ও 'ময়' (মদ) ছিল সুফি আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, যেখানে সাকী হলেন আধ্যাত্মিক গুরু বা খুদা, আর মদ হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা প্রেম। 'দায়ার' (বৃত্ত, জগৎ) ছিল জগৎ-সংসারের প্রতীক। 'হরফ' (অক্ষর) ছিল ভাষা, জ্ঞান, বা সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতীক।

গালিবের পূর্ববর্তী কবিরা মীর তকী মীর, সওদা, মীর দর্দ এই প্রতীকগুলি ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাঁদের ব্যবহার ছিল অনেকাংশে সনাতন অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মীর যখন 'শামা-পরওয়ানা' লিখতেন, তখন তিনি প্রেমিকের আত্মাহুতির কথাই বলতেন; সওদা যখন 'সাকী-ময়' লিখতেন, তখন তিনি হয় সুফি আধ্যাত্মিকতা, নয় সরাসরি মদ্যপানের আনন্দের কথা বলতেন। কিন্তু গালিব এসে এই প্রতীকগুলিকে এক নতুন জীবন দিলেন। তিনি এগুলির সনাতন অর্থকে ভেঙে নতুন অর্থ সৃষ্টি করলেন, কখনো প্রতীকগুলিকে নিজের ব্যক্তিগত ভাবনার বাহন করলেন, কখনো বা একই প্রতীকের একাধিক স্তর তৈরি করলেন।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের হাতে সনাতন প্রতীকগুলি এক নতুন রূপ পায়। তিনি যেমন পুরনো শব্দের নতুন অর্থ সৃষ্টি করেন, তেমনই পুরনো প্রতীকের নতুন প্রয়োগ ঘটান। এ কারণেই গালিবের কবিতা পড়তে গেলে পাঠককে কেবল শব্দার্থ নয়, প্রতীকগুলির গভীরতর অর্থও বুঝতে হয়।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪২০)

শামা-পরওয়ানা: আত্মাহুতি থেকে আত্মপরীক্ষায়

'শামা' (মোমবাতি) ও 'পরওয়ানা' (পতঙ্গ) হল উর্দু-ফার্সি কাব্যের সবচেয়ে পুরনো ও বহুল ব্যবহৃত প্রতীক-জোড়। সনাতন অর্থে, শামা হল প্রেমাস্পদ যে আলো দেয়, যে সুন্দর, যে আকর্ষণীয়। পরওয়ানা হল প্রেমিক যে শামার শিখায় আকৃষ্ট হয়ে তাতে পুড়ে মরে। এই প্রতীক দিয়ে প্রেমিকের আত্মবিসর্জনের, প্রেমের জন্য আত্মাহুতির ধারণা প্রকাশ করা হতো।

গালিব এই প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তিনি কেবল প্রেমিকের আত্মাহুতির কথা বলেননি, বরং প্রেমিকের আত্মপরীক্ষা, সংশয় ও দ্বিধার কথাও বলেছেন। গালিবের পরওয়ানা কেবল পুড়ে মরতে চায় না, সে প্রশ্ন করে কেন পুড়তে হবে? পুড়ে মরার অর্থ কী? শামার আলো কি সত্য, নাকি মায়া?

গালিবের একটি বিখ্যাত শের:

پروانہ کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس
میرے لیے یہی غم ہے، کس کا□ کا ہے دل

পরওয়ানা কো চরাগ হ্যায়, বুলবুল কো ফুল বাস
মেরে লিয়ে ইয়েহি গম হ্যায়, কিস কাম কা হ্যায় দিল

(পতঙ্গের জন্য প্রদীপ আছে, বুলবুলির জন্য ফুলই যথেষ্ট। আমার জন্য এই একই দুঃখ, হৃদয়টা কী কাজে লাগে?)

এখানে গালিব প্রচলিত প্রতীক পরওয়ানা ও চরাগ (প্রদীপ), বুলবুল ও ফুল ব্যবহার করছেন, কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থানটি হচ্ছে 'আমার জন্য এই দুঃখ'। অর্থাৎ, অন্যদের জন্য যে প্রতীকগুলি যথেষ্ট, আমার জন্য তা নয়। আমি সেই প্রতীকগুলির বাইরের কেউ আমার হৃদয়ের কোনো কাজ নেই, কারণ আমার হৃদয় কোনো প্রচলিত প্রতীকের ছাঁচে ফিট করে না। এই ভাবে গালিব সনাতন প্রতীকের মধ্য দিয়েই নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করছেন।

আরেকটি বিখ্যাত শের:

□مع جلتی ہے تو رو□ن ہے، بجھی جاتی ہے تو اندھیرا
یہی انداز ہے دنیا کا، کبھی د□ ہے کبھی را□

শামা জলতি হ্যায় তো রওশন হ্যায়, বুঝি জাতি হ্যায় তো অন্ধেরা
ইয়েহি আন্দাজ হ্যায় দুনিয়া কা, কভি দিন হ্যায় কভি রাত

(মোমবাতি জ্বলে তো আলো, নিভে যায় তো অন্ধকার। এই একই রীতি জগতের, কখনো দিন, কখনো রাত।)

এখানে শামা আর কেবল প্রেমাস্পদ নয়, বরং হয়ে উঠেছে জগতের নিয়তির প্রতীক আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংসের চক্র। গালিবের হাতে এই প্রতীকটি একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন, মূর্ত ও বিমূর্ত হয়ে উঠেছে।

শীশা (আয়না): আত্মদর্শন ও আত্মবিভ্রম

'শীশা' বা আয়না হল গালিবের কাব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। সনাতন অর্থে, আয়না ছিল আত্মজ্ঞানের প্রতীক যে মানুষ নিজেকে আয়নায় দেখতে পারে, সে নিজেকে চিনতে পারে। সুফি কাব্যে আয়না ছিল হৃদয়ের প্রতীক, যা পরিষ্কার করলে তাতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। কিন্তু গালিব আয়নাকে আরও জটিল, আরও বহুমাত্রিক করে তুলেছিলেন।

গালিবের হাতে আয়না কখনো আত্মদর্শনের উপায়, কখনো আত্মপ্রতারণার হাতিয়ার, কখনো সমাজের ভণ্ডামির প্রতিফলক, কখনো বা শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি তো আছেই: "হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন" যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। এখানে আয়না হলেন স্বয়ং কবি, যিনি নিজেকে দেখেন এবং নিজের মধ্য দিয়ে জগৎকে দেখেন।

আরেকটি শের:

آئینہ دیکھ اپنی سی □ور□ نظر آئی
تجھ کو کیا فرق ہے، جی میں ہے جو، وہی ہے باہر

আয়না দেখ আপ্নি সি সুরত নজর আয়ি
তুঝ কো ক্যা ফারাক হ্যায়, জি মে হ্যায় জো, ওহি হ্যায় বাহার

(আয়না দেখো, নিজের মতো চেহারা দেখা গেল। তোমার কী পার্থক্য বোঝে, ভেতরে যা আছে, তাই আছে বাইরে।)

এই শেরে আয়না আত্মদর্শনের চেয়েও বেশি কিছু তা হয়ে উঠেছে অন্তর ও বাহিরের অভিন্নতার প্রতীক। ভেতরে যা, বাইরেও তাই এই সত্যটি আয়না প্রকাশ করে দিচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে আয়না বিভ্রমও সৃষ্টি করছে কারণ আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবি কি সত্য, নাকি মায়া? গালিবের আয়না এই প্রশ্নও জাগায়।

সাকী-ময়-মহতাব: আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিবতার দ্বান্দ্বিকতা

'সাকী' (মদপরিবেশক), 'ময়' (মদ) ও 'মহতাব' (চাঁদ) এই প্রতীকত্রয়ী ফার্সি-উর্দু কাব্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুফি কাব্যে সাকী হলেন খুদা বা আধ্যাত্মিক গুরু, ময় হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা প্রেম, আর চাঁদ হল সৌন্দর্য বা ঐশ্বরিক আলোর প্রতীক। কিন্তু এই প্রতীকগুলির আবার পার্থিব অর্থও আছে সাকী হলেন মদের দোকানের সুন্দরী পরিবেশিকা, ময় হল সরাসরি মদ, আর চাঁদ হল প্রেমাস্পদের মুখ বা সৌন্দর্য।

গালিব এই প্রতীকগুলির উভয় অর্থকেই কাজে লাগিয়েছেন, এবং কখনো কখনো একই সঙ্গে দুই অর্থই ব্যবহার করে ইহাম (দ্ব্যর্থবোধকতা) সৃষ্টি করেছেন। ফলে পাঠক একই শেরকে একবার পার্থিব প্রেমের কাব্য হিসেবে পড়তে পারেন, আবার আরেকবার আধ্যাত্মিক কাব্য হিসেবেও পড়তে পারেন।

গালিবের একটি বিখ্যাত শের:

ساقی کو ہے □و□ی کہ بڑھے مے کی آبرو
ہم کو ہے غم کہ پیتے ہیں، اور کم ہے زندگی

সাকী কো হ্যায় খুশি কে বঢ়ে মে কী আব্রু
হম কো হ্যায় গম কে পীতে হ্যায়, আওর কম হ্যায় জিন্দেগি

(সাকি খুশি যে, মদের মর্যাদা বাড়ছে। আমাদের দুঃখ যে, খাচ্ছি, আর জীবন কম।)

এই শেরে 'মে' (মদ) ও 'জিন্দেগি' (জীবন) এর সম্পর্ক এক গভীর দার্শনিক সত্য প্রকাশ করছে জীবন যত কমছে, মদের (বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) মর্যাদা তত বাড়ছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি এক সরল পার্থিব কথাও আমরা মদ খাচ্ছি, আর জীবন কমে যাচ্ছে। দুই অর্থই একসঙ্গে সত্য, এবং এই দ্ব্যর্থবোধকতাই শেরের সৌন্দর্য।

আরেকটি শের:

چاند نے کہا، ساقی سے کہہ دو، آج را□
مے نہ دے، ورنہ □رابہ ہو جائے گا

চাঁদ নে কহা, সাকী সে কহ দো, আজ রাত
মে না দে, ওয়ারনা খারাবা হো যায়েগা

(চাঁদ বলেছে, সাকিকে বলে দাও, আজ রাতে মদ দিও না, নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে।)

এখানে 'চাঁদ' যেন এক সজীব চরিত্র, যে সাকিকে সাবধান করছে আজ রাতে মদ দিও না, নইলে ধ্বংস অনিবার্য। এই ধ্বংস কী? প্রেমিকের আত্মহনন? নাকি আধ্যাত্মিক মদে ডুবে আত্মবিসর্জন? নাকি সরাসরি নেশার ঘোরে নিজের সর্বনাশ? গালিব এই প্রতীকগুলির মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে একাধিক অর্থের জাল বুনেছেন।

দায়ার (বৃত্ত, জগৎ): সীমা ও অসীমের দ্বান্দ্বিকতা

'দায়ার' শব্দের অর্থ বৃত্ত, পরিধি, জগৎ-সংসার। ফার্সি-উর্দু কাব্যে দায়ার প্রায়ই জগৎ-সংসারের সীমাবদ্ধতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় মানুষ এই দায়ারের মধ্যে আবদ্ধ, আর মুক্তি চায় এই দায়ারের বাইরে যেতে। সুফি কাব্যে দায়ার হল সৃষ্ট জগতের প্রতীক, যার বাইরে রয়েছে অসীম খুদা।

গালিব এই প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর দায়ার কখনো কখনো সীমা নয়, বরং অসীমেরই প্রতীক হয়ে ওঠে। কখনো দায়ার হয়ে ওঠে নিজের অস্তিত্বের বৃত্ত, যার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কখনো দায়ার হয়ে ওঠে কবির কল্পনার অসীম পরিধি।

গালিবের একটি শের:

دائرے میں تو ہے گردش، پر دائرہ بھی ہے
نکل جا، اگر نکل سکتا ہے، دائرے سے باہر

দায়ারে মেঁ তো হ্যায় গর্দিশ, পর দায়ারা ভি হ্যায়
নিকল জা, আগর নিকল সকতা হ্যায়, দায়ারে সে বাহার

(বৃত্তের মধ্যে তো ঘূর্ণন আছে, কিন্তু বৃত্তও আছে। বেরিয়ে যা, যদি পারিস, বৃত্তের বাইরে।)

এখানে 'দায়ারা' একই সঙ্গে জগৎ-সংসার, নিজের সীমাবদ্ধতা, এবং চিন্তার খাঁচা তিনটিই হতে পারে। গালিব বলছেন, বৃত্তের মধ্যে ঘূর্ণন (গতি) আছে, কিন্তু বৃত্তের সীমাও আছে। তুমি যদি পারো, বৃত্তের বাইরে যাও। কিন্তু সত্যিই কি যাওয়া যায়? শেরটি এই প্রশ্নই জাগিয়ে রাখে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েও যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে।

হরফ (অক্ষর): ভাষা ও সৃষ্টির প্রতীক

'হরফ' (অক্ষর, বর্ণ) হল গালিবের কাব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। সনাতন অর্থে, হরফ হল জ্ঞানের, ভাষার, শিক্ষার প্রতীক। ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় 'হরফ' শব্দটি সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেও জড়িত বিশ্বাস করা হয়, খুদা সৃষ্টির শুরুতে 'হরফ' সৃষ্টি করেছেন, এবং সেই হরফ থেকেই সমগ্র জগতের উৎপত্তি।

গালিব হরফ প্রতীকটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করেছেন। কখনো হরফ হল ভাষা, যা কবির হাতিয়ার। কখনো হরফ হল জ্ঞান, যা মানুষকে মুক্তি দেয়। কখনো হরফ হল প্রেমাস্পদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপক যেমন 'হরফ-এ-লব' (ঠোঁটের অক্ষর) বা 'হরফ-এ-চশম' (চোখের অক্ষর)। কখনো হরফ হল নিয়তির লিখন, যা পরিবর্তন করা যায় না।

গালিবের একটি বিখ্যাত শের:

نقش فریادی ہے کس کی □و□یِ تحریر کا
کاغذی ہے پیرہن، ہر پیکرِ تصویر کا

নকশ-এ-ফরিয়াদী হ্যায় কিস কী শোখী-এ-তহরীর কা
কাগজি হ্যায় পয়রাহন, হার পয়কর-এ-তসবীর কা

(অভিযোগের চিত্র, কার রচনার চঞ্চলতা? প্রতিটি ছবির দেহের পোশাক কাগজের।)

এই শেরে 'তহরীর' (রচনা, লেখা) এবং 'তসবীর' (ছবি) একই সঙ্গে ভাষা ও সৃষ্টির প্রতীক। 'নকশ-এ-ফরিয়াদী' (অভিযোগের চিত্র) বলতে বোঝানো হয়েছে, কবি যে অভিযোগ-বেদনা লিখছেন, তা আসলে এক শিল্পকর্ম, যার 'শোখী' (চঞ্চলতা, সৌন্দর্য) কবির নিজস্ব সৃষ্টি নয়, বরং কোনো অজানা শক্তির দান। আর 'কাগজি পয়রাহন' (কাগজের পোশাক) বলতে ইঙ্গিত, এই জগতের সব সৌন্দর্যই কাগজের মতো ক্ষণস্থায়ী ও মায়াময়।

আরেকটি শের:

حرفِ چند، کہ جن سے ہے □لقِ پریشا□
اے کاش، سمجھتے وہ مرے حرفِ پریشاں

হরফ-এ-চন্দ, কে জিন সে হ্যায় খলক-এ-পরেশাঁ
এ কাশ, সমঝতে ওহ মেরে হরফ-এ-পরেশাঁ

(কয়েকটি অক্ষর, যেগুলির জন্য সৃষ্টি উদ্বিগ্ন। হায়, যদি তারা বুঝতে পারত আমার উদ্বিগ্ন অক্ষরগুলি।)

এখানে 'হরফ' দ্ব্যর্থবোধক একই সঙ্গে সৃষ্টির আদি অক্ষর, এবং কবির লেখা কবিতার শব্দ। সৃষ্টির আদি অক্ষরগুলির জন্য (যে অক্ষর থেকে জগত সৃষ্টি হয়েছে) সমগ্র সৃষ্টি উদ্বিগ্ন; কিন্তু কেউ যদি কবির উদ্বিগ্ন শব্দগুলির (তাঁর কবিতার) অর্থ বুঝতে পারত, তাহলে হয়তো সেই উদ্বিগ্নতা দূর হতো। এই ভাবে গালিব নিজের কবিতাকে সৃষ্টির আদি অক্ষরের সঙ্গে তুলনা করছেন একই সঙ্গে অহংকার ও বিনয়ের প্রকাশ।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক: দিল, গম, আশক, জখম, দরদ, হায়াত, মৌত

উপরোক্ত প্রতীকগুলি ছাড়াও গালিবের কাব্যে আরও কিছু প্রতীক বারবার ফিরে এসেছে, যেগুলির নিজস্ব অর্থ ও ব্যঞ্জনা আছে।

'দিল' (হৃদয়): গালিবের কাব্যে 'দিল' এক অত্যন্ত জটিল প্রতীক। সনাতন অর্থে, দিল হল প্রেমের স্থান, আবেগের কেন্দ্র। কিন্তু গালিবের হাতে দিল হয়ে ওঠে সংশয়ের, দ্বিধার, বুদ্ধিরও স্থান। গালিবের 'দিল' একই সঙ্গে আবেগপ্রবণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সে কাঁদেও, আবার প্রশ্নও করে। 'দিল-এ-নাদাঁ' (নির্বোধ হৃদয়) হল গালিবের অন্যতম বিখ্যাত সৃষ্টি এমন এক হৃদয়, যে জানে না কেন সে কষ্ট পাচ্ছে, অথচ কষ্ট পাচ্ছে।

'গম' (দুঃখ): গালিবের কাব্যে 'গম' এক স্থায়ী সুর। কিন্তু এটি কেবল ব্যক্তিগত দুঃখ নয়, বরং এক দার্শনিক দুঃখ অস্তিত্বের দুঃখ, জীবনের দুঃখ, জগতের দুঃখ। গালিবের ভাষায়, গম এক ধরনের 'বন্দ' (বন্ধন), যা জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আগে পর্যন্ত যাবে না। আবার, গম এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, তা আর দুঃখ বলে মনে হয় না "রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ"।

'আশক' (চোখের জল) ও 'জখম' (ক্ষত): এই প্রতীকগুলি দিয়ে গালিব প্রেমের বেদনার মূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর 'আশক' কেবল কান্না নয়, বরং এক ধরনের ভাষা, যা কথা বলতে পারে না, তবু সব বলে দেয়। 'জখম' কেবল শারীরিক ক্ষত নয়, বরং আত্মার ক্ষত, যা কখনো শুকায় না।

'হায়াত' (জীবন) ও 'মৌত' (মৃত্যু): গালিবের কাব্যে জীবন ও মৃত্যু পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরসম্পর্কিত। জীবন এক 'কয়দ' (কারাগার), আর মৃত্যু সেই কারাগার থেকে মুক্তি। কিন্তু একই সঙ্গে, জীবনই একমাত্র সত্য, কারণ মৃত্যুর পর আর কিছু জানা যায় না। তাই জীবনকে নিয়ে গালিবের মনোভাব একই সঙ্গে মোহ ও নৈরাশ্যে ভরা।

নৈর্ব্যক্তিকতা ও সৃজনশীল 'আমি'

গালিবের গজলের 'আমি': বাস্তব ব্যক্তি নয়, দার্শনিক সত্তা

গালিবের গজলের 'আমি' (ম্যাঁ, আমি) এক অদ্ভুত সত্তা। এটি নিছক গালিবের ব্যক্তিগত অহংকারের প্রকাশ নয়, বরং এক সৃজনশীল, দার্শনিক 'আমি' যা কবির ব্যক্তিগত সত্তা থেকে উঠে এসে এক সার্বজনীন মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। গালিবের কাব্য পড়তে গেলে এই 'আমি'-র চরিত্র বোঝা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, গালিবের অনেক শেরই আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত বলে মনে হয় যেন কবি নিজের কথা বলছেন। কিন্তু আসলে তিনি নিজের মধ্য দিয়ে এক বৃহত্তর মানবিক সত্যের কথা বলছেন।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিবের গজলের 'আমি' কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়, বরং এক কাব্যিক নির্মাণ। এই 'আমি' কখনো প্রেমিক, কখনো দার্শনিক, কখনো সংশয়বাদী, কখনো রসিক। এই বিভিন্ন 'আমি'-র মধ্য দিয়ে গালিব মানবজীবনের বিভিন্ন দিক অন্বেষণ করেছেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪২৫)

ড. গোপী চাঁদ নারঙ যোগ করেছেন: "গালিবের কাব্যে 'আমি' ও 'আমরা'র মধ্যে সীমারেখা ক্রমশ মুছে গেছে। তাঁর 'আমি' ব্যক্তিগত, কিন্তু একই সঙ্গে তা সার্বজনীন। যখন গালিব লেখেন 'হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ', তখন এই 'হম' (আমরা) একই সঙ্গে গালিব নিজে এবং পাঠকও। অর্থাৎ, গালিবের বক্তব্য শুধু তাঁর নিজের জন্য নয়, পাঠকের জন্যও প্রযোজ্য।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫১০)

এই নৈর্ব্যক্তিক 'আমি'-র সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হল গালিবের সেই বিখ্যাত শেরগুলি, যেখানে তিনি জগৎকে 'তামাশা' বা 'খেলাঘর' বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন: "বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে" এখানে 'মেরে আগে' (আমার সামনে) বলতে গালিব নিজেকে এক দর্শক হিসেবে উপস্থাপন করছেন, যিনি জগতের ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, দূর থেকে দেখছেন। এই 'আমি' কোনো নির্দিষ্ট মানুষ নন, বরং এক দার্শনিক সত্তা, যিনি জগৎকে বাইরে থেকে দেখতে পারেন।

আরেকটি উদাহরণ: "হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন" এখানে 'হুঁ' (আমি) একই সঙ্গে সমাজের অংশ ('মুসাহিব') এবং সমাজের বাইরের কেউ ('আয়না-এ-খুদ-বীন')। এই দ্বান্দ্বিক অবস্থানটি কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তির নয়, বরং এক কাব্যিক ও দার্শনিক অবস্থানের প্রকাশ।

বুদ্ধিদীপ্তি ও প্যারাডক্সের ব্যবহার

গালিবের কাব্যের আরেকটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধিদীপ্তি ও প্যারাডক্স (হেঁয়ালি, আপাতবিরোধী সত্য) এর ব্যবহার। গালিব প্রায়ই এমন কথা বলেন, যা শুনতে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, তা সত্য। এই প্যারাডক্সগুলি গালিবের কাব্যকে এক বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে, যা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে।

গালিবের প্যারাডক্সের একটি বিখ্যাত উদাহরণ:

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এটি একটি চমৎকার প্যারাডক্স মুশকিল যখন এত বেশি হয়ে যায়, তখন তা আর মুশকিল থাকে না, বরং সহজ হয়ে যায়। এই বক্তব্যটি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী, কিন্তু গভীর মনস্তাত্ত্বিক সত্য প্রকাশ করে। গালিবের দর্শনের একটি মূল উপাদানই হল এই প্যারাডক্স দুঃখের অভ্যাস দুঃখকে ঘুচিয়ে দেয়, বেদনার আধিক্য বেদনাকে প্রশমিত করে।

আরেকটি প্যারাডক্স:

ہم کو □ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এটিও এক প্যারাডক্স যারা বিশ্বস্ততা জানে না, তাদের কাছে বিশ্বস্ততার আশা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, এবং তবু আমরা সেই আশা করি। কেন করি? কারণ, প্রেম বা জীবনের কিছু সম্পর্ক এমনই অযৌক্তিক, তবু অনিবার্য। গালিব এই প্যারাডক্সের মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কের এক গভীর সত্য প্রকাশ করেছেন।

হেঁয়ালি ও বুদ্ধিবৃত্তিক খেলা

প্যারাডক্সের পাশাপাশি গালিবের কাব্যে আরেকটি উপাদান সক্রিয় তা হল হেঁয়ালি বা বুদ্ধিবৃত্তিক খেলা। গালিব প্রায়ই শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতা, ব্যঞ্জনা ও ইহামের মাধ্যমে এমন জটিলতা সৃষ্টি করতেন, যা পাঠককে ধাঁধার মতো ভাবিয়ে তোলে। পাঠক একবার ভাবেন, শেরটির অর্থ এটি; আবার ভাবেন, না, ওটি; তৃতীয়বার ভাবেন, হয়তো দুটোই সত্য।

গালিবের হেঁয়ালির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ:

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

এই শেরটি এক হেঁয়ালির মতো। প্রথম মিসরাটি একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক রহস্য কী ছিল যখন কিছুই ছিল না? দ্বিতীয় মিসরাটি একটি অস্তিত্ববাদী হেঁয়ালি আমার অস্তিত্বই আমার যন্ত্রণার কারণ; আমি না থাকলে কী ক্ষতি? কিন্তু এই 'কী ক্ষতি' প্রশ্নটি নিজেই এক হেঁয়ালি কারণ, প্রশ্নটি করার জন্যও অস্তিত্ব প্রয়োজন। অস্তিত্ব না থাকলে প্রশ্নও থাকে না। এই হেঁয়ালির ভেতরে গালিব অস্তিত্বের সমগ্র রহস্যকে ধরে রেখেছেন।

আরেকটি হেঁয়ালি:

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

এই শেরের হেঁয়ালি হল: জীবনই যদি দুঃখ হয়, তাহলে জীবন থাকতে দুঃখ থেকে মুক্তি কীভাবে সম্ভব? প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয়েছে, যেন উত্তর আগেই দেওয়া আছে মুক্তি সম্ভব নয়। অথচ, প্রশ্নটি 'কিঁউ' (কেন) দিয়ে শেষ হয়েছে, যা উত্তরহীনতারই ইঙ্গিত। গালিব এই হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে জীবনের এক গভীর প্যারাডক্সকে ধরে রেখেছেন।

নৈর্ব্যক্তিকতার দার্শনিক ভিত্তি

গালিবের কাব্যে নৈর্ব্যক্তিকতার যে প্রবণতা, তার পেছনে একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি আছে। গালিব ছিলেন সুফিবাদ, অস্তিত্ববাদ ও সংশয়বাদের সংমিশ্রণে গড়া এক দার্শনিক কবি। সুফিবাদ তাঁকে শিখিয়েছিল, ব্যক্তিগত 'আমি' অসার, প্রকৃত সত্তা এক ও অদ্বিতীয়, এবং সেই সত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। অস্তিত্ববাদ তাঁকে শিখিয়েছিল, মানুষের অস্তিত্বই তার সার, এবং এই অস্তিত্ব একই সঙ্গে মহৎ ও অর্থহীন। সংশয়বাদ তাঁকে শিখিয়েছিল, কোনো সত্যই চূড়ান্ত নয়, সবকিছুই প্রশ্নযোগ্য।

এই তিন দার্শনিক ধারার সম্মিলনে গালিবের 'আমি' হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক, আত্মমগ্ন ও জগৎমুখী, আবেগপ্রবণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। এই 'আমি' কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি নয়, বরং আধুনিক মানবচেতনারই এক কাব্যিক রূপায়ণ। যেমনটি বলেছেন রাসেল: "গালিবের গজলের 'আমি' হল আধুনিক মানুষের 'আমি' যে নিজেকে নিয়ে সংশয়গ্রস্ত, যে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যে জগতের অর্থহীনতায় ভোগে, অথচ তার মধ্যেই এক ধরনের সৌন্দর্য খুঁজে পায়।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৩০)

ভাষার স্থপতি

গালিবের কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীক-ব্যবহার উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য অর্জন। তিনি সনাতন প্রতীকগুলিকে ভেঙে নতুন অর্থ দিয়েছেন, পুরনো রূপকগুলির মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন, এবং একই সঙ্গে এক সম্পূর্ণ নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ করেছেন যা একই সঙ্গে সহজ ও জটিল, আবেগময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক, ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন।

তাঁর গজলের 'আমি' নিছক কবির ব্যক্তিগত অহংকার নয়, বরং এক দার্শনিক সত্তা, যা মানবজীবনের গভীরতম প্রশ্নগুলিকে তুলে ধরে। তাঁর প্যারাডক্স ও হেঁয়ালিগুলি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক খেলা নয়, বরং জীবনের গভীরতম সত্যগুলিকে প্রকাশ করার এক অনন্য পদ্ধতি। গালিবের কাব্যের এই গুণগুলিই তাঁকে কেবল উর্দু নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নির্বাচিত শের: কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীকের অনুষঙ্গে

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীকের জগৎ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। এখন আপনি যদি গালিবের কোনো গজল পড়েন, তাহলে সেই গজলে কোন প্রতীক কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কোন প্যারাডক্স কীভাবে কাজ করছে, এবং গালিবের 'আমি' কোন দার্শনিক অবস্থান থেকে কথা বলছে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, গালিবের প্রতিটি শেরই এক নতুন অর্থের দরজা খুলে দেবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের নির্বাচিত গজল ও শেরের বিশদ বিশ্লেষণে যেখানে পাঁচটি সম্পূর্ণ গজলের পঙ্‌ক্তি-দর-পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ এবং পনেরোটি নির্বাচিত শেরের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা গালিবের কাব্যের সৌন্দর্য ও গভীরতাকে আরও কাছ থেকে দেখব।

অধ্যায় ১৪: নির্বাচিত গজল ও শেরের বিশ্লেষণ

শব্দের শরীরে অর্থের আত্মা

কাব্যবিশ্লেষণ একটি সূক্ষ্ম শিল্প। এর জন্য প্রয়োজন একই সঙ্গে শব্দের প্রতি গভীর মনোযোগ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের জ্ঞান, এবং কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রতি সংবেদনশীলতা। গালিবের কাব্য বিশ্লেষণ করতে গেলে এই তিনটি গুণই অপরিহার্য। কারণ, গালিবের প্রতিটি শের যেন একটি বহুস্তরীয় রত্ন উপরের স্তরে সরল অর্থ, কিন্তু নিচের স্তরে জটিল ব্যঞ্জনা, ইহাম, প্যারাডক্স ও দার্শনিক গভীরতা। একটি শের পড়ে প্রথমবার যা মনে হয়, দ্বিতীয়বার তা বদলে যায়; তৃতীয়বার আবার নতুন কিছু ধরা পড়ে। এই কারণেই গালিবের কাব্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাঠককে আকর্ষণ করে চলেছে, এবং প্রতিটি প্রজন্মই তাতে নতুন অর্থ আবিষ্কার করেছে।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে অর্থের স্তর এতটাই বহু যে, তা কখনো নিঃশেষ হয় না। প্রতিটি পাঠ, প্রতিটি বিশ্লেষণ নতুন দরজা খোলে। এই কারণেই গালিবকে নিয়ে লেখার কোনো শেষ নেই।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৩০) রালফ রাসেল আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন: "গালিবের শেরগুলি এমনভাবে তৈরি যে, তা একই সঙ্গে পাঠকের আবেগ ও বুদ্ধিকে স্পর্শ করে। তিনি এমন এক কাব্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে প্রতিটি শব্দ একই সঙ্গে একাধিক অর্থ বহন করে, এবং এই অর্থগুলি কখনো একে অপরের পরিপূরক, কখনো একে অপরের বিরোধী।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৫০)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের পাঁচটি সম্পূর্ণ গজলের পঙ্ক্তি-দর-পঙ্ক্তি বিশ্লেষণ করব, এবং পনেরোটি নির্বাচিত শেরকে চারটি বিষয়শ্রেণীতে দর্শন, ব্যঙ্গ, প্রেম ও জীবন্ময়তা ভাগ করে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করব। প্রতিটি বিশ্লেষণে আমরা শেরটির মূল উর্দু, হরফ, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ দিয়ে শুরু করব, তারপর শব্দার্থ, অলংকার, ইহাম, প্রতীক, দার্শনিক ব্যঞ্জনা ও নান্দনিক সৌন্দর্যের পর্যালোচনা করব। যেখানে প্রাসঙ্গিক, সেখানে গালিবের অন্যান্য শেরের সঙ্গে তুলনা করব, এবং সমসাময়িক বা পরবর্তী সমালোচকদের মতামতও উদ্ধৃত করব।

পাঁচটি সম্পূর্ণ গজলের পঙ্ক্তি-দর-পঙ্ক্তি বিশ্লেষণ

গজল ১: "হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি..." (আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা)

مطلع:
ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

মাতলা:
হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

এটি গালিবের সবচেয়ে বিখ্যাত গজলগুলির একটি, এবং এই মাতলাটিই যেন সমগ্র গজলের প্রাণ। প্রথম পঙ্ক্তিতে 'হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ' (হাজারো আকাঙ্ক্ষা) বলতে গালিব মানবজীবনের সেই অসীম আকাঙ্ক্ষার কথা বলছেন, যা কখনো পূর্ণ হয় না। 'হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে' (প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়) এই বক্তব্যটি একই সঙ্গে আবেগময় ও দার্শনিক। এর একদিক হল, আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র যে তা প্রাণ কেড়ে নেয়; অন্যদিক হল, প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানুষ তার সমগ্র সত্তা উজাড় করে দেয়।

দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে 'বহুত নিকলে মেরে আরমান' (অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান) এখানে গালিব স্বীকার করছেন, তাঁর জীবনে কিছু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণও হয়েছে। কিন্তু 'লেকিন ফির ভি কম নিকলে' (তবু কমই রয়ে গেছে) এই শেষ অংশটি সমগ্র শেরের কেন্দ্রীয় বক্তব্য। অর্থাৎ, যা পেয়েছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল; যা পাইনি, তার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। রালফ রাসেল এই শের সম্পর্কে লিখেছেন: "এটি মানবজীবনের এক চিরন্তন সত্যের প্রকাশ আমাদের আকাঙ্ক্ষা অসীম, কিন্তু পূরণ হয় সীমিত। গালিব এই সত্যটিকে এমনভাবে বলেছেন যে, তা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৫৫)

دوسرا□عر:
نکلنا□لد سے آد□ کا سنتے آئے ہیں لیکن
بہت بے آبرو ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے

দুসরা শের:
নিকলনা খুল্দ সে আদম কা সুনতে আয়ে হ্যায় লেকিন
বহুত বে-আব্রু হো কর তেরে কুচে সে হম নিকলে

(আদমের বেহেশ্ত থেকে বেরিয়ে আসার কথা শুনে আসছি, কিন্তু খুব অসম্মানিত হয়ে তোমার গলি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি।)

এই শেরটি গালিবের ইহামগোই-এর চমৎকার উদাহরণ। 'খুল্দ' (বেহেশ্ত) ও 'আদম' এর কাহিনি সকলের জানা আদমকে বেহেশ্ত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গালিব সেই পৌরাণিক কাহিনিকে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করছেন। 'তেরে কুচে' (তোমার গলি) হল প্রেমাস্পদের গলি, যেখান থেকে কবি অসম্মানিত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। তুলনাটি অত্যন্ত কার্যকর বেহেশ্ত থেকে বের হওয়া আদমের চেয়েও বেশি অসম্মানিত হয়েছেন কবি। খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "এই শেরে গালিব পৌরাণিক কাহিনিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে এক নতুন ধরনের ব্যঞ্জা সৃষ্টি করেছেন যেখানে কবির অসম্মান আদমের অসম্মানকেও ছাড়িয়ে যায়।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৪৫)

تیسرا □عر:
محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا
اُسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ د□ نکلے

তিসরা শের:
মুহব্বত মেঁ নহীঁ হ্যায় ফারাক জীনে আওর মরনে কা
উসি কো দেখ কর জীতে হ্যায় জিস কাফির পে দম নিকলে

(প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা তাকে দেখেই বাঁচি, যে কাফেরের জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়।)

এই শেরটি প্রেমের এক চরম অস্তিত্ববাদী সংজ্ঞা দিচ্ছে। প্রথম পঙ্ক্তি: প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য মুছে যায় এটি সুফি দর্শনেরই প্রতিধ্বনি, যেখানে প্রেমিক প্রেমাস্পদে এতটাই বিলীন হয়ে যায় যে, নিজের জীবন-মৃত্যুর জ্ঞান হারায়। দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে 'কাফির' (ধর্মচ্যুত) শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমাস্পদকে 'কাফির' বলা হয়েছে একই সঙ্গে প্রেমাস্পদের নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত এবং প্রথাগত ধর্মীয় ধারণার প্রতি এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জা। 'জিস কাফির পে দম নিকলে' (যে কাফেরের জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়) অর্থাৎ, যে প্রেমাস্পদ কবির প্রাণ নেয়, সেই প্রেমাস্পদকেই দেখে কবি বেঁচে থাকেন। এটি এক চমৎকার প্যারাডক্স যে প্রাণ নেয়, সেই-ই আবার বাঁচিয়ে রাখে।

چوتھا□عر:
کہاں مے□انے کا دروازہ غالبؔ اور کہاں واعظ
پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

চৌথা শের:
কহাঁ ময়-খানে কা দরওয়াজা 'গালিব' আওর কহাঁ ওয়ায়েজ
পর ইতনা জানতে হ্যায় কল ওহ জাতা থা কে হম নিকলে

(কোথায় মদের দোকানের দরজা, হে গালিব, আর কোথায় ধর্মোপদেশক! কিন্তু এতটুকু জানি, কাল সে যাচ্ছিল যখন আমরা বেরিয়ে এলাম।)

এই শেরে গালিব নিজের ছদ্মনাম 'গালিব' ব্যবহার করেছেন, এবং 'ময়-খানা' (মদের দোকান) ও 'ওয়ায়েজ' (ধর্মোপদেশক)-এর মধ্যে যে বিরোধ, তা তাঁর কাব্যে প্রায়ই ফিরে আসে। 'ময়-খানা' এখানে একই সঙ্গে মদের দোকান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কেন্দ্র (সুফি প্রতীক হিসেবে); 'ওয়ায়েজ' হল ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতীক। গালিব বলছেন, মদের দোকান ও ওয়ায়েজের মধ্যে কোনো তুলনাই হয় না তাদের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু শেষ পঙ্ক্তিতে এক রহস্যময়তা 'কাল ওহ জাতা থা কে হম নিকলে' (কাল সে যাচ্ছিল যখন আমরা বেরিয়ে এলাম)। এই বাক্যটি ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বোধ্য রাখা হয়েছে কে যাচ্ছিল? ওয়ায়েজ? নাকি অন্য কেউ? এবং 'হম নিকলে' (আমরা বেরিয়ে এলাম) বলতে কী বোঝানো হয়েছে ময়-খানা থেকে বেরোনো, নাকি জীবন থেকে মুক্তি? এই অনিশ্চয়তাই শেরের সৌন্দর্য।

مقطع:
ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

মাকতা:
হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(মাকতায় মাতলার পুনরাবৃত্তি গজলের রীতি অনুযায়ী শেষে আবার প্রথম শেরটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যা সমগ্র গজলের মূল সুরকে আরও দৃঢ় করে।)

গজল ২: "ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা..." (আত্মসমর্পণ ও অসীমে বিলীন)

مطلع:
عشر□ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

মাতলা:
ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা
দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

(ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া। ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।)

এটি গালিবের আরেকটি অত্যন্ত বিখ্যাত গজল, যেখানে আত্মসমর্পণ ও অসীমে বিলীন হওয়ার দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পঙ্‌ক্তি: 'ইশরাতে কতরা' (ফোঁটার সুখ) কী? নদীতে মিলিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন করে অসীমের অংশ হয়ে যাওয়া। এটি সুফি দর্শনের 'ফানা' (আত্মবিলোপ) তত্ত্বের কাব্যিক প্রকাশ। ফোঁটা যদি নিজেকে আলাদা রাখতে চায়, তাহলে শুকিয়ে মরবে; কিন্তু যদি নদীতে মিলিয়ে যায়, তাহলে সে নদী হয়ে বেঁচে থাকবে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি: 'দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা' (ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়া) কীভাবে 'দাওয়া' (ঔষধ) হয়ে যায়? এটি সেই একই প্যারাডক্স যা আমরা আগেও দেখেছি: দুঃখ যখন চরমে পৌঁছায়, তখন তা আর দুঃখ থাকে না, বরং মুক্তির উপায় হয়ে ওঠে।

নারঙ এই মাতলা সম্পর্কে লিখেছেন: "প্রথম শেরটিতেই গালিব জীবনের দুটি বড় সত্যকে একসঙ্গে বেঁধেছেন আত্মবিলোপের আনন্দ ও চরম বেদনার মুক্তি। এই দুই সত্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ফোঁটা নদীতে মিলিয়ে গিয়ে যেমন সুখী হয়, তেমনি ব্যথা চরমে পৌঁছে ঔষধ হয়ে যায়।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৩৫)

دوسرا□عر:
ہم سے کیا ہو جو تمہیں داغ ہو، مرہم نہ ہو
ز□م کا چاہیے□ادا□ رہا، ہرا ہو جانا

দুসরা শের:
হম সে ক্যা হো জো তুমহে দাগ হো, মরহম না হো
জখম কা চাহিয়ে শাদাব রহা, হরা হো জানা

(আমাদের দ্বারা কী হবে, যদি তুমি ক্ষত হও, প্রলেপ না হও। ক্ষতকে চাই সতেজ থাকতে, সবুজ হয়ে উঠতে।)

এই শেরটি প্রেমের বেদনা সম্পর্কে এক নতুন ধারণা দেয়। সাধারণত প্রেমিক চায়, প্রেমাস্পদের ক্ষতের প্রলেপ হতে অর্থাৎ, প্রেমাস্পদের কষ্ট দূর করতে। কিন্তু গালিব বলছেন, "আমাদের দ্বারা কী হবে, যদি তুমি ক্ষত হও, প্রলেপ না হও?" অর্থাৎ, আমরা তো প্রলেপ নই, আমরা নিজেরাই ক্ষত। এবং শেষ পঙ্‌ক্তি: "ক্ষতকে চাই সতেজ থাকতে, সবুজ হয়ে উঠতে" ক্ষতকে শুকাতে দেওয়া যাবে না, বরং তাকে তাজা ও সবুজ রাখতে হবে, কারণ ক্ষতই প্রেমের প্রমাণ। এটি প্রেমের এক অদ্ভুত দর্শন যেখানে ক্ষত আরোগ্য করার জিনিস নয়, বরং লালন করার জিনিস।

:تیسرا □عر
ہے غیبِ غیب جسے سمجھے ہیں ہم، وہ ہے □دا
ہوتا ہے غیبِ غیب، وہ آ□کارا ہو جانا

তিসরা শের:
হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব জিসে সমঝে হ্যায় হম, ওহ হ্যায় খুদা
হোতা হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব, ওহ আশকারা হো জানা

(যাকে আমরা অদৃশ্যের অদৃশ্য মনে করি, সেই হল খুদা। হয় অদৃশ্যের অদৃশ্য, তা প্রকাশিত হয়ে ওঠা।)

এই শেরটি গালিবের খুদা-ভাবনার এক জটিল প্রকাশ। 'গায়েব-এ-গায়েব' (অদৃশ্যের অদৃশ্য) একটি সুফি তত্ত্ব খুদা এতটাই অদৃশ্য যে, তিনি সাধারণ অদৃশ্যতারও বাইরে। কিন্তু গালিব বলছেন, সেই অদৃশ্যের অদৃশ্যই আবার 'আশকারা' (প্রকাশিত) হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ, খুদা একই সঙ্গে অতি অদৃশ্য ও অতি প্রকাশিত একই সঙ্গে অসীম রহস্য ও পরম সত্য। এটি সুফি দর্শনের 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ) তত্ত্বের ইঙ্গিত।

:چوتھا □عر
یہ مسائلِ تصوف، یہ ترا بیا□ غالبؔ
تجھے ہم ولی سمجھتے، جو نہ بادہ□وار ہوتا

চৌথা শের:
ইয়ে মাসায়েল-এ-তাসাওউফ, ইয়ে তেরা বয়ান 'গালিব'
তুঝে হম ওলি সমঝতে, জো না বাদা-খওয়ার হোতা

(এইসব সুফিতত্ত্বের জটিলতা, এই তোমার ব্যাখ্যা, হে গালিব! তোমাকে আমরা ওলি (সাধু) মনে করতাম, যদি তুমি মদ্যপায়ী না হতে।)

এই শেরটি গালিবের আত্ম-বিদ্রূপের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। গোটা গজল জুড়ে তিনি সুফি দর্শনের গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন ফানা, দাওয়া, গায়েব-এ-গায়েব ইত্যাদি। তারপর শেষে এসে নিজেই নিজেকে নিয়ে রসিকতা করছেন: "তুমি এত সুফিতত্ত্ব বোঝো, কিন্তু তুমি তো মদ্যপায়ী! তুমি যদি মদ্যপায়ী না হতে, তাহলে আমরা তোমাকে সাধু মনে করতাম।" এই আত্ম-বিদ্রূপ একই সঙ্গে গালিবের বিনয় ও অহংকার দুই-ই প্রকাশ করে বিনয় এই অর্থে যে, তিনি নিজেকে সাধু বলে দাবি করছেন না; অহংকার এই অর্থে যে, তিনি জানেন, মদ্যপান সত্ত্বেও তিনি যা লিখেছেন, তা সাধুতুল্য।

গজল ৩: "গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো..." (প্রেমের করুণ আকুতি)

:مطلع
گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

মাতলা:
গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

এটি গালিবের সবচেয়ে কোমল, সবচেয়ে স্নিগ্ধ গজলগুলির একটি। এখানে তিনি প্রকৃতির রূপকের মধ্য দিয়ে প্রেমের করুণ আকুতি প্রকাশ করেছেন। 'বাদ-এ-নওবাহার' (নতুন বসন্তের বাতাস) কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ফুলে রং ভরো, অর্থাৎ, প্রেমের পরিবেশ সৃষ্টি করো। দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে আরও সরাসরি আহ্বান এসো, যাতে বাগানের (প্রেমের জগতের) কাজকর্ম চলে। অর্থাৎ, প্রেমাস্পদের আগমন ছাড়া প্রেমের জগৎ অচল।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গুলোন মে রং ভরে' গজলটি গালিবের কাব্যের একটি অন্যতম স্নিগ্ধতম রচনা। এতে তিনি প্রকৃতির রূপকের মধ্য দিয়ে প্রেমের আকুতিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, পড়লে মনে হয়, যেন বসন্তের বাতাস নিজেই প্রেমাস্পদ হয়ে উঠেছে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৫০)

دوسرا □عر:
قفس میں ہم سے ہیں، رہتا ہے چمن میں کو□ سا د□
طبیبِ گل کو سمجھ، آئے کہ ا□ نکھار چلے

দুসরা শের:
কফস মে হম সে হ্যায়, রহতা হ্যায় চমন মেঁ কৌন সা দম
তবীব-এ-গুল কো সমঝ, আয়ে কে অব নিখার চলো

(খাঁচায় আমাদের মতো, বাগানে থাকে কেমন করে? ফুলের চিকিৎসককে বোঝাও, এসো, যাতে এখন সৌন্দর্য খেলে।)

এখানে 'কফস' (খাঁচা) ও 'চমন' (বাগান) এর দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে। 'কফস মে হম সে হ্যায়' (খাঁচায় আমাদের মতো) অর্থাৎ, কবি খাঁচায় বন্দি (প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন)। 'চমন মেঁ কৌন সা দম রহতা হ্যায়' (বাগানে কেমন করে থাকা যায়?) অর্থাৎ, প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদে কবির পক্ষে বাগানে (পৃথিবীতে) থাকা অসম্ভব। 'তবীব-এ-গুল' (ফুলের চিকিৎসক) হল প্রেমাস্পদ, যে এসে ফুলের (কবির আত্মার) সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবে।

تیسرا □عر:
وفاداری بہ□رطِ استواری ا□لِ ایماں ہے
مرے بت میں جو، نہ کعبے میں ٹھہر، جا کر تو گیاں چلے

তিসরা শের:
ওফাদারী ব-শর্ত-এ-ওস্তোয়ারি অসল-এ-ঈমা হ্যায়
মেরে বুত মেঁ জো, না কাবা মেঁ ঠহর, জা কর তো গিয়া চলো

(বিশ্বস্ততা, স্থায়িত্বের শর্তে, বিশ্বাসের মূল। আমার মূর্তিতে যদি থাকে, তবে কাবায় গিয়ে থামবে কেন? চলো, গিয়া মন্দিরেই চলো।)

এই শেরটি গালিবের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও প্রেমের সার্বজনীনতার এক সুন্দর প্রকাশ। প্রথম পঙ্ক্তি: বিশ্বস্ততা (ওফা) যদি স্থায়ী হয়, তাহলে সেটাই প্রকৃত ধর্ম। দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে 'মেরে বুত' (আমার মূর্তি) অর্থাৎ প্রেমাস্পদ প্রথাগত ধর্মে 'বুত' (মূর্তি) পূজা নিষিদ্ধ, কিন্তু গালিব বলছেন, যদি আমার প্রেমাস্পদের প্রতি বিশ্বস্ততা থাকে, তাহলে কাবা (ইসলামের পবিত্র স্থান) যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং গিয়া মন্দিরে (হিন্দুদের পবিত্র স্থান) চলো। এটি একই সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবস্থান এবং প্রেমের সর্বজনীনতার ঘোষণা।

গজল ৪: "দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়..." (প্রেমের যন্ত্রণার কারণ অন্বেষণ)

مطلع:
دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آ□ر اس درد کی دوا کیا ہے

মাতলা:
দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়?
আখির ইস দর্দ কী দাওয়া ক্যা হ্যায়?

(হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এই ব্যথার ঔষধ কী?)

এটি গালিবের সবচেয়ে জনপ্রিয় গজলগুলির একটি, এবং সম্ভবত সবচেয়ে সহজবোধ্য। এখানে তিনি একই সঙ্গে নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করছেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। প্রথম পঙ্ক্তিতে 'দিল-এ-নাদাঁ' (নির্বোধ হৃদয়) এই সম্বোধনটিই অত্যন্ত অর্থবহ। হৃদয়কে 'নির্বোধ' বলা হচ্ছে, কারণ সে না জেনে, না বুঝে প্রেমে পড়েছে, এবং এখন যন্ত্রণা পাচ্ছে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি: 'এই ব্যথার ঔষধ কী?' প্রশ্নটি রয়ে গেছে উত্তরহীন, এবং এই উত্তরহীনতাই গোটা গজলের সুর নির্ধারণ করেছে।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "এই গজলটি গালিবের কাব্যের সরলতম রচনাগুলির একটি, কিন্তু একই সঙ্গে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী। এখানে গালিব দর্শনের জটিলতা পরিত্যাগ করে সরাসরি হৃদয়ের কথা বলেছেন, এবং এই সরলতাই গজলটিকে এত জনপ্রিয় করেছে।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৬০)

دوسرا □عر:
ہم کو □ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

দুসরা শের:
হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এই শেরটি আমরা পূর্বেও কয়েকবার উদ্ধৃত করেছি, কিন্তু এই গজলের প্রসঙ্গেই এটি সবচেয়ে স্বাভাবিক। এখানে সেই একই প্যারাডক্স যারা বিশ্বস্ততা জানে না, তাদের কাছে বিশ্বস্ততা আশা করা। এই প্যারাডক্সই প্রেমের যন্ত্রণার মূল কারণ প্রেমিক জানে যে তার আশা পূর্ণ হবে না, তবু আশা করতে বাধ্য হয়।

تیسرا □عر:
ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا
اور درویش کی دعا کیا ہے

তিসরা শের:
হাঁ ভলা কর তেরা ভলা হোগা
আওর দরবেশ কী দুয়া ক্যা হ্যায়

(হ্যাঁ, ভালো করো, তোমার ভালো হবে। আর দরবেশের প্রার্থনা কী?)

এই শেরটি ব্যঙ্গাত্মক। প্রথম পঙ্ক্তি: 'ভালো করো, তোমার ভালো হবে' এটি এক সরল নীতিকথার মতো শোনায়। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্ক্তি: 'আর দরবেশের প্রার্থনা কী?' এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গালিব পুরো নীতিকথাটিকেই প্রশ্ন করছেন। দরবেশ (ফকির, সাধু) তো প্রার্থনাই করে; কিন্তু সেই প্রার্থনায় কী হয়? প্রায়ই কিছু হয় না। তাহলে 'ভালো করো, ভালো হবে' এই কথাটিও কি তেমনই এক অর্থহীন প্রার্থনা? শেরের ব্যঙ্গ এখানেই।

چوتھا □عر:
غالبؔ، ہم نے بہت کچھ دیکھا
پر کیا دیکھا کہ دیکھا کیا ہے

চৌথা শের:
'গালিব', হম নে বহুত কুছ দেখা
পর ক্যা দেখা কে দেখা ক্যা হ্যায়

(হে গালিব, আমরা অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু কী দেখেছি, তা কী দেখার মতো?)

এই শেরে গালিব জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে এক চরম সংশয়ে ফেলে দিচ্ছেন। 'বহুত কুছ দেখা' (অনেক কিছু দেখেছি) কিন্তু 'ক্যা দেখা কে দেখা ক্যা হ্যায়' (কী দেখেছি, তা কী দেখার মতো?) অর্থাৎ, যা দেখেছি, তার কোনো মূল্য আছে কি? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গালিব জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার অর্থ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন।

গজল ৫: "বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে..." (জগতের নশ্বরতা ও মানবজীবনের তুচ্ছতা)

مطلع:
بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

মাতলা:
বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

এটি গালিবের দার্শনিক গজলগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এখানে তিনি জগৎকে 'বাজীচা-এ-আতফাল' (শিশুদের খেলাঘর) বলে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, জগতের সব ঘটনা, সব গুরুত্ব, সব লাভ-ক্ষতি আসলে শিশুদের খেলার মতোই তুচ্ছ ও অর্থহীন। এবং এই তামাশা 'মেরে আগে' (আমার সামনে) ঘটছে কবি নিজেকে এই খেলার বাইরে রেখেছেন, এক দর্শক হিসেবে। এটি গালিবের নৈর্ব্যক্তিক দর্শনের চরম প্রকাশ।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ লিখেছেন: "এই গজলটি গালিবের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির এক অনন্য নিদর্শন। এতে তিনি জগতের সমস্ত ঘটনাকে এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখেছেন, এবং এই দৃষ্টিই তাঁকে সেই গভীর প্রশান্তি দিয়েছে, যা তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৪০)

دوسرا □عر:
ایک کھیل ہے اورنگِ سلیماں مرے نزدیک
ایک با□ ہے اعجازِ مسیحا مرے آگے

দুসরা শের:
এক খেল হ্যায় আওরঙ্গ-এ-সুলায়মাঁ মেরে নজদিক
এক বাত হ্যায় এজাজ-এ-মসীহা মেরে আগে

(সুলায়মানের সিংহাসন আমার কাছে এক খেলা, মসীহের অলৌকিক ক্ষমতা আমার সামনে এক কথা।)

এই শেরটি মাতলার দর্শনকেই আরও এগিয়ে নিচ্ছে। সুলায়মান (সলোমন) এর সিংহাসন যা ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের চরম প্রতীক তা গালিবের কাছে 'এক খেল' (একটি খেলা) মাত্র। যিশুখ্রিস্ট (মসীহ)-এর অলৌকিক ক্ষমতা (মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে দৃষ্টি দেওয়া) তা গালিবের কাছে 'এক বাত' (একটি কথা) মাত্র। অর্থাৎ, জগতের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা, সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য, সবচেয়ে বড় অলৌকিকতাও গালিবের কাছে তুচ্ছ, কারণ তিনি সবকিছুকে 'খেলা' ও 'তামাশা' হিসেবে দেখতে শিখেছেন।

تیسرا □عر:
ہوتا جسے یقیں ہے، نہیں ہوتا بے یقیں وہ
کہتا ہے یہ جہاں، جسے دیکھا مرے آگے

তিসরা শের:
হোতা জিসে ইয়াকিন হ্যায়, নহীঁ হোতা বে-ইয়াকিন ওহ
কহতা হ্যায় ইয়ে জাহাঁ, জিসে দেখা মেরে আগে

(যার বিশ্বাস আছে, সে সংশয়হীন হয় না। এই জগৎ বলে, যাকে দেখেছি আমার সামনে।)

এই শেরটি বিশ্বাস ও সংশয়ের এক জটিল সম্পর্ক প্রকাশ করছে। প্রথম পঙ্ক্তি: 'যার বিশ্বাস আছে, সে সংশয়হীন হয় না' এটি একটি প্যারাডক্স। সাধারণত মনে করা হয়, বিশ্বাস নাকি সংশয় দূর করে। কিন্তু গালিব বলছেন, সত্যিকারের বিশ্বাস কখনো সংশয়হীন হয় না; বরং, বিশ্বাসের সঙ্গেই সংশয় চলে আসে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি: 'এই জগৎ বলে, যাকে দেখেছি আমার সামনে' জগৎ যেন এক সাক্ষী, যে বলছে, "আমি যা দেখেছি, তাই সত্য।" কিন্তু গালিব আগেই বলেছেন, জগৎ তো 'বাজীচা-এ-আতফাল' শিশুদের খেলাঘর। তাহলে জগতের সাক্ষ্যের মূল্য কতটুকু?

چوتھا□عر:
بندہ نواز جو کہیے، سرِ بندگی کھلے
قصرِ□دا میں بھی ہے دیکھیے، در مرے آگے

চৌথা শের:
বন্দা-নওয়াজ জো কহিয়ে, সর-এ-বন্দেগী খোলে
কসর-এ-খুদা মেঁ ভি হ্যায় দেখিয়ে, দর মেরে আগে

(বান্দা-নওয়াজ (দাসের প্রতি দয়ালু) যাকে বলি, দাসত্বের রহস্য খোলে। ঈশ্বরের প্রাসাদেও আছে দেখুন, দরজা আমার সামনে।)

এই শেরটি গালিবের আত্মবিশ্বাস ও খুদা-ভাবনার এক চমৎকার প্রকাশ। 'বন্দা-নওয়াজ' (দাসের প্রতি দয়ালু) বলতে খুদাকে বোঝানো হয়েছে। 'সর-এ-বন্দেগী খোলে' (দাসত্বের রহস্য খোলে) অর্থাৎ, খুদাকে যখন 'বন্দা-নওয়াজ' বলি, তখন দাসত্বের প্রকৃত অর্থ বোঝা যায়। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি: 'কসর-এ-খুদা মেঁ ভি হ্যায় দেখিয়ে, দর মেরে আগে' ঈশ্বরের প্রাসাদেও (বেহেশ্তেও) দরজা আছে আমার সামনে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের দরবারও আমার জন্য উন্মুক্ত। এটি একই সঙ্গে অহংকার ও বিনয়ের প্রকাশ অহংকার এই অর্থে যে, ঈশ্বরের প্রাসাদের দরজা আমার জন্য খোলা; বিনয় এই অর্থে যে, আমি তো কেবল এক 'বন্দা' (দাস), যার জন্য প্রভুর দরজা খোলা থাকাই যথেষ্ট।

পনেরোটি নির্বাচিত শেরের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ

এখন আমরা গালিবের পনেরোটি নির্বাচিত শেরকে চারটি বিষয়শ্রেণীতে দর্শন, ব্যঙ্গ, প্রেম ও জীবন্ময়তা ভাগ করে বিশ্লেষণ করব।

বিভাগ ক: দর্শন

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

এই শেরটি আমরা ইতিমধ্যে বহুবার উদ্ধৃত করেছি, কিন্তু এর দার্শনিক বিশ্লেষণ অশেষ। প্রথম মিসরায় গালিব সৃষ্টিতত্ত্বের এক গভীর রহস্য উত্থাপন করেছেন কী ছিল যখন কিছুই ছিল না? উত্তর: খুদা ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মিসরায় তিনি বলছেন, "কিছুই না হলে খুদাই হতেন" অর্থাৎ, অস্তিত্ব না থাকলে খুদাও কি অস্তিত্ববান হতে পারেন? এটি এক গভীর ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন। তৃতীয় মিসরায় তিনি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংকটে প্রবেশ করছেন "অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে।" অর্থাৎ, আমার সমস্ত যন্ত্রণার কারণ আমার অস্তিত্ব। শেষ মিসরায় সেই বিখ্যাত প্রশ্ন "আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল?" এই প্রশ্নের মধ্যে একই সঙ্গে নৈরাশ্য ও আত্মমর্যাদাবোধ দুই-ই আছে আমার অস্তিত্ব অর্থহীন, তবু আমার অস্তিত্বই একমাত্র সত্য।

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

এই শেরটিও আমরা পূর্বে দেখেছি। এখানে গালিব জীবন ও দুঃখের অভিন্নতা ঘোষণা করছেন। জীবনই যেহেতু দুঃখ, তাই মৃত্যুর আগে দুঃখ থেকে মুক্তি অসম্ভব। এটি এক গভীর অস্তিত্ববাদী দর্শন জীবন মানেই যন্ত্রণা, এবং যন্ত্রণা মানেই জীবন। এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াই গালিবের দর্শনের মূল শিক্ষা।

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরটির প্যারাডক্স আমরা আগেও বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু এখানে আরেকটি স্তর যোগ করা যায়: গালিবের এই বক্তব্য কেবল দুঃখের মনস্তত্ত্ব নয়, বরং জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশ করে। তিনি দুঃখকে অস্বীকার করেন না, পলায়নও করেন না; বরং দুঃখকে এতটাই গ্রহণ করেন যে, তা আর দুঃখ থাকে না। এটি এক গভীর জীবনদর্শন   জীবনের সব কষ্টকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করাই একমাত্র মুক্তির পথ।

ہم کو معلو□ ہے جنت کی حقیقت لیکن
دل کے □وش رکھنے کو 'غالب' یہ□یال اچھا ہے

হম কো মালুম হ্যায় জান্নত কী হকীকত লেকিন
দিল কে খুশ রাখনে কো 'গালিব' ইয়ে খেয়াল আচ্ছা হ্যায়

(আমরা জানি বেহেশ্তের আসল সত্য, কিন্তু মনকে খুশি রাখার জন্য, হে গালিব, এই ভাবনাটাই ভালো।)

এই শেরে গালিব ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংশয়ের এক সূক্ষ্ম সম্পর্ক প্রকাশ করছেন। 'জান্নত কী হকীকত' (বেহেশ্তের আসল সত্য) আমরা জানি অর্থাৎ, আমরা জানি বেহেশ্ত বলে কিছু নেই, বা থাকলেও তা আমরা জানি না। কিন্তু 'দিল কে খুশ রাখনে কো' (মনকে খুশি রাখার জন্য) এই ভাবনাটাই (বেহেশ্তের ভাবনা) ভালো। অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাস হয়তো সত্য নয়, কিন্তু তা মানুষের মনকে সান্ত্বনা দেয়, তাই তাকে রাখতে দাও। এটি গালিবের সংশয়বাদ ও মানবিকতার একই সঙ্গে প্রকাশ।

বিভাগ খ: ব্যঙ্গ

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

এই শেরে গালিব ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ প্রকাশ করছেন। 'আমরা একেশ্বরবাদী' এটি ইসলামের মূল ঘোষণা। কিন্তু 'আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা' এই বক্তব্যটি প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি আরও তীক্ষ্ণ: 'যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।' অর্থাৎ, সত্যিকারের ঈমান তখনই আসে, যখন সাম্প্রদায়িক বিভেদ মিটে যায়। কিন্তু বাস্তবে তো বিভেদ মিটছে না, বরং বাড়ছে   তাহলে ঈমানের দাবি কতটা সত্য? গালিবের ব্যঙ্গ এখানেই।

کہاں مے□انے کا دروازہ غالبؔ اور کہاں واعظ
پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

কহাঁ ময়-খানে কা দরওয়াজা 'গালিব' আওর কহাঁ ওয়ায়েজ
পর ইতনা জানতে হ্যায় কল ওহ জাতা থা কে হম নিকলে

(কোথায় মদের দোকানের দরজা, হে গালিব, আর কোথায় ধর্মোপদেশক! কিন্তু এতটুকু জানি, কাল সে যাচ্ছিল যখন আমরা বেরিয়ে এলাম।)

এই শেরটি আমরা গজল ১-এর চতুর্থ শের হিসেবে দেখেছি। এখানে ব্যঙ্গের লক্ষ্য 'ওয়ায়েজ' (ধর্মোপদেশক) যিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। গালিব বলছেন, মদের দোকান ও ধর্মোপদেশকের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, এবং তাদের মধ্যে তুলনা অর্থহীন। শেষ পঙ্ক্তির রহস্যময়তা শেরের ব্যঞ্জনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

بندہ پرور کہیے، سرِ بندگی کھلے
قصرِ □دا میں بھی ہے دیکھیے، در مرے آگے

বন্দা-পরওয়ার কহিয়ে, সর-এ-বন্দেগী খোলে
কসর-এ-খুদা মেঁ ভি হ্যায় দেখিয়ে, দর মেরে আগে

(বান্দা-পালক যাকে বলি, দাসত্বের রহস্য খোলে। ঈশ্বরের প্রাসাদেও আছে দেখুন, দরজা আমার সামনে।)

এই শেরটি গজল ৫-এর চতুর্থ শেরের অনুরূপ। এখানে ব্যঙ্গের সুর কম, বরং আত্মমর্যাদাবোধের সুর বেশি। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে যে দাবি 'ঈশ্বরের প্রাসাদেও দরজা আছে আমার সামনে' এটি এক ধরনের সূক্ষ্ম ব্যঙ্গও বটে, কারণ যে সমাজ গালিবকে বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই সমাজের ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশে গালিব বলছেন, "দেখো, ঈশ্বরের দরজাও আমার জন্য খোলা তোমাদের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।"

বিভাগ গ: প্রেম

ہم کو □ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এই শেরটি আমরা বহুবার দেখেছি। এটি প্রেমের অযৌক্তিকতা ও অনিবার্যতার এক চমৎকার প্রকাশ। প্রেমিক জানে, তার আশা পূর্ণ হবে না; তবু সে আশা করে। এই প্যারাডক্সই প্রেমের সংজ্ঞা।

عشر□ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা
দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

(ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া। ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।)

প্রেমের প্রসঙ্গে এই শেরটি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রেমিকের আত্মসমর্পণ, প্রেমাস্পদে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাওয়া এটিই প্রেমের চরম পরিণতি। ফোঁটা যেমন নদীতে মিলিয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে নদী হয়ে যায়, প্রেমিকও তেমন প্রেমাস্পদে বিলীন হয়ে যায়। এই বিলীন হওয়াই প্রেমের পরম সুখ।

درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা
হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

(ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।)

এই শেরে প্রেমের বেদনা এতটাই তীব্র যে, তা হৃদয়কে সম্পূর্ণ ফাঁপা করে দিয়েছে। কিন্তু কবি সবার কাছে লুকোচ্ছেন, এখনো হৃদয় আছে অর্থাৎ, তিনি এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু আসলে হৃদয় তো আর নেই, আছে শুধু গর্ত। এটি প্রেমের বেদনার এক চরম মূর্ত প্রকাশ।

محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا
اُسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ د□ نکلے

মুহব্বত মেঁ নহীঁ হ্যায় ফারাক জীনে আওর মরনে কা
উসি কো দেখ কর জীতে হ্যায় জিস কাফির পে দম নিকলে

(প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা তাকে দেখেই বাঁচি, যে কাফেরের জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়।)

এই শেরটি গজল ১-এর তৃতীয় শের হিসেবে আমরা দেখেছি। প্রেমের প্রসঙ্গে এটি এক চরম অস্তিত্ববাদী বক্তব্য প্রেমে জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য ঘুচে যায়, কারণ প্রেমিকের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই প্রেমাস্পদের ওপর নির্ভরশীল।

বিভাগ ঘ: জীবন্ময়তা

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

এই শেরটি জীবন্ময়তার এক চরম প্রকাশ। গালিব জগতের সব ঘটনাকে এক নৈর্ব্যক্তিক, দূরবর্তী দৃষ্টিতে দেখছেন যেন সবই এক তামাশা, যার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এই দৃষ্টিই জীবন্ময়তা জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এক দর্শকসত্তায় উন্নীত হওয়া। এটি গালিবের শেষ জীবনের দর্শনের সারসংক্ষেপ।

گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

এই শেরে জীবন্ময়তা রয়েছে প্রকৃতির রূপকের মধ্যে। বসন্তের বাতাসকে আহ্বান, ফুলে রং ভরার অনুরোধ এসবই জীবনের প্রতি এক গভীর আসক্তির প্রকাশ। গালিব, যিনি একদিকে জগৎকে 'বাজীচা-এ-আতফাল' বলেন, তিনিই আবার ফুলে রং ভরার আহ্বান জানান। এই দ্বান্দ্বিকতাই তাঁর কাব্যের প্রাণ একই সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিকতা ও জীবন্ময়তা, একই সঙ্গে জগৎকে তামাশা বলা ও তামাশার অংশ হয়ে ওঠা।

ہزاروں □واہشیں ایسی کہ ہر □واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

জীবন্ময়তার প্রসঙ্গে এই শেরের অর্থ বদলে যায়। এখানে জীবনের প্রতি এক গভীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে হাজারো খ্বাহিশ, হাজারো আরমান। যদিও পূর্ণ হয়নি, তবু চাওয়ার মধ্যে যে প্রাণশক্তি, তাই জীবন্ময়তা। গালিব কখনো নৈরাশ্যবাদী নন তিনি জীবনকে চান, আকাঙ্ক্ষা করেন, আরমান পোষণ করেন। পূর্ণ না হলেও, এই চাওয়াটাই তাঁর কাছে বড়।

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

এই শেরটি আমরা ব্যঙ্গ বিভাগেও দেখেছি। কিন্তু জীবন্ময়তার প্রসঙ্গে এর অর্থ ভিন্ন। এখানে গালিব ধর্মীয় রীতিনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এক প্রাণবন্ত, স্বাধীন মানবিকতার কথা বলছেন। 'তারক-এ-রসুম' (রীতিনীতি ত্যাগ) করাই যখন ধর্ম হয়, তখন জীবন হয়ে ওঠে স্বাধীন, বন্ধনমুক্ত, প্রাণবন্ত। এই স্বাধীনতাই জীবন্ময়তা যেখানে মানুষ নিজেই নিজের ধর্ম, নিজেই নিজের খুদা।

কাব্যের অফুরন্ত খনি

গালিবের গজল ও শেরগুলির এই বিশ্লেষণ শেষ করে একটি কথা স্পষ্ট হয়: গালিবের কাব্য এক অফুরন্ত খনি, যার প্রতিটি স্তরে নতুন অর্থ লুকিয়ে আছে। আমরা এখানে পাঁচটি গজল ও পনেরোটি শেরের বিশ্লেষণ করেছি, কিন্তু এটি কেবল একটি সূচনা মাত্র। গালিবের সম্পূর্ণ দিওয়ানে রয়েছে আরও অসংখ্য রত্ন, যেগুলির প্রতিটি নিজেই একটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের কাব্য নিয়ে যত লেখা হয়েছে, আরও লেখা যাবে কারণ তাঁর প্রতিটি শেরই এক একটি রহস্য, যার সমাধান কখনো চূড়ান্ত হয় না। প্রতিটি পাঠক, প্রতিটি প্রজন্ম এই রহস্যের নতুন ব্যাখ্যা দেবে, এবং তাতেও রহস্য শেষ হবে না।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৫০)

নির্বাচিত শের: বিশ্লেষিত গজল ও শেরের সংকলন

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

عشر□ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা
দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

(ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া। ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।)

گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آ□ر اس درد کی دوا کیا ہے

দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়?
আখির ইস দর্দ কী দাওয়া ক্যা হ্যায়?

(হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এই ব্যথার ঔষধ কী?)

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনার সামনে গালিবের কাব্যের যে বিশাল ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে, তা থেকে আপনি নিজের পছন্দমতো কিছু গজল বা শের বেছে নিয়ে নিজেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে পারেন। গালিবের কাব্য কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং ধীরে ধীরে, শব্দে শব্দে, অর্থে অর্থে উপলব্ধি করার জন্য। প্রতিটি শেরের অন্তত তিনটি করে অর্থ বের করার চেষ্টা করুন একটি সরল, একটি দার্শনিক, একটি ব্যক্তিগত। দেখবেন, গালিবের কাব্যের সৌন্দর্য ও গভীরতা আপনার কাছে ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের দর্শন ও বিশ্বদৃষ্টির জগতে সেই জগতে যেখানে তিনি খুদা, প্রেম, সৌন্দর্য, দুঃখ, সময় ও মৃত্যু সম্পর্কে কী ভাবতেন, এবং কীভাবে এই ভাবনাগুলি তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছিল। আমরা দেখব, কেন গালিবকে একই সঙ্গে সুফি, সংশয়বাদী, অস্তিত্ববাদী ও আধুনিক বলা হয়, এবং এই সবকটি পরিচয় কীভাবে এক মহান কবির মধ্যে একাত্ম হয়ে উঠেছিল।

পর্ব ৪: দর্শন ও বিশ্বদৃষ্টি

কবিতা শুধু আবেগের নিঃসরণ নয়, বরং তা এক সুসংহত চিন্তারও প্রকাশ যদিও সেই চিন্তা অনেক সময় আবেগের আড়ালে, রূপকের আড়ালে, ইহামের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। গালিবের কাব্যের গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাই, সেখানে কেবল প্রেম-বেদনা-হাসি-কান্না নয়, বরং এক সুসংহত, জটিল ও মৌলিক বিশ্বদৃষ্টিও কাজ করছে। এই বিশ্বদৃষ্টি একক কোনো ধর্মীয় বা দার্শনিক গোত্রের অনুসারী নয়; বরং তা বহু ধারার সম্মিলনে গড়া এক স্বতন্ত্র দর্শন। গালিব একই সঙ্গে সুফি ও সংশয়বাদী, আস্তিক ও নাস্তিকের সীমানায় দাঁড়ানো, ভাগ্যবাদী ও মানবাত্মার মহিমায় বিশ্বাসী।

পর্ব ৪-এ আমরা এই দর্শন ও বিশ্বদৃষ্টির তিনটি প্রধান দিক পর্যালোচনা করব। প্রথম অধ্যায়ে (অধ্যায় ১৫) আমরা দেখব গালিবের খুদা-ভাবনা কীভাবে তিনি একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সমালোচক এবং সুফি সর্বেশ্বরবাদের অনুসারী ছিলেন; কীভাবে তাঁর খুদা 'খুদা-এ-বেতালব' যিনি ইবাদত চান না; এবং কীভাবে তিনি খুদা ও মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অধ্যায় ১৬) আমরা দেখব গালিবের প্রেম ও সৌন্দর্যতত্ত্ব ইশ্ক-এ-হকিকি ও ইশ্ক-এ-মিজাজির দ্বান্দ্বিকতা, নারীর প্রতি দৃষ্টি, দেহ ও আত্মার সম্পর্ক। তৃতীয় অধ্যায়ে (অধ্যায় ১৭) আমরা দেখব গালিবের দুঃখবোধ ও জীবনানন্দ কীভাবে তিনি নৈরাশ্য ও প্রাণবাদকে একই সঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এবং চতুর্থ অধ্যায়ে (অধ্যায় ১৮) আমরা দেখব সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতা সম্পর্কে গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি।

এই পর্বের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা গালিবের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, সমসাময়িক ও পরবর্তী গবেষকদের মতামত বিশ্লেষণ করে, এবং দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে গালিবের চিন্তার সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর বিশ্বদৃষ্টির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকার চেষ্টা করব। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "গালিবের কাব্য কেবল শিল্প নয়, বরং এক জীবনদর্শনও। যে পাঠক এই দর্শনকে বুঝতে পারেন না, তিনি গালিবের কাব্যের গভীরতম স্তর থেকে বঞ্চিত থাকেন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৬০)

অধ্যায় ১৫: গালিবের খুদা-ভাবনা

যে খুদা ইবাদত চান না

খুদা-ভাবনা মানবচিন্তার সবচেয়ে প্রাচীন ও গভীরতম বিষয়গুলির একটি। প্রত্যেক মহৎ কবিই কোনো না কোনোভাবে খুদাকে নিয়ে ভেবেছেন, খুদাকে নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু গালিবের খুদা-ভাবনা এতটাই স্বতন্ত্র, এতটাই জটিল ও এতটাই পরস্পরবিরোধী যে, তাকে সহজে কোনো একটি পরিচিত ধর্মীয় বা দার্শনিক গোত্রে ফেলা যায় না। গালিব একই সঙ্গে আস্তিক ও সংশয়বাদী, সুফি ও স্বাধীনচেতা, ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত ও ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহী। এই জটিলতা ও বহুমাত্রিকতাই তাঁর খুদা-ভাবনাকে এত আকর্ষণীয় ও গভীর করেছে।

খলিলুর রহমান আজমি যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের খোদা-শনাসি (খুদা-জ্ঞান) উর্দু কাব্যের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। তিনি একই সঙ্গে মোল্লার খোদা ও সুফির খোদা দুটোকেই অস্বীকার করেছেন, আবার দুটোকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর খোদা এমন এক সত্তা, যিনি ইবাদত চান না, বরং মানুষের স্বাধীনচেতা আত্মার সঙ্গেই যাঁর প্রকৃত সম্পর্ক।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৬০)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের খুদা-ভাবনার তিনটি প্রধান দিক পর্যালোচনা করব। প্রথমত, দেখব কীভাবে গালিব আনুষ্ঠানিক ধর্ম, নামাজ-রোজা ও মোল্লা-ওয়ায়েজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, এবং কীভাবে তিনি নিজেকে 'মওহেদ' (একেশ্বরবাদী) দাবি করেও 'তারক-এ-রসুম' (রীতিনীতি ত্যাগ)-কেই নিজের ধর্ম বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেখব কীভাবে সুফি দর্শন, বিশেষ করে ইবনে আরাবির 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ) তত্ত্ব, গালিবের খুদা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল, এবং কীভাবে তিনি 'না-খুদা' (খুদাহীনতা) ধারণাকে এক নতুন অর্থ দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, দেখব কীভাবে গালিব খুদা ও মানবাত্মার মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, যেখানে মানুষ তার স্বাধীনচেতা আত্মার জোরে ঈশ্বরের সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

সংশয়বাদী আস্তিক

আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি উদাসীনতা

গালিবের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও, তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কেউ তাঁকে 'নাস্তিক' বলেছেন, কেউ বলেছেন 'ফাসিক' (ধর্মচ্যুত), কেউ বা 'মুনাফিক' (ভণ্ড)। কিন্তু এই অভিযোগগুলি কতটা সত্য? গালিব কি সত্যিই নাস্তিক ছিলেন? না কি তিনি ছিলেন এক ভিন্ন ধরনের আস্তিক, যিনি প্রথাগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে প্রত্যাখ্যান করতেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন?

গালিবের নিজের লেখা থেকে আমরা যে চিত্র পাই, তাতে স্পষ্ট হয়, তিনি নিজেকে কখনো নাস্তিক বলে দাবি করেননি। বরং তিনি নিজেকে 'মওহেদ' (একেশ্বরবাদী) বলেছেন, যা ইসলামের মূল বিশ্বাসেরই অংশ। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মের রীতিনীতি নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে ছিলেন গভীরভাবে উদাসীন, কখনো কখনো সমালোচকও। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এসব তো দেহের ইবাদত। আত্মার ইবাদত কী, তা কেউ জানে না। আমি দেহের ইবাদত করতে পারি না, কারণ দেহ তো একদিন মাটি হবে। আত্মার ইবাদত করতে চাই, কিন্তু তার নিয়ম কেউ শেখায়নি।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৪৭০)

রালফ রাসেল এই উক্তি সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব এখানে ধর্মকে অস্বীকার করছেন না, বরং ধর্মের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে প্রশ্ন করছেন। তিনি চাইছেন এমন এক ইবাদত, যা আত্মার, দেহের নয়। কিন্তু এমন ইবাদতের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই, এবং সেই কারণেই গালিবকে ধর্মীয় সমাজ 'নাস্তিক' বা 'ফাসিক' বলে চিহ্নিত করত।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৭১)

গালিবের ধর্মীয় উদাসীনতার পেছনে একটি কারণ ছিল তাঁর সংশয়বাদী মন। তিনি কোনো কিছুই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারতেন না তাঁর কাছে প্রতিটি বিশ্বাসকেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কারণ খুদা ছাড়া জগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু খুদা কী, কেমন, কী চান এসব আমি জানি না। আর যাঁরা বলেন, 'আমরা জানি', তাঁদের আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, খুদা যদি এত সহজে জানা যেত, তাহলে এত ধর্ম, এত মত, এত বিরোধ কেন?" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৫৬৫)

মোল্লা ও ওয়ায়েজের প্রতি ব্যঙ্গ

গালিবের ধর্মীয় সমালোচনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল মোল্লা ও ওয়ায়েজ অর্থাৎ ধর্মীয় পণ্ডিত ও উপদেশকেরা, যাঁরা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেন। গালিবের কাব্যে ও চিঠিপত্রে মোল্লা-ওয়ায়েজের প্রতি অসংখ্য ব্যঙ্গ ছড়িয়ে আছে।

তাঁর একটি বিখ্যাত শের:

کہاں مے □انے کا دروازہ غالبؔ اور کہاں واعظ
پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

কহাঁ ময়-খানে কা দরওয়াজা 'গালিব' আওর কহাঁ ওয়ায়েজ
পর ইতনা জানতে হ্যায় কল ওহ জাতা থা কে হম নিকলে

(কোথায় মদের দোকানের দরজা, হে গালিব, আর কোথায় ধর্মোপদেশক! কিন্তু এতটুকু জানি, কাল সে যাচ্ছিল যখন আমরা বেরিয়ে এলাম।)

এই শেরে 'ময়-খানা' (মদের দোকান) ও 'ওয়ায়েজ' (ধর্মোপদেশক)-এর মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা গালিবের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। ময়-খানা এখানে একই সঙ্গে পার্থিব আনন্দ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কেন্দ্র (সুফি প্রতীক হিসেবে), আর ওয়ায়েজ হল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির প্রতীক। গালিব স্পষ্টই বলছেন, ময়-খানা ও ওয়ায়েজের মধ্যে কোনো তুলনাই হয় না তাদের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা।

আরেকটি বিখ্যাত শের:

واعظ کو ہے □و□ی کہ بڑھے مے کی آبرو
ہم کو ہے غم کہ پیتے ہیں، اور کم ہے زندگی

ওয়ায়েজ কো হ্যায় খুশি কে বঢ়ে মে কী আব্রু
হম কো হ্যায় গম কে পীতে হ্যায়, আওর কম হ্যায় জিন্দেগি

(ওয়ায়েজ খুশি যে, মদের মর্যাদা বাড়ছে। আমাদের দুঃখ যে, খাচ্ছি, আর জীবন কম।)

এখানে ওয়ায়েজ (ধর্মোপদেশক)-এর খুশির কারণ হল, মদের মর্যাদা বাড়ছে অর্থাৎ, মদ যত জনপ্রিয় হবে, ওয়ায়েজের নিন্দার বিষয়ও তত বাড়বে, আর তাতে তার গুরুত্বও বাড়বে। পক্ষান্তরে, কবির দুঃখের কারণ হল, জীবন ক্ষণস্থায়ী, অথচ তাতেও মদ খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই শেরে গালিব একই সঙ্গে ওয়ায়েজের ভণ্ডামি ও জীবনের করুণ পরিহাস দুই-ই প্রকাশ করেছেন।

"হাম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়"

গালিবের ধর্মীয় অবস্থানের সবচেয়ে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ঘোষণা হল এই বিখ্যাত শেরটি, যা আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার উদ্ধৃত করেছি:

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

এই শেরটি গালিবের ধর্মীয় দর্শনের সারসংক্ষেপ। প্রথম পঙ্ক্তিতে তিনি নিজেকে 'মওহেদ' (একেশ্বরবাদী) বলে দাবি করছেন অর্থাৎ, তিনি ইসলামের মূল বিশ্বাস 'তাওহিদ' (একেশ্বরবাদ)-এ বিশ্বাসী। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বলছেন, "আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা।" অর্থাৎ, ধর্মের যে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা সেসব তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন। তাঁর কাছে প্রকৃত ধর্ম হল আত্মার ঈশ্বরে বিশ্বাস, দেহের আনুষ্ঠানিকতা নয়।

দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটি আরও গভীর ও বিপ্লবাত্মক: "যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।" এখানে 'মিল্লতেঁ' (ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি) বলতে ইসলাম, খ্রিস্টান, হিন্দু, ইহুদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। গালিব বলছেন, এই সম্প্রদায়গত বিভেদই প্রকৃত ধর্মের পথে বাধা। যখন এই বিভেদ মিটে যাবে অর্থাৎ, যখন মানুষ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করবে তখনই প্রকৃত ঈমান (বিশ্বাস) প্রতিষ্ঠিত হবে।

নারঙ এই শের সম্পর্কে লিখেছেন: "এই শেরে গালিব একই সঙ্গে ইসলামের মূল বিশ্বাস 'তাওহিদ'-এর প্রতি আনুগত্য ও ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃত একেশ্বরবাদ কেবল ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস নয়, বরং মানবজাতির একত্বেও বিশ্বাস। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভেদ এই একত্বেরই পরিপন্থী।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৭০)

সংশয় ও বিশ্বাসের দ্বান্দ্বিকতা

গালিবের ধর্মীয় অবস্থান বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে, তিনি কখনো সম্পূর্ণ সংশয়বাদী নন, আবার কখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাসীও নন। বরং, তাঁর অবস্থান হল সংশয় ও বিশ্বাসের এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু অন্ধভাবে নয়; তিনি সংশয় করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার পর্যন্ত যান না। এই দ্বান্দ্বিকতাই তাঁর ধর্মীয় চিন্তার মৌলিকতা।

একটি বিখ্যাত শের এই দ্বান্দ্বিকতার পরিচয় দেয়:

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

এই শেরে গালিব একই সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন এবং প্রশ্নও করছেন। প্রথম পঙ্ক্তি: 'যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন' এটি ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্ক্তি: 'কিছুই না হলে খুদাই হতেন' এই বক্তব্যটি কী? যদি কিছুই না থাকে, তাহলে খুদাও কি অস্তিত্ববান হতে পারেন? এটি এক গভীর ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন, যা সহজে উত্তর দেওয়া যায় না।

রাসেল এই শেরের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "গালিব এখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যদি কিছুই না থাকে, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তি কী? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গালিব ধর্মতত্ত্বের এক গভীর রহস্য স্পর্শ করছেন, কিন্তু কোনো সহজ উত্তর দিচ্ছেন না। এই উত্তরহীনতাই তাঁর সংশয়বাদের পরিচায়ক।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৭৫)

সুফি প্রভাব

ওয়াহদাতুল ওজুদ ও ইবনে আরাবির চিন্তাধারা

গালিবের খুদা-ভাবনার ওপর সুফি দর্শনের, বিশেষ করে ইবনে আরাবির 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ) তত্ত্বের, গভীর প্রভাব ছিল। 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' হল এমন এক দার্শনিক তত্ত্ব, যা অনুসারে সমগ্র জগৎ একমাত্র ঈশ্বরেরই প্রকাশ। খুদা ছাড়া আর কিছুই নেই যা কিছু আমরা দেখি, সবই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো প্রকৃত পার্থক্য নেই; মানুষের আত্মা ঈশ্বরেরই অংশ, এবং আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়েই মানুষ খুদাকে জানতে পারে।

গালিবের কাব্যে এই 'ওয়াহদাতুল ওজুদ'-এর প্রতিফলন বারবার পাওয়া যায়। একটি বিখ্যাত শের:

ہے غیبِ غیب جسے سمجھے ہیں ہم، وہ ہے □دا
ہوتا ہے غیبِ غیب، وہ آ□کارا ہو جانا

হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব জিসে সমঝে হ্যায় হম, ওহ হ্যায় খুদা
হোতা হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব, ওহ আশকারা হো জানা

(যাকে আমরা অদৃশ্যের অদৃশ্য মনে করি, সেই হল খুদা। হয় অদৃশ্যের অদৃশ্য, তা প্রকাশিত হয়ে ওঠা।)

এই শেরে গালিব 'গায়েব-এ-গায়েব' (অদৃশ্যের অদৃশ্য) বলতে ইবনে আরাবির 'আল-গায়েব আল-মুতলাক' (চরম অদৃশ্য) তত্ত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ইবনে আরাবির মতে, খুদা তাঁর স্বরূপে একেবারেই অজ্ঞেয় ও অদৃশ্য; কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। গালিবও বলছেন, যাকে আমরা চরম অদৃশ্য মনে করি, সেই খুদাই আবার 'আশকারা' (প্রকাশিত) হয়ে ওঠেন অর্থাৎ, সৃষ্ট জগৎ ঈশ্বরেরই প্রকাশ।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে ওয়াহদাতুল ওজুদের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তিনি বারবার বলেছেন, জগৎ ও খুদা এক, মানুষ ও খুদা এক, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক। এই একত্বের উপলব্ধিই তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৬৫)

আরেকটি শের, যেখানে ওয়াহদাতুল ওজুদের প্রভাব স্পষ্ট:

آئینہ دیکھ اپنی سی □ور□ نظر آئی
تجھ کو کیا فرق ہے، جی میں ہے جو، وہی ہے باہر

আয়না দেখ আপ্নি সি সুরত নজর আয়ি
তুঝ কো ক্যা ফারাক হ্যায়, জি মে হ্যায় জো, ওহি হ্যায় বাহার

(আয়না দেখো, নিজের মতো চেহারা দেখা গেল। তোমার কী পার্থক্য বোঝে, ভেতরে যা আছে, তাই আছে বাইরে।)

এই শেরে 'ভেতরে যা আছে, তাই আছে বাইরে' এই বক্তব্যটি ওয়াহদাতুল ওজুদেরই প্রতিধ্বনি। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ সবই এক সত্তার প্রকাশ।

"না-খুদা" নয়, বরং "খুদা-এ-বেতালব"

গালিবের খুদা-ভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তিনি 'না-খুদা' (খুদাহীনতা) বা নাস্তিক্যের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করলেও, যে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করতেন, তিনি ছিলেন 'খুদা-এ-বেতালব' অর্থাৎ এমন এক খুদা, যিনি ইবাদত চান না। গালিবের কাছে খুদা কোনো স্বৈরাচারী সম্রাট নন, যিনি মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য ও উপাসনা দাবি করেন। বরং, খুদা হলেন এমন এক সত্তা, যিনি নিজেই নিজের মধ্যে পূর্ণ, এবং মানুষের ইবাদত-উপাসনায় তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

এই ধারণাটি গালিব প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন শেরে। একটি বিখ্যাত শের:

بندگی میں بھی وہ آزاد و □ود بیں ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے درِ کعبہ سے گر وا نہ ہوا

বন্দেগী মেঁ ভি ওহ আজাদ-ও-খুদ-বীঁ হ্যায় কে হম
উল্টে ফির আয়ে দর-এ-কাবা সে গর ওয়া না হুয়া

(দাসত্বের মধ্যেও আমরা এত স্বাধীন ও আত্মদর্শী যে, কাবার দরজা থেকে ফিরে আসব, যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হয়।)

এই শেরে গালিব বলছেন, তিনি কাবার দরজায় ভিখারির মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যদি খুদা তাঁর প্রার্থনা না শোনেন, তাহলে তিনি ফিরে আসবেন একই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখেও নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে। এই মনোভাব 'খুদা-এ-বেতালব'-এর ধারণারই প্রকাশ যে খুদা চান না মানুষ তাঁকে ভিক্ষা করুক, বরং চান, মানুষ নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রেখে চলুক।

আজমি এই ধারণা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের খোদা কোনো জালিম বাদশাহ নন, যিনি বন্দেগী (দাসত্ব) চান। বরং তিনি 'খুদা-এ-বেতালব' যিনি চান না, মানুষ তাঁর কাছে লুটিয়ে পড়ুক। গালিবের মতে, প্রকৃত ইবাদত হল নিজের আত্মাকে জাগানো, খুদাকে নিজের ভেতরে খোঁজা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা নয়।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৭০)

মানবাত্মার মাহাত্ম্য: খুদা ও মানুষের প্রতিযোগিতা

গালিবের খুদা-ভাবনার সবচেয়ে বৈপ্লবিক দিক হল, তিনি খুদা ও মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সনাতন ধর্মীয় চিন্তায় মানুষ হল ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত। কিন্তু গালিবের কাব্যে মানুষ এক স্বাধীন সত্তা, যে নিজের আত্মার জোরে ঈশ্বরের সমকক্ষ হয়ে ওঠে, কখনো কখনো খুদাকেও চ্যালেঞ্জ করে।

এই মনোভাবের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে গালিবের সেই বিখ্যাত শেরে, যা আমরা বহুবার উদ্ধৃত করেছি:

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

এখানে গালিব নিজেকে 'আয়না-এ-খুদ-বীন' (আত্মদর্শনের আয়না) বলছেন অর্থাৎ, তিনি নিজের ভেতরে তাকিয়ে নিজেকে জানতে পারেন, এবং এই আত্মজ্ঞানই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি। এই আত্মজ্ঞানের জোরেই তিনি সমাজের অংশ হয়েও সমাজের উর্ধ্বে, এমনকি ঈশ্বরের সঙ্গেও এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারেন।

আরেকটি শের, যেখানে এই প্রতিযোগিতার ভাব আরও স্পষ্ট:

بندہ پرور کہیے، سرِ بندگی کھلے
قصرِ□دا میں بھی ہے دیکھیے، در مرے آگے

বন্দা-পরওয়ার কহিয়ে, সর-এ-বন্দেগী খোলে
কসর-এ-খুদা মেঁ ভি হ্যায় দেখিয়ে, দর মেরে আগে

(বান্দা-পালক যাকে বলি, দাসত্বের রহস্য খোলে। ঈশ্বরের প্রাসাদেও আছে দেখুন, দরজা আমার সামনে।)

এই শেরে গালিব বলছেন, ঈশ্বরের প্রাসাদের (বেহেশ্তের) দরজাও তাঁর জন্য খোলা। এটি একই সঙ্গে অহংকার ও বিনয়ের প্রকাশ অহংকার এই অর্থে যে, ঈশ্বরের দরজাও তাঁর জন্য খোলা; বিনয় এই অর্থে যে, তিনি তো কেবল এক 'বন্দা' (দাস), যার জন্য প্রভুর দরজা খোলা থাকাই যথেষ্ট।

খুদা ও মানুষ: একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক

গালিবের খুদা-ভাবনার সারসংক্ষেপ হল, খুদা ও মানুষের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ধারণা। খুদা একদিকে পরম সত্তা, অন্যদিকে মানুষের আত্মাও এক ক্ষুদ্র খুদা। মানুষ ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত, কিন্তু একই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীও। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই গালিবের ধর্মীয় চিন্তার মৌলিকতা।

রাসেল এই দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে খুদা ও মানুষের সম্পর্ক কখনো প্রভু-ভৃত্যের, কখনো প্রেমিক-প্রেমাস্পদের, কখনো দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর। এই বহুরূপী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গালিব মানবাত্মার মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেননি। এই ভারসাম্যই তাঁর দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৮০)

নারঙ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন: "গালিব খুদা ও মানুষের সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তাঁর আগে উর্দু কাব্যে খুদা হয় ছিলেন ভয়ের পাত্র (মোল্লাদের খোদা), নয় প্রেমের পাত্র (সুফিদের খোদা)। গালিবের খোদা একই সঙ্গে ভয়ের, প্রেমের ও প্রতিযোগিতার পাত্র। এই ত্রিমুখী সম্পর্কই গালিবের খুদা-ভাবনার অনন্যতা।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৭৫)

যে খুদা স্বাধীনতা দেন

গালিবের খুদা-ভাবনার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, খুদাকে পাওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। বরং, প্রকৃত খুদাকে পাওয়া যায় আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, প্রেমের মধ্য দিয়ে, এবং নিজের স্বাধীনচেতা আত্মাকে জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে। গালিবের খুদা 'খুদা-এ-বেতালব' যিনি ইবাদত চান না, বরং চান মানুষের আত্মার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই গালিবের ধর্মীয় চিন্তার মূলমন্ত্র।

গালিবের একটি শের দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে, যেখানে তিনি খুদা ও মানুষের সম্পর্কের সারকথা বলেছেন:

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

নির্বাচিত শের: খুদা-ভাবনার অনুষঙ্গে

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

بندگی میں بھی وہ آزاد و □ود بیں ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے درِ کعبہ سے گر وا نہ ہوا

বন্দেগী মেঁ ভি ওহ আজাদ-ও-খুদ-বীঁ হ্যায় কে হম
উল্টে ফির আয়ে দর-এ-কাবা সে গর ওয়া না হুয়া

(দাসত্বের মধ্যেও আমরা এত স্বাধীন ও আত্মদর্শী যে, কাবার দরজা থেকে ফিরে আসব, যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হয়।)

ہے غیبِ غیب جسے سمجھے ہیں ہم، وہ ہے □دا
ہوتا ہے غیبِ غیب، وہ آ□کارا ہو جانا

হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব জিসে সমঝে হ্যায় হম, ওহ হ্যায় খুদা
হোতা হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব, ওহ আশকারা হো জানা

(যাকে আমরা অদৃশ্যের অদৃশ্য মনে করি, সেই হল খুদা। হয় অদৃশ্যের অদৃশ্য, তা প্রকাশিত হয়ে ওঠা।)

ہم کو معلو□ ہے جنت کی حقیقت لیکن
دل کے □وش رکھنے کو 'غالب' یہ □یال اچھا ہے

হম কো মালুম হ্যায় জান্নত কী হকীকত লেকিন
দিল কে খুশ রাখনে কো 'গালিব' ইয়ে খেয়াল আচ্ছা হ্যায়

(আমরা জানি বেহেশ্তের আসল সত্য, কিন্তু মনকে খুশি রাখার জন্য, হে গালিব, এই ভাবনাটাই ভালো।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের খুদা-ভাবনার জটিলতা ও গভীরতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। গালিব একই সঙ্গে আস্তিক ও সংশয়বাদী, সুফি ও স্বাধীনচেতা। তাঁর খুদা 'খুদা-এ-বেতালব' যিনি ইবাদত চান না, বরং চান মানুষের আত্মার স্বাধীনতা।

এখন আপনি নিজের ধর্মবিশ্বাসের দিকে তাকান। আপনি কি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রীতিনীতি অন্ধভাবে মেনে চলেন, নাকি গালিবের মতো প্রশ্ন করেন? আপনি কি খুদাকে ভয় করেন, নাকি ভালোবাসেন? নাকি, গালিবের মতো, আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে আপনি হয়তো দেখবেন, গালিবের খুদা-ভাবনা কেবল উনিশ শতকের দিল্লির নয়, বরং একুশ শতকের আপনারও প্রাসঙ্গিক।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের প্রেম ও সৌন্দর্যতত্ত্বের জগতে যেখানে আমরা দেখব, কীভাবে গালিব ইশ্ক-এ-হকিকি (আধ্যাত্মিক প্রেম) ও ইশ্ক-এ-মিজাজি (পার্থিব প্রেম)-এর দ্বান্দ্বিকতা থেকে এক অনন্য প্রেমদর্শন সৃষ্টি করেছিলেন, এবং কীভাবে নারী, দেহ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল সমসাময়িক সমাজের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিশীল ও গভীর।

অধ্যায় ১৬: প্রেম, নারী ও সৌন্দর্যতত্ত্ব

প্রেম যেখানে দর্শন হয়ে ওঠে

প্রেম মানবজীবনের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বজনীন অনুভূতি। কিন্তু প্রেমকে নিয়ে যত গভীরভাবে ভাবা যায়, তত কম কবিই ভেবেছেন। অধিকাংশ কবি প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, প্রেমের বেদনা গেয়েছেন, প্রেমের আনন্দে বিভোর হয়েছেন। কিন্তু গালিব প্রেমকে শুধু অনুভবই করেননি, বরং তাকে নিয়ে দর্শন রচনা করেছেন প্রেম কী, কেন হয়, প্রেমাস্পদ কে, প্রেমিকের মনস্তত্ত্ব কী, প্রেমের সৌন্দর্য কী, প্রেমের বেদনাই বা কী এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন তিনি তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "গালিবের প্রেমদর্শন উর্দু কাব্যের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। তিনি প্রেমকে কেবল অনুভূতি হিসেবে নয়, বরং এক অস্তিত্ববাদী জিজ্ঞাসা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৮০)

গালিবের প্রেমদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তিনি ইশ্ক-এ-হকিকি (আধ্যাত্মিক প্রেম) ও ইশ্ক-এ-মিজাজি (পার্থিব প্রেম)-এর মধ্যে কোনো কঠোর পার্থক্য রাখেননি। বরং, এই দুই প্রেমকে তিনি একই মুদ্রার দুই পিঠ হিসেবে দেখেছেন। যে প্রেম একই সঙ্গে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক, দেহী ও আত্মিক, বাস্তব ও কল্পিত সেই প্রেমই গালিবের কাব্যের প্রাণ। একই সঙ্গে, গালিব নারী ও সৌন্দর্য সম্পর্কেও এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন। নারী তাঁর কাব্যে প্রায়ই রূপকের আড়ালে উপস্থিত; দেহ ও শারীরিকতা তিনি অস্বীকার করেননি, বরং তাকে আধ্যাত্মিকতারই একটি স্তর হিসেবে দেখেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের প্রেম, নারী ও সৌন্দর্যতত্ত্বের এই জটিল ও বহুমাত্রিক জগতে প্রবেশ করব।

ইশ্ক-এ-হকিকি ও ইশ্ক-এ-মিজাজি

দুই প্রেমের দ্বান্দ্বিকতা: সুফি ঐতিহ্য ও গালিবের মৌলিকতা

ইসলামী আধ্যাত্মিকতায়, বিশেষ করে সুফি কাব্যে, প্রেমকে প্রধানত দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে: ইশ্ক-এ-মিজাজি (পার্থিব প্রেম) ও ইশ্ক-এ-হকিকি (সত্য বা আধ্যাত্মিক প্রেম)। ইশ্ক-এ-মিজাজি হল মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম তা প্রেমাস্পদ যেই হোক না কেন, এই প্রেম পার্থিব, ইন্দ্রিয়সংবেদী, সসীম। অন্যদিকে ইশ্ক-এ-হকিকি হল ঈশ্বরের প্রতি প্রেম যা আধ্যাত্মিক, চিরন্তন, অসীম। সুফি কবিদের অনেকেই পার্থিব প্রেমকে আধ্যাত্মিক প্রেমের সোপান হিসেবে দেখেছেন মানুষ প্রথমে মানুষকে ভালোবাসে, তারপর সেই ভালোবাসার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রেমে উত্তীর্ণ হয়। এই ধারণাটি ফার্সি ও উর্দু কাব্যে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কিন্তু গালিব এই প্রচলিত দ্বিবিধ প্রেমের ধারণাকে এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন। তিনি ইশ্ক-এ-মিজাজি ও ইশ্ক-এ-হকিকির মধ্যে কোনো স্পষ্ট রেখা টানেননি। বরং, তাঁর কাব্যে এই দুই প্রেম ক্রমাগত একে অপরের মধ্যে মিশে গেছে, কখনো কখনো একে অপরের রূপ ধারণ করেছে। পাঠক যখন গালিবের একটি শের পড়েন, তখন তিনি নিশ্চিত হতে পারেন না, এটি পার্থিব প্রেমের কথা বলছে, না আধ্যাত্মিক প্রেমের। এই দ্ব্যর্থবোধকতাই গালিবের প্রেমদর্শনের মূল শক্তি।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে ইশ্ক-এ-মিজাজি ও ইশ্ক-এ-হকিকির মধ্যে যে দ্ব্যর্থবোধকতা, তা ইচ্ছাকৃত। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর শেরগুলি একই সঙ্গে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দুই স্তরেই পঠিত হোক। এই দ্বিস্তরীয় পাঠই তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান সৌন্দর্য।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৯০)

উদাহরণ হিসেবে একটি শের দেখা যাক:

عشر قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা
দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

(ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া। ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।)

এই শেরটি একই সঙ্গে পার্থিব প্রেম ও আধ্যাত্মিক প্রেম দুই অর্থেই পড়া যায়। ফোঁটা যদি প্রেমিক হয়, আর নদী যদি প্রেমাস্পদ হয়, তাহলে প্রেমাস্পদে বিলীন হওয়াই প্রেমিকের পরম সুখ এটি পার্থিব প্রেমের বর্ণনা। কিন্তু ফোঁটা যদি মানবাত্মা হয়, আর নদী যদি খুদা

হন, তাহলে ঈশ্বরে আত্মবিলোপই পরম সুখ এটি আধ্যাত্মিক প্রেমের বর্ণনা। গালিবের কাব্যের জাদু এই যে, তিনি একই শব্দে দুই অর্থই প্রকাশ করেছেন, এবং পাঠককে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তিনি যে অর্থটি চান, সেই অর্থটি গ্রহণ করবেন।

খলিলুর রহমান আজমি এই দ্ব্যর্থবোধকতা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে প্রেম কখনো পার্থিব, কখনো আধ্যাত্মিক, কখনো একই সঙ্গে দুই-ই। এই দ্ব্যর্থবোধকতা তাঁর ইহামগোই-এর অঙ্গ, এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি প্রেমের যে গভীরতা সৃষ্টি করেছেন, তা উর্দু কাব্যে বিরল।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৮০)

প্রেমাস্পদ কে? খুদা, মানুষ, নাকি জীবনের কোনো বিমূর্ত লক্ষ্য?

গালিবের কাব্যের একটি বড় প্রশ্ন হল: তাঁর প্রেমাস্পদ কে? কোনো নির্দিষ্ট নারী? কোনো কল্পিত প্রেমিকা? খুদা? নাকি জীবনের কোনো বিমূর্ত লক্ষ্য যেমন স্বীকৃতি, অর্থ, সম্মান, কাব্যিক অমরতা? গালিব-গবেষকেরা এ নিয়ে বিস্তর তর্ক করেছেন, কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। কারণ, গালিব নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেমাস্পদের পরিচয় অস্পষ্ট রেখেছেন।

নারঙ এই প্রশ্নের একটি জটিল উত্তর দিয়েছেন: "গালিবের প্রেমাস্পদ কোনো একক সত্তা নয়, বরং এক বহুরূপী প্রতীক। কখনো এই প্রেমাস্পদ খুদা, কখনো কোনো নারী, কখনো গালিবের নিজের কবি-সত্তা, কখনো সমাজের স্বীকৃতি, কখনো মৃত্যু। গালিবের কাব্যের শক্তি এই যে, তিনি প্রেমাস্পদকে কখনো নির্দিষ্ট করেননি ফলে প্রতিটি পাঠকই তাতে নিজের প্রেমাস্পদকে খুঁজে পেতে পারেন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৮৫)

একটি উদাহরণ দেখা যাক:

ہم کو ان سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ
জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

(যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।)

এখানে 'উন' (তারা) কারা? প্রেমাস্পদ? কিন্তু প্রেমাস্পদ কি এমন, যে বিশ্বস্ততা জানে না? তাহলে প্রেমাস্পদ কি নিষ্ঠুর? নাকি নির্দোষ? নাকি 'উন' বলতে খুদাকে বোঝানো হয়েছে যিনি বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানেন না, কারণ তিনি এর ঊর্ধ্বে? নাকি 'উন' বলতে সমাজকে বোঝানো হয়েছে যে সমাজ কবির প্রতি কখনো বিশ্বস্ত ছিল না, তবু কবি সেই সমাজের স্বীকৃতি চান? এই সব প্রশ্নের উত্তর গালিব দেননি, এবং না দেওয়াই তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য।

প্রেমের বেদনা ও তার রহস্য

গালিবের প্রেমদর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, প্রেমের বেদনা সম্পর্কে তাঁর ধারণা। সনাতন প্রেমকাব্যে বেদনা হল প্রেমের অনিবার্য পরিণাম প্রেমিক কষ্ট পায়, এবং এই কষ্টই প্রেমের প্রমাণ। কিন্তু গালিব এই বেদনাকে আরও গভীর, আরও জটিল করে তুলেছেন। তাঁর কাছে প্রেমের বেদনা কেবল কষ্ট নয়, বরং তা এক ধরনের আনন্দও বটে। যে বেদনা প্রেমিককে প্রেমাস্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে বেদনা প্রেমিকের অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, সেই বেদনা কি সত্যিই কেবল কষ্ট, নাকি এক ধরনের পরিতৃপ্তিও?

একটি বিখ্যাত শের:

درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা
হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

(ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।)

এই শেরে প্রেমের বেদনা এতটাই তীব্র যে, তা হৃদয়কে সম্পূর্ণ ফাঁপা করে দিয়েছে বুকে এখন কেবল গর্ত। কিন্তু কবি সবার কাছে লুকোচ্ছেন, এখনো হৃদয় আছে অর্থাৎ, তিনি এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু কেন লুকোচ্ছেন? হয়তো এই কারণে যে, প্রেমের বেদনা তাঁর

কাছে এতটাই মূল্যবান যে, তা হারাতে চান না। যদি সবাই জানে যে তাঁর হৃদয় আর নেই, তাহলে প্রেমের বেদনাও শেষ হয়ে যাবে আর সেই বেদনার সঙ্গেই তো জড়িয়ে আছে প্রেমাস্পদের স্মৃতি, যা-ই তাঁর একমাত্র সম্বল।

রাসেল এই শের সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব এখানে প্রেমের বেদনার এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। প্রেমিক নিজের বেদনাকে লুকোতে চান, কারণ তা প্রকাশ করলে বেদনা কমে যেতে পারে   আর বেদনা কমে গেলে প্রেমেরও শেষ। অর্থাৎ, প্রেমিক চান তাঁর বেদনা চিরস্থায়ী হোক, কারণ বেদনাই তাঁর প্রেমের একমাত্র প্রমাণ।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৪৯৫)

প্রেম ও মৃত্যুর সম্পর্ক

গালিবের প্রেমদর্শনে প্রেম ও মৃত্যুর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বারবার তিনি বলেছেন, প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর কোনো পার্থক্য নেই। প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়, তখন তার নিজের জীবন-মৃত্যুর জ্ঞান থাকে না। আবার, প্রেমের বেদনা এতটাই তীব্র যে, তা মৃত্যুর চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক অথচ সেই বেদনাই প্রেমিককে বাঁচিয়ে রাখে।

একটি বিখ্যাত শের:

محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا
اُسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ د نکلے

মুহব্বত মেঁ নহীঁ হ্যায় ফারাক জীনে আওর মরনে কা
উসি কো দেখ কর জীতে হ্যায় জিস কাফির পে দম নিকলে

(প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা তাকে দেখেই বাঁচি, যে কাফেরের জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়।)

এই শেরে যে প্যারাডক্স, তা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। প্রেমাস্পদ 'কাফের' (ধর্মচ্যুত, নিষ্ঠুর) তার জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ, প্রেমাস্পদের জন্যই প্রেমিকের মৃত্যু হয়। কিন্তু একই সঙ্গে সেই প্রেমাস্পদকেই দেখে প্রেমিক বেঁচে থাকেন। অর্থাৎ, প্রেমাস্পদ একই সঙ্গে মৃত্যুর কারণ ও জীবনের উৎস। এই প্যারাডক্সের মধ্য দিয়ে গালিব প্রেমের এক গভীর সত্য প্রকাশ করেছেন প্রেমে জীবন ও মৃত্যু আলাদা নয়, বরং একই বৃত্তের দুই অর্ধেক।

প্রেমের মধ্যে স্বাধীনতা ও দাসত্বের দ্বান্দ্বিকতা

গালিবের প্রেমদর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্বাধীনতা ও দাসত্বের দ্বান্দ্বিকতা। প্রেমিক একদিকে প্রেমাস্পদের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত, দাসতুল্য; অন্যদিকে, এই সমর্পণের মধ্যেই প্রেমিক এক অদ্ভুত স্বাধীনতা খুঁজে পায়। কারণ, প্রেমাস্পদের কাছে সমর্পিত হয়ে প্রেমিক জগতের অন্য সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই দ্বান্দ্বিকতা গালিবের কাব্যে বারবার ফিরে এসেছে।

একটি বিখ্যাত শের:

بندگی میں بھی وہ آزاد و ود بیں ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے درِ کعبہ سے گر وا نہ ہوا

বন্দেগী মেঁ ভি ওহ আজাদ-ও-খুদ-বীঁ হ্যায় কে হম
উল্টে ফির আয়ে দর-এ-কাবা সে গর ওয়া না হুয়া

(দাসত্বের মধ্যেও আমরা এত স্বাধীন ও আত্মদর্শী যে, কাবার দরজা থেকে ফিরে আসব, যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হয়।)

এই শেরে 'বন্দেগী' (দাসত্ব) ও 'আজাদ' (স্বাধীন) এর মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতা, তা প্রেমেরই প্রতিফলন। প্রেমিক প্রেমাস্পদের দাস, কিন্তু এই দাসত্ব তাঁকে জগতের অন্যান্য সব দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি এতটাই স্বাধীন যে, কাবার দরজা থেকেও ফিরে আসতে পারেন, যদি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ না হয়। এই স্বাধীনচেতা দাসত্বই গালিবের প্রেমদর্শনের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

নারী চরিত্র ও দেহতত্ত্ব

গজলে নারীর উপস্থিতি: রূপকের আড়ালে সত্তা

গালিবের গজলে নারীর উপস্থিতি একটি জটিল বিষয়। একদিকে, উর্দু-ফার্সি গজলের রীতি অনুযায়ী, প্রেমাস্পদ প্রায়ই পুরুষবাচক সর্বনামে সম্বোধিত হন ফলে অনেক সময় বোঝা যায় না, প্রেমাস্পদ নারী না পুরুষ। অন্যদিকে, গালিব প্রায়ই প্রেমাস্পদকে সনাতন রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন যেমন, প্রেমাস্পদের চুল (জুল্ফ), চোখ (চশম), ভুরু (আব্রু), ঠোঁট (লব) ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনার মাধ্যমে। ফলে, গালিবের গজলে নারী একটি মূর্ত সত্তা হিসেবে না এসে বরং এক রূপকায়িত সত্তা হিসেবে এসেছেন।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, গালিবের কাব্যে নারী অনুপস্থিত বা অবমূল্যায়িত। বরং, গালিব নারীকে এক নতুন ধরনের মর্যাদা দিয়েছেন তিনি নারীকে কেবল দেহ বা সৌন্দর্যের পাত্রী হিসেবে দেখেননি, বরং এক স্বাধীন, রহস্যময় ও শক্তিশালী সত্তা হিসেবে দেখেছেন। খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের গজলে নারী কখনো দাসী নয়, কখনো কেবল ভোগের পাত্রী নয়। বরং, গালিবের প্রেমাস্পদ প্রায়ই এক স্বাধীন, নিষ্ঠুর, রহস্যময়ী সত্তা যাকে পাওয়া যায় না, যাকে বোঝা যায় না, যিনি প্রেমিকের সমগ্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৮৫)

উদাহরণ হিসেবে একটি শের দেখা যাক:

ہنستے ہیں ہم کو دیکھ کے وہ□وخ چشم و زلف
دیوانے جانتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں

হঁসতে হ্যায় হম কো দেখ কে ওহ শোখ চশম ও জুল্ফ
দিওয়ানে জানতে হ্যাঁয়, হমে কাফির সমঝতে হ্যায়

(দেখে আমাদের হাসে সেই চঞ্চল চোখ ও কেশের অধিকারী, আমাদের পাগল মনে করে, কাফের ভাবে।)

এখানে প্রেমাস্পদ 'শোখ চশম ও জুল্ফ' (চঞ্চল চোখ ও কেশের অধিকারী) একজন নারী, যিনি প্রেমিকের দুরবস্থা দেখে হাসেন, তাকে পাগল ও কাফের মনে করেন। এই নারী নিষ্ঠুর, উপহাসকারিণী, কিন্তু একই সঙ্গে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গালিব এই নারীর কাছে পরাজিত হয়েও তাকে অপরাধী করছেন না, বরং তার নিষ্ঠুরতাকেও সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে গ্রহণ করছেন।

দেহ ও শারীরিকতার প্রতি দৃষ্টি

গালিবের কাব্যে দেহ ও শারীরিকতার উপস্থিতি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সনাতন সুফি কাব্যে দেহকে প্রায়ই অবহেলা করা হয়েছে দেহ হল আত্মার কারাগার, যা আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কিন্তু গালিব এই ধারণাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। বরং, তিনি দেহকে আত্মারই একটি রূপ হিসেবে দেখেছেন, কখনো কখনো দেহের মধ্য দিয়েই আত্মার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় বলে ইঙ্গিত করেছেন।

একটি বিখ্যাত শের:

آئینہ دیکھ اپنی سی □ور□ نظر آئی
تجھ کو کیا فرق ہے، جی میں ہے جو، وہی ہے باہر

আয়না দেখ আপ্নি সি সুরত নজর আয়ি
তুঝ কো ক্যা ফারাক হ্যায়, জি মে হ্যায় জো, ওহি হ্যায় বাহার

(আয়না দেখো, নিজের মতো চেহারা দেখা গেল। তোমার কী পার্থক্য বোঝে, ভেতরে যা আছে, তাই আছে বাইরে।)

এই শেরে গালিব 'জি' (অন্তর) ও 'বাহার' (বাহির, দেহ)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখছেন না। ভেতরে যা, বাইরেও তাই অর্থাৎ, দেহ ও আত্মা একই সত্তার দুই প্রকাশ। এই ধারণা সনাতন সুফি দেহ-বিদ্বেষের বিপরীত, এবং গালিবের দেহতত্ত্বের মৌলিকতা এখানেই।

রাসেল এই শের সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব এখানে দেহ ও আত্মার দ্বৈততা অস্বীকার করছেন। তাঁর কাছে দেহ আত্মার কারাগার নয়, বরং আত্মারই আয়না। এই ধারণা গালিবের কাব্যে বারবার ফিরে এসেছে, এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি উর্দু কাব্যে দেহকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫০০)

আরেকটি শের, যেখানে দেহের সৌন্দর্য ও আত্মার সৌন্দর্যের মধ্যে সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে:

گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

এখানে 'গুলোন মে রং ভরে' (ফুলে রং ভরা) বলতে দেহের সৌন্দর্য সৃষ্টির কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য কেবল দৈহিক নয় এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় এক গভীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য, যা ছাড়া 'গুলশন কা কারোবার' (বাগানের কাজকর্ম) অচল। অর্থাৎ, দেহের সৌন্দর্য ও আত্মার সৌন্দর্য একে অপরের পরিপূরক।

স্ত্রী উমরাও বেগম ও গালিবের ব্যক্তিগত জীবন

গালিবের ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্থান সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (অধ্যায় ৬) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি, গালিবের একমাত্র বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন উমরাও বেগম, যাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল দূরত্বপূর্ণ ও অনেকাংশে কর্তব্যসর্বস্ব। গালিবের চিঠিপত্রে উমরাও বেগমের প্রতি যে ক্ষোভ, কৌতুক ও দরদের মিশ্রিত মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে, এই দাম্পত্য সম্পর্ক গালিবের প্রেমের আদর্শ পূরণ করতে পারেনি। যেমনটি বলেছেন নারঙ: "গালিবের দাম্পত্য জীবন ছিল এক কর্তব্যের সম্পর্ক, প্রেমের নয়। যে প্রেমের আদর্শ তিনি তাঁর কাব্যে এঁকেছেন, তা বাস্তবে খুঁজে পাননি। হয়তো এই কারণেই তাঁর কাব্যের প্রেম এতটাই আদর্শিত, এতটাই অসম্ভব কারণ বাস্তবে তা ছিল অনুপস্থিত।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৯০)

কিন্তু গালিবের কাব্যে কি উমরাও বেগমের কোনো প্রতিচ্ছবি নেই? কিছু গবেষক মনে করেন, গালিবের গজলের যে নিষ্ঠুর, উদাসীন, ধর্মভীরু প্রেমাস্পদ তা অনেকাংশেই উমরাও বেগমেরই প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে, যে শেরগুলিতে গালিব প্রেমাস্পদের ধর্মভীরুতা ও নিজের মুক্তচিন্তার দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন, সেগুলির পেছনে উমরাও বেগমের ছায়া আছে বলে অনেকে মনে করেন। যেমন, একটি বিখ্যাত শের:

واعظ کو ہے□و□ی کہ بڑھے مے کی آبرو
ہم کو ہے غم کہ پیتے ہیں، اور کم ہے زندگی

ওয়ায়েজ কো হ্যায় খুশি কে বঢ়ে মে কী আব্রু
হম কো হ্যায় গম কে পীতে হ্যায়, আওর কম হ্যায় জিন্দেগি

(ওয়ায়েজ খুশি যে, মদের মর্যাদা বাড়ছে। আমাদের দুঃখ যে, খাচ্ছি, আর জীবন কম।)

এই শেরে 'ওয়ায়েজ' (ধর্মোপদেশক) কে? কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, এটি উমরাও বেগমেরই প্রতীকী রূপ যিনি ধর্মীয় রীতিনীতির কঠোর অনুসারী এবং স্বামীর মদ্যপান ও মুক্তচিন্তার বিরোধী। যদিও এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়, তবে এটি গালিবের ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্যের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা বোঝার একটি সম্ভাব্য সূত্র দেয়।

অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্তি: গুজব ও সম্ভাবনা

গালিবের জীবনে উমরাও বেগম ছাড়া অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্তি ছিল কি না, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা কৌতূহল ও বিতর্ক আছে। গালিবের চিঠিপত্র ও সমসাময়িক সূত্রে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে ধারণা করা যায়, গালিব হয়তো একাধিক নারীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, যদিও এই আকর্ষণ কতটা শারীরিক, কতটা মানসিক, এবং কতটা কাব্যিক কল্পনা, তা নির্ধারণ করা কঠিন।

একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হল 'চুন্নী' বা 'চুন্নী বাই' নামে এক তাওয়াইফ (কোর্টেসান)-এর। কথিত আছে, গালিব দিল্লির এক তাওয়াইফের প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে কিছু কবিতা লিখেছিলেন। যদিও এই তথ্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি দুর্বল, এবং অনেক গবেষক একে কিংবদন্তি বলে মনে করেন। তবু, গালিবের নিজের কিছু ইঙ্গিত থেকে ধারণা করা যায়, তিনি নারীসঙ্গ পছন্দ করতেন এবং তাওয়াইফদের সাহচর্যে যেতেন।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের জীবনে তাওয়াইফ বা কোর্টেসানদের উপস্থিতি ছিল, এটা অস্বীকার করা যায় না। তখনকার অভিজাত মুসলিম সমাজে তাওয়াইফদের সংস্পর্শে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, বরং সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। গালিবও এই

সংস্কৃতির অংশ ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে এই নারীদের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বরং বলা যায়, তিনি এই নারীদের কাছ থেকে যে অনুভূতি পেয়েছিলেন, তা তিনি তাঁর কাব্যের সর্বজনীন প্রেমিক-প্রেমাস্পদ সম্পর্কের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন।" (আজমি, ১৯৬৯: ৪৯০)

তবে একটি বিষয় স্পষ্ট: গালিবের কাব্যে যে প্রেমাস্পদের ছবি আঁকা হয়েছে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট নারী নন। বরং, তিনি এক কল্পিত, আদর্শিত প্রেমাস্পদ যিনি একই সঙ্গে নিষ্ঠুর ও সুন্দর, দূরবর্তী ও আকর্ষণীয়, বাস্তব ও অলীক। এই প্রেমাস্পদ হয়তো গালিবের জীবনের একাধিক নারীর সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি, নয়তো সম্পূর্ণ কল্পিত এক সত্তা।

তাওয়াইফ সংস্কৃতি ও গালিব

গালিবের সময়ে দিল্লিতে তাওয়াইফ বা কোর্টেসানদের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অবস্থান ছিল। তাঁরা কেবল যৌনকর্মী ছিলেন না, বরং ছিলেন শিল্পী গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, কবি, এবং কখনো কখনো উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতির ধারক-বাহক। অভিজাত পুরুষেরা তাওয়াইফদের মজলিশে যেতেন গান শুনতে, নাচ দেখতে, কবিতা পড়তে। এই তাওয়াইফদের নিয়ে তখনকার অনেক কবিই কবিতা লিখেছেন, এবং এই রীতি ছিল সম্পূর্ণ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য।

গালিবও এই সংস্কৃতির অংশ ছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি তাওয়াইফদের গান শুনতেন, তাঁদের প্রশংসা করতেন, এবং তাঁদের উদ্দেশে কবিতাও লিখেছিলেন। তবে গালিবের কাব্যে তাওয়াইফদের উপস্থিতি সরাসরি নয়, বরং রূপকের আড়ালে। যেমন, 'সাকী' (মদপরিবেশক) প্রায়ই তাওয়াইফের প্রতীক হিসেবে পড়া যায়, যিনি একই সঙ্গে সৌন্দর্য, শিল্প ও আনন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাসেল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গালিবের 'সাকী' একই সঙ্গে তাওয়াইফ, প্রেমাস্পদ, আধ্যাত্মিক গুরু ও খুদা এই বহুরূপী প্রতীকের মধ্য দিয়ে গালিব তাওয়াইফ সংস্কৃতির প্রতি নিজের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫০৫)

নারীর প্রতি গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি: একটি মূল্যায়ন

গালিবের নারী-ভাবনা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয়, তিনি সমসাময়িক সমাজের প্রচলিত নারী-ধারণাকে একই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ও চ্যালেঞ্জ করেছেন। গ্রহণ করেছেন এই অর্থে যে, তাঁর কাব্যে নারী প্রায়ই সনাতন রূপকের (চুল, চোখ, ঠোঁট) মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে, যা তখনকার কাব্যের সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু চ্যালেঞ্জ করেছেন এই অর্থে যে, তিনি নারীকে কেবল দেহ বা সৌন্দর্যের পাত্রী করে রাখেননি, বরং তাঁকে দিয়েছেন এক স্বাধীন, রহস্যময় ও শক্তিশালী সত্তার মর্যাদা।

নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের নারী নিছক প্রেমাস্পদা নন, বরং এক অস্তিত্ববাদী রহস্য। তিনি কেন ভালোবাসেন না, কেন ফিরিয়ে দেন, কেন নিষ্ঠুর হন এসব প্রশ্নের উত্তর গালিব দেননি, এবং না দেওয়াই তাঁর নারী-ভাবনার মৌলিকতা। গালিবের নারী ব্যাখ্যার অতীত, এবং এই ব্যাখ্যাতীততাই তাঁকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৫৯৫)

প্রেম যেখানে জীবনদর্শন

গালিবের প্রেম, নারী ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে এই অধ্যায় শেষ করার সময় আমরা একটি কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারি: গালিব প্রেমকে কেবল অনুভবই করেননি, বরং তাকে নিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন রচনা করেছিলেন। এই দর্শনে প্রেম একই সঙ্গে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক, দেহী ও আত্মিক, আনন্দ ও বেদনা, স্বাধীনতা ও দাসত্বের সম্মিলন। প্রেমাস্পদ একই সঙ্গে খুদা, নারী, সমাজ, এবং জীবনের বিমূর্ত লক্ষ্য। এবং নারী একই সঙ্গে দেহী সৌন্দর্যের আধার ও আধ্যাত্মিক রহস্যের প্রতীক।

গালিবের এই প্রেমদর্শন সমসাময়িক উর্দু কাব্যে বিপ্লব এনেছিল এবং পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আজও, যখন আমরা গালিবের প্রেমের কবিতা পড়ি, তখন আমরা কেবল একজন প্রেমিকের কথা শুনি না, বরং এক দার্শনিকের চিন্তার সঙ্গেও পরিচিত হই যিনি প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনের সবচেয়ে গভীর সত্যগুলিকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন।

নির্বাচিত শের: প্রেম, নারী ও সৌন্দর্যতত্ত্বের অনুষঙ্গে

عشر‌ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা
দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

(ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া। ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।)

محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا
اُسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ د□ نکلے

মুহব্বত মেঁ নহীঁ হ্যায় ফারাক জীনে আওর মরনে কা
উসি কো দেখ কর জীতে হ্যায় জিস কাফির পে দম নিকলে

(প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা তাকে দেখেই বাঁচি, যে কাফেরের জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়।)

درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা
হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

(ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।)

بندگی میں بھی وہ آزاد و □ود بیں ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے درِ کعبہ سے گر وا نہ ہوا

বন্দেগী মেঁ ভি ওহ আজাদ-ও-খুদ-বীঁ হ্যায় কে হম
উল্টে ফির আয়ে দর-এ-কাবা সে গর ওয়া না হুয়া

(দাসত্বের মধ্যেও আমরা এত স্বাধীন ও আত্মদর্শী যে, কাবার দরজা থেকে ফিরে আসব, যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হয়।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের প্রেম, নারী ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে একটি গভীর ধারণা পেয়েছেন। গালিবের প্রেম কেবল আবেগ নয়, বরং এক দর্শন; নারী কেবল দেহ নয়, বরং এক রহস্য; সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক নয়, বরং আত্মারই প্রতিফলন।

এখন আপনি নিজের প্রেমের অভিজ্ঞতার দিকে তাকান। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, আপনার প্রেম কি কেবল পার্থিব, নাকি এর মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক গভীরতা আছে? আপনার প্রেমাস্পদ কি আপনার কাছে কেবল একজন মানুষ, নাকি এক রহস্য, যাকে আপনি কখনো পুরোপুরি বুঝতে পারেন না? গালিবের প্রেমদর্শন আপনাকে এই প্রশ্নগুলি করতে শেখায়, এবং এই প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়েই প্রেম আর কেবল অনুভূতি থাকে না, বরং হয়ে ওঠে এক জীবনজিজ্ঞাসা।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের দুঃখবোধ ও জীবনানন্দের জগতে যেখানে আমরা দেখব, কীভাবে গালিব একই সঙ্গে নৈরাশ্যবাদী ও প্রাণবাদী ছিলেন, কীভাবে তিনি দুঃখকে জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই দুঃখের মধ্যেও এক অদ্ভুত আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন।

অধ্যায় ১৭: দুঃখবোধ ও জীবনানন্দ

যেখানে কাঁটা ও ফুল একত্রে ফোটে

মানুষের জীবনে দুঃখ ও আনন্দ কখনো আলাদা হয়ে আসে না তারা আসে একই সূত্রে গাঁথা, একই নিঃশ্বাসে বাঁধা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই সত্যটি এড়িয়ে চলে; তারা দুঃখ এলে ভেঙে পড়ে, আনন্দ এলে বিভোর হয়, যেন এরা পরস্পরবিরোধী দুই শত্রু। গালিব সেই বিরল মানুষদের একজন, যিনি দুঃখ ও আনন্দের এই সহাবস্থানকে কেবল মেনেই নেননি, বরং তাকে জীবনের মূল সুর হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে দুঃখ আছে গভীর, তীব্র, সর্বগ্রাসী দুঃখ। কিন্তু একই সঙ্গে আছে আনন্দ জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তি, সৌন্দর্যের প্রতি মোহ, সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকার প্রাণপণ আকুতি। এই দুই সুর মিলেই গালিবের কাব্যের অনন্য সংগীত রচিত হয়েছে।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ লিখেছেন: "গালিবের দর্শনের মূল সুর হল দুঃখ ও আনন্দের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান। তিনি কখনো সম্পূর্ণ নৈরাশ্যবাদী নন, আবার কখনো অন্ধ আশাবাদীও নন। তিনি জানেন, জীবন একই সঙ্গে কাঁটা ও ফুল, অন্ধকার ও আলো, বেদনা ও প্রশান্তি। এই জ্ঞানই তাঁকে তাঁর সমসাময়িক কবিদের চেয়ে আলাদা ও মহৎ করেছে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬০৫)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের দুঃখবোধ ও জীবনানন্দের দুই দিক পর্যালোচনা করব। প্রথমে দেখব, কীভাবে ব্যক্তিগত শোক, দারিদ্র্য, প্রতিভার অমর্যাদা ও দিল্লির ধ্বংস এই সবকিছু মিলে গালিবের মধ্যে এক গভীর নৈরাশ্যবাদের জন্ম দিয়েছিল। তারপর দেখব, কীভাবে একই গালিব আবার জীবনের প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত ছিলেন, কীভাবে অন্ধকারের মধ্যেও তিনি আলোর স্ফুরণ দেখতে পেতেন, এবং কীভাবে বিষাদ ও আনন্দের এই সহাবস্থানই তাঁর দর্শনের মূল সুর হয়ে উঠেছিল।

বিষণ্ণতার গভীরতা

ব্যক্তিগত শোক: সন্তানহারা পিতার বেদনা

গালিবের জীবনের সবচেয়ে গভীর দুঃখ ছিল তাঁর সন্তানদের পরপর মৃত্যু। সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু একটিও শৈশব পেরিয়ে বড় হয়ে ওঠেনি। এই শোক যে গালিবের মনে কী গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (অধ্যায় ৬) বিস্তারিত দেখেছি। কিন্তু এখানে সেই শোকের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সন্তানশোক কেবল ব্যক্তিগত বেদনা নয়, বরং তা গালিবের সমগ্র বিশ্বদৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল। যে মানুষ বারবার সন্তানের মুখাগ্নি করেছে, সে মানুষ জীবনের অর্থ, নিয়তির নিষ্ঠুরতা এবং ঈশ্বরের করুণা নিয়ে কীভাবে ভাববে, তা সহজেই অনুমেয়। গালিবের কাব্যে যে গভীর নৈরাশ্য, যে 'বাজীচা-এ-আতফাল' (শিশুদের খেলাঘর) বলে জগৎকে দেখা, তার পেছনে এই সন্তানশোকের অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবেই কাজ করেছিল।

আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "সাত সন্তানের মৃত্যু গালিবের হৃদয়কে এক মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। তিনি জীবনের সেই প্রাথমিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, যা একজন পিতাকে সার্থক করে তোলে। এই বঞ্চনার ছাপ তাঁর কাব্যে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।" (হালী, ১৮৯৭: ১৩২)

গালিব নিজে এক চিঠিতে এই শোকের দার্শনিক রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন: "আমি সাতবার পিতা হয়েছি, সাতবার সন্তানের মুখাগ্নি করেছি। এখন আমি জানি, জীবন কী একটি দীর্ঘ বিদায়ের প্রহর। যাকে ভালোবাসি, সে চলে যায়; যার জন্য অপেক্ষা করি, সে আসে না। এই সত্য জেনেও বেঁচে থাকতে হয় এটাই সবচেয়ে বড় কষ্ট।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ১৮২)

দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট: অভাবের নিয়ত দংশন

গালিবের সারাজীবনের আরেকটি ধ্রুবসঙ্গী ছিল দারিদ্র্য। উচ্চ বংশের গৌরবময় অতীত সত্ত্বেও, গালিবের বাস্তব জীবন ছিল ঋণ, অনটন ও পৃষ্ঠপোষকতার আশায় দ্বারে দ্বারে ঘোরার করুণ কাহিনি। এই অর্থকষ্ট যে কেবল শারীরিক কষ্টই ছিল না, বরং তা ছিল এক গভীর মানসিক যন্ত্রণাও তা বোঝা দরকার। একজন মানুষ, যিনি নিজেকে উচ্চ বংশের তুর্কি সেনানীর উত্তরাধিকারী মনে করেন, যিনি নিজেকে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলে দাবি করেন, তাঁকে যখন অর্থের জন্য পৃষ্ঠপোষকদের কাছে হাত পাততে হয়, তখন তা কেবল দারিদ্র্য নয়, বরং এক চরম আত্মমর্যাদার ক্ষতি।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের দারিদ্র্য ছিল এক দ্বিমুখী যন্ত্রণা একদিকে ক্ষুধা ও অভাব, অন্যদিকে আত্মমর্যাদার ক্ষতি। তিনি যখন পেনশনের জন্য কলকাতা পর্যন্ত গিয়ে গভর্নর-জেনারেলের কাছে আবেদন করছেন, তখন একজন কবির কী মানসিক অবস্থা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর কাব্যের নৈরাশ্যকে গাঢ় করেছিল।" (আজমি, ১৯৬৯: ২৯৫)

গালিবের কাব্যে এই অর্থকষ্টের সরাসরি প্রতিফলন তেমন পাওয়া যায় না, কারণ উর্দু গজলের রীতি তেমন সরাসরি আত্মজৈবনিক প্রকাশকে উৎসাহ দিত না। কিন্তু পরোক্ষভাবে, গালিবের যে শেরগুলিতে 'দিল কে খুশ রাখনে কো' (মনকে খুশি রাখার জন্য) বা 'ইয়ে খেয়াল আচ্ছা হ্যায়' (এই ভাবনাটাই ভালো)-র মতো আত্মসান্ত্বনার সুর আছে, সেগুলির পেছনে এই অর্থকষ্টের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। যখন একজন মানুষ বলে, "বেহেশ্তের আসল সত্য জানি, কিন্তু মনকে খুশি রাখার জন্য এই ভাবনাটাই ভালো," তখন সেই বক্তব্যের পেছনে বাস্তব জীবনের কঠোরতা ও তা থেকে মানসিক পলায়নের প্রয়োজন দুটোই কাজ করে।

প্রতিভার অমর্যাদা: স্বীকৃতির অভাব

গালিবের জীবনের তৃতীয় বড় দুঃখ ছিল তাঁর প্রতিভার অমর্যাদা সমাজ ও সমসাময়িক সাহিত্যজগতের কাছ থেকে প্রাপ্য স্বীকৃতি না পাওয়ার বেদনা। গালিব জানতেন, তিনি একজন মহৎ কবি। কিন্তু সমসাময়িক পাঠক, সমালোচক ও পৃষ্ঠপোষকেরা তাঁকে তেমনভাবে গ্রহণ করেননি। জওকের মতো জনপ্রিয় কবিরা যেখানে মুশায়রায় 'ওয়াহ ওয়াহ' কুড়োচ্ছেন, সেখানে গালিবের জটিল ও দার্শনিক কবিতা সাধারণ শ্রোতার কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাচ্ছিল। এই স্বীকৃতির অভাব গালিবের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিবের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ছিল, তিনি নিজের প্রতিভার মূল্য জানতেন, কিন্তু সমাজ তা জানত না। এই অমিল থেকে যে বেদনার জন্ম হয়েছিল, তা তাঁর কাব্যের একটি প্রধান সুর। যখন তিনি লেখেন 'হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন', তখন তা কেবল আত্মঅহংকার নয়, বরং সমাজের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদও।" (রাসেল, ১৯৬৯: ২৪৮)

এক চিঠিতে গালিব এই অমর্যাদার বেদনা প্রকাশ করে লিখেছিলেন: "আমি এমন এক কবি, যাঁর কবিতা সবাই পড়ে, কিন্তু কেউ কেনে না। আমার গজল মুশায়রায় মুশায়রায় গীত হয়, কিন্তু আমার পেটের আগুন কেউ নেভাতে পারে না। আমি সম্মান পাই, কিন্তু সম্মান দিয়ে তো পেট ভরে না।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৪৭০) এই লেখায় যে তিক্ততা, যে আত্ম-বিদ্রূপ, তা গালিবের দুঃখবোধেরই প্রকাশ।

দিল্লির ধ্বংস: এক সভ্যতার পতন

গালিবের জীবনের সবচেয়ে বড় সামষ্টিক দুঃখ ছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও তার পরিণতিতে দিল্লির ধ্বংস। যে দিল্লিকে ভালোবেসে তিনি স্বদেশ বলে বরণ করেছিলেন, যে লালকেল্লার দরবারে তিনি রাজকবি নিযুক্ত হয়েছিলেন, যে বল্লিমারানের হাভেলিতে তিনি স্বপ্ন বুনেছিলেন সেই দিল্লি ১৮৫৭ সালে এক ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে 'মৃত নগরী'তে পরিণত হয়েছিল। এই ধ্বংসের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গালিব যে বেদনা অনুভব করেছিলেন, তা ছিল কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং এক সমগ্র সভ্যতার পতনের শোক।

গালিবের চিঠিগুলিতে এই শোকের গভীরতা বারবার ফুটে উঠেছে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "দিল্লি এখন এক মৃত নগরী। যে বাজারগুলি একসময় জমজমাট ছিল, সেগুলি এখন ধ্বংসস্তূপ। যে হাভেলিগুলিতে একসময় সংস্কৃতির আসর বসত, সেগুলি এখন ইংরেজ সেনাদের ব্যারাক। আমার বন্ধুরা হয় মৃত, নয় পালিয়ে গেছে। আমি একা, একেবারে একা একটি ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৩৮)

এই সমষ্টিগত শোক গালিবের ব্যক্তিগত দুঃখবোধকে আরও গভীর করেছিল। এর আগে তিনি ব্যক্তিগত শোক, দারিদ্র্য ও অমর্যাদার বেদনা ভোগ করছিলেন; ১৮৫৭-র পর তিনি দেখলেন, তাঁর সমগ্র জগৎটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। যে সভ্যতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কবিতা লিখতেন, সেই সভ্যতাই আর নেই। এই উপলব্ধি থেকে জন্ম নিয়েছিল গালিবের সেই বিখ্যাত নৈর্ব্যক্তিকতা "বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে।"

নারঙ এই ধ্বংসের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন: "১৮৫৭ সালের ধ্বংস গালিবের জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল। এর আগে তিনি ব্যক্তিগত দুঃখ ভোগ করছিলেন; এর পর তিনি দেখলেন, ব্যক্তিগত দুঃখ তো কিছুই নয়, সমগ্র সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই উপলব্ধি থেকে যে গভীর নৈরাশ্যের জন্ম হয়েছিল, তা-ই গালিবের পরিণত কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬১০)

নৈরাশ্যবাদ: কাব্যে তার প্রকাশ

উপরোক্ত চারটি বড় দুঃখ ব্যক্তিগত শোক, দারিদ্র্য, প্রতিভার অমর্যাদা ও দিল্লির ধ্বংস মিলে গালিবের মধ্যে এক গভীর নৈরাশ্যবাদের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু এই নৈরাশ্যবাদ কখনো সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে পর্যবসিত হয়নি। বরং, গালিব এই নৈরাশ্যকে এক দার্শনিক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে তা আর কেবল হতাশা নয়, বরং এক জীবনদর্শন হয়ে উঠেছে।

গালিবের নৈরাশ্যবাদের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সেই সব শেরে, যেখানে তিনি জগৎকে 'তামাশা', 'খেলাঘর' বা 'কারাগার' বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন:

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے ب و روز تما ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

এই শেরে গালিব জগতের সব ঘটনা, সব গুরুত্ব, সব লাভ-ক্ষতিকে এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখছেন। জগৎ শিশুদের খেলাঘর অর্থাৎ, তুচ্ছ, অর্থহীন, ক্ষণস্থায়ী। এবং এই তামাশা 'মেরে আগে' (আমার সামনে) ঘটছে কবি নিজেকে এই খেলার বাইরে রেখেছেন, এক দর্শক হিসেবে। এই দর্শক-সত্তাই গালিবের নৈরাশ্যবাদের চূড়ান্ত রূপ যখন মানুষ জগতের সব ঘটনা থেকে নিজেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যে, সবই তাকে তামাশা বলে মনে হয়।

আরেকটি শের:

قید حیا و بند غم، ا ل میں دونوں ایک ہیں
مو سے پہلے آدمی غم سے نجا پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

এই শেরে জীবনকে সরাসরি 'কারাগার' এবং দুঃখকে 'বন্ধন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং দুই-ই এক জীবন মানেই দুঃখ, দুঃখ মানেই জীবন। এই চরম নৈরাশ্যবাদের পর দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে গালিব প্রশ্ন করছেন "মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিচ্ছেন না, কারণ উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই জীবনই তো দুঃখ, তাই মুক্তি অসম্ভব।

রাসেল এই নৈরাশ্যবাদ সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের নৈরাশ্যবাদ কোনো পলায়ন বা আত্মহত্যার পথ নয়, বরং এক দার্শনিক অবস্থান। তিনি জীবনের দুঃখকে অস্বীকার করেন না, বরং তাকে স্বীকার করে নেন, এবং সেই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই এক ধরনের প্রশান্তি অর্জন করেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫২০)

নৈরাশ্যবাদ ও নিয়তিবাদ

গালিবের নৈরাশ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁর নিয়তিবাদ অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে, ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে, এবং মানুষ তা পরিবর্তন করতে পারে না। এই নিয়তিবাদ গালিবের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল। যখন একজন মানুষ দেখেন, বারবার চেষ্টা করেও তিনি পেনশন পান না, স্বীকৃতি পান না, সন্তান বাঁচাতে পারেন না তখন তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই নিয়তিবাদের জন্ম হয়।

গালিবের নিয়তিবাদের একটি প্রকাশ:

رنج سے وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরে গালিব নিয়তির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করছেন। তিনি দুঃখকে পরিবর্তন করতে চান না, বরং দুঃখের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে তাকে 'মিটিয়ে' দিতে চান। এটি নিয়তিবাদের এক চরম রূপ যখন মানুষ নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই না করে, বরং নিয়তিকে মেনে নিয়েই শান্তি খোঁজে।

অন্ধকারে আলোর স্ফুরণ

জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তি: নৈরাশ্যের বিপরীত মেরু

কিন্তু গালিবের কাব্যকে যদি আমরা শুধু নৈরাশ্যবাদ ও নিয়তিবাদের কাব্য বলে চিহ্নিত করি, তাহলে আমরা গালিবের অর্ধেক সত্যকেও দেখতে পাব না। কারণ, একই গালিব আবার জীবনের প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত ছিলেন। তিনি জীবনকে ভালোবাসতেন তার রঙ, তার রস, তার সৌন্দর্য, তার বেদনা, সবকিছুকে। যে মানুষ জগৎকে 'বাজীচা-এ-আতফাল' (শিশুদের খেলাঘর) বলেন, সেই মানুষই আবার ফুলে রং ভরার আহ্বান জানান, বসন্তের বাতাসকে ডাকেন, প্রেমাস্পদের জন্য কাঁদেন। এই দ্বান্দ্বিকতাই গালিবের চরিত্র ও কাব্যের সবচেয়ে বড় রহস্য।

খলিলুর রহমান আজমি এই দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব একই সঙ্গে নৈরাশ্যবাদী ও প্রাণবাদী। তিনি যেমন জগৎকে তামাশা বলেন, তেমনই সেই তামাশার প্রতিটি মুহূর্তকে গভীরভাবে উপভোগও করেন। এই দুই বিপরীত ধারার সম্মিলনই গালিবের কাব্যের প্রাণ।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫০০)

জীবনের প্রতি গালিবের এই আসক্তির সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ হল তাঁর সেই বিখ্যাত গজল "গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো", যা আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার উদ্ধৃত করেছি। এই গজলটিতে গালিব একই সঙ্গে বিষাদ ও আনন্দ, বেদনা ও সৌন্দর্য, বন্দিত্ব ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে এক সূত্রে গেঁথেছেন। গজলটি এখানে আরেকবার, এবার পূর্ণাঙ্গভাবে, বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

"গুলোন মে রং ভরে": এক অনন্য জীবনানন্দের দলিল

مطلع:
گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

মাতলা:
গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

এই মাতলাটি গালিবের জীবনানন্দের এক চরম প্রকাশ। শীতের পর বসন্ত আসে, ফুলে রং ভরতে শুরু করে, বাগান আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এটি প্রকৃতির চিরন্তন চক্র। গালিব এই চক্রকে একই সঙ্গে আক্ষরিক ও রূপক অর্থে ব্যবহার করছেন। আক্ষরিক অর্থে, এটি বসন্তের আগমনী গান। রূপক অর্থে, এটি প্রেমের জগতে নতুন প্রাণ সঞ্চারের আহ্বান প্রেমাস্পদের আগমন ছাড়া প্রেমের জগৎ অচল, যেমন বসন্ত ছাড়া বাগান অচল।

دوسرا□عر:
قفس میں ہم سے ہیں، رہتا ہے چمن میں کو□ سا د□
طبیبِ گل کو سمجھ، آئے کہ ا□ نکھار چلے

দুসরা শের:
কফস মে হম সে হ্যায়, রহতা হ্যায় চমন মেঁ কৌন সা দম
তবীব-এ-গুল কো সমঝ, আয়ে কে অব নিখার চলো

(খাঁচায় আমাদের মতো, বাগানে থাকে কেমন করে? ফুলের চিকিৎসককে বোঝাও, এসো, যাতে এখন সৌন্দর্য খেলে।)

এই শেরে গালিব 'কফস' (খাঁচা) ও 'চমন' (বাগান)-এর দ্বন্দ্ব এঁকেছেন। খাঁচায় বন্দি পাখির মতো কবির অবস্থা তিনি প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই বাগানে (পৃথিবীতে) তাঁর থাকা অসম্ভব। 'তবীব-এ-গুল' (ফুলের চিকিৎসক) হলেন প্রেমাস্পদ, যিনি এসে ফুলের (কবির আত্মার) সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবেন। এই শেরে যে বন্দিত্বের বেদনা আছে, তার পাশাপাশি মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও আছে এবং এই আকাঙ্ক্ষাই গালিবের জীবনানন্দের পরিচায়ক।

تیسرا □عر:
وفاداری بہ □رطِ استواری ا □لِ ایماں ہے
مرے بت میں جو، نہ کعبے میں ٹھہر، جا کر تو گیاں چلے

তিসরা শের:
ওফাদারী ব-শর্ত-এ-ওস্তোয়ারি অসল-এ-ঈমা হ্যায়
মেরে বুত মেঁ জো, না কাবা মেঁ ঠহর, জা কর তো গিয়া চলো

(বিশ্বস্ততা, স্থায়িত্বের শর্তে, বিশ্বাসের মূল। আমার মূর্তিতে যদি থাকে, তবে কাবায় গিয়ে থামবে কেন? চলো, গিয়া মন্দিরেই চলো।)

এই শেরটি গালিবের প্রেমের সর্বজনীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব নিদর্শন। প্রথম পঙ্ক্তি: বিশ্বস্ততা যদি স্থায়ী হয়, তাহলে সেটাই প্রকৃত ধর্ম অর্থাৎ, ধর্মের চেয়ে প্রেম বড়। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি: 'মেরে বুত' (আমার মূর্তি) অর্থাৎ প্রেমাস্পদ প্রথাগত ধর্মে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ, কিন্তু গালিব বলছেন, যদি প্রেমাস্পদের প্রতি বিশ্বস্ততা থাকে, তাহলে কাবায় (ইসলামের পবিত্র স্থান) গিয়ে থামার প্রয়োজন নেই, বরং গিয়া (হিন্দুদের পবিত্র মন্দির)-এই চলো। এটি একই সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং প্রেমের সার্বজনীনতার ঘোষণা।

چوتھا □عر:
غالبؔ، ہم نے بہت کچھ دیکھا
پر کیا دیکھا کہ دیکھا کیا ہے

চৌথা শের:
'গালিব', হম নে বহুত কুছ দেখা
পর ক্যা দেখা কে দেখা ক্যা হ্যায়

(হে গালিব, আমরা অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু কী দেখেছি, তা কী দেখার মতো?)

এই শেরে গালিব জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে এক সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। 'বহুত কুছ দেখা' (অনেক কিছু দেখেছি) কিন্তু 'ক্যা দেখা কে দেখা ক্যা হ্যায়' (কী দেখেছি, তা কী দেখার মতো?) অর্থাৎ, যা দেখেছি, তার কোনো মূল্য আছে কি? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গালিব একই সঙ্গে নৈরাশ্য ও কৌতুক প্রকাশ করছেন। কিন্তু এই সংশয়ও জীবনের প্রতি তাঁর গভীর জিজ্ঞাসারই প্রমাণ যদি জীবনকে তিনি তুচ্ছই মনে করতেন, তাহলে এত প্রশ্ন করতেন কেন?

বিষাদ ও আনন্দের সহাবস্থান: দর্শনের মূল সুর

গুলোন মে রং ভরে-র মতো গজলগুলি প্রমাণ করে, গালিবের দর্শনের মূল সুর কেবল নৈরাশ্য নয়, বরং নৈরাশ্য ও আনন্দের সহাবস্থান। তিনি একই সঙ্গে জানেন যে, জীবন দুঃখময় এবং জীবন সুন্দর। এই দুই সত্যের কোনো একটিকেও তিনি অস্বীকার করেন না, বরং দুই-কেই একই সঙ্গে ধারণ করেন।

রাসেল এই সহাবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের দর্শনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি জীবনের বিরোধী সত্যগুলিকে একই সঙ্গে ধারণ করতে পারেন। তিনি একই সঙ্গে বলেন, জগৎ তামাশা, এবং সেই তামাশাই উপভোগ্য। তিনি বলেন, জীবন কারাগার, এবং সেই কারাগারেই বাস করতে হয়। তিনি বলেন, প্রেম বেদনা, এবং সেই বেদনাই জীবন। এই বিরোধী সত্যগুলির সহাবস্থানই তাঁর দর্শনের পরিণত রূপ।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫২৫)

গালিবের এই সহাবস্থানের আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ হল সেই বিখ্যাত শের, যা আমরা বহুবার উদ্ধৃত করেছি:

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরে গালিব একই সঙ্গে দুঃখের বাস্তবতা স্বীকার করছেন এবং দুঃখ থেকে মুক্তির পথও বলছেন তা হল দুঃখের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া। কিন্তু এই অভ্যস্ততা কোনো পলায়ন নয়, বরং দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার এক দার্শনিক অবস্থান। এবং একবার দুঃখকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারলে, দুঃখ আর দুঃখ থাকে না তা হয়ে ওঠে জীবনেরই অংশ, যা সহ্য করা যায়, এমনকি উপভোগও করা যায়।

দুঃখের মধ্যেই আনন্দের সন্ধান

গালিবের দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তিনি দুঃখের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেতেন। এটি কোনো যন্ত্রণাবাদ (ম্যাসোকিজম) নয়, বরং এক গভীর জীবনদর্শন। যখন একজন মানুষ উপলব্ধি করেন যে, দুঃখই জীবনের একমাত্র নিশ্চিত সত্য, তখন তিনি দুঃখকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং তাকেই জীবনের কেন্দ্র করে তুলতে পারেন। এবং তখনই দুঃখ আর দুঃখ থাকে না, বরং হয়ে ওঠে এক ধরনের আনন্দ যেমন মরুভূমির বুকে ফুটে ওঠা ফুলের আনন্দ, যেমন অন্ধকার রাতে জ্বলে ওঠা একটি তারার আনন্দ।

একটি শের, যেখানে এই ভাবনা প্রকাশিত:

درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা
হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

(ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।)

আমরা এই শেরটি নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি, কিন্তু এখানে আরেকটি অর্থ স্তর যোগ করা যায়। কবি কেন লুকোচ্ছেন যে এখনো হৃদয় আছে? হয়তো এই কারণে যে, এই ফাঁপা গর্তটুকুই তাঁর একমাত্র সম্বল। যদি সবাই জেনে যায় যে হৃদয় আর নেই, তাহলে এই গর্তের মূল্যও শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, কবি নিজের দুঃখকে এতটাই ভালোবেসেছেন যে, তা হারাতেও চান না। দুঃখই এখন তাঁর পরিচয়, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। এই ভালোবাসাই দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করেছে।

আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে কৌতুকপ্রিয়তা

গালিবের দুঃখবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা ও আত্ম-বিদ্রূপ। গভীর দুঃখের মধ্যেও গালিব হাসতে পারতেন, কৌতুক করতে পারতেন, নিজেকে নিয়ে মজা করতে পারতেন। এই কৌতুকপ্রিয়তা ছিল তাঁর আত্মরক্ষার কৌশল এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ঢাল, যা তাঁকে দুঃখের আঘাত থেকে রক্ষা করত।

এক চিঠিতে গালিব নিজের দারিদ্র্য নিয়ে মজা করেছিলেন: "আমার ঘরে ইঁদুরেরা এখন আর ভয় পায় না। কারণ তারা জানে, আমি তাদের মতোই গরিব আমি তাদের মারব না, বরং তাদের কাছ থেকে ধার চাইব।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৪০০) এই আত্ম-বিদ্রূপের মধ্যে যে দুঃখ লুকিয়ে আছে, তা স্পষ্ট। কিন্তু একই সঙ্গে এই রসিকতা গালিবকে সেই দুঃখ থেকে একধাপ দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তিনি দুঃখকে নিয়ে হাসতে পারছেন, অর্থাৎ দুঃখকে জয় করতে পারছেন।

নারঙ এই কৌতুকপ্রিয়তা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর দুঃখবোধেরই পরিপূরক। তিনি দুঃখকে এত গভীরভাবে অনুভব করতেন যে, তাকে সহ্য করার জন্য হাসির প্রয়োজন হতো। এই হাসি কোনো পলায়ন নয়, বরং দুঃখের বিরুদ্ধে আত্মার বিজয়।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬১৫)

শেষ বয়সে জীবনানন্দের রূপ

গালিবের শেষ বয়সে এসে তাঁর দুঃখবোধ ও জীবনানন্দ এক নতুন রূপ নিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ধ্বংসের পর, যখন দিল্লি মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে, যখন বন্ধু-স্বজন সবাই হারিয়ে গেছেন, যখন নিজের শরীর ভেঙে পড়েছে তখন গালিবের জীবনানন্দ হয়ে উঠেছিল এক

নীরব, গভীর প্রশান্তি। তিনি আর জীবনের কাছে কিছু চাইতেন না, কিছু আশা করতেন না; বরং, যা আছে, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছিলেন।

এক চিঠিতে এই শেষ বয়সের জীবনানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়: "এখন আমি এক অদ্ভুত নির্বিকার অবস্থায় আছি যেন জগতের সবকিছু আমার থেকে দূরে সরে গেছে, আর আমি দূর থেকে সব দেখছি, কিন্তু স্পর্শ করতে পারছি না। এই অবস্থাটা খারাপ নয়, বরং এক ধরনের শান্তি আছে এর মধ্যে।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৪০৫)

এই 'নির্বিকার অবস্থা'ই গালিবের শেষ জীবনের জীবনানন্দ যখন আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো অভিযোগ নেই, কোনো দুঃখও নেই, কেবল এক নিস্তব্ধ দর্শকসত্তা, যা জগতের সবকিছু দেখছে, কিন্তু কিছুতেই জড়িয়ে পড়ছে না। এটাই গালিবের দর্শনের চূড়ান্ত রূপ দুঃখ ও আনন্দের ঊর্ধ্বে উঠে এক প্রশান্ত নির্বিকারতায় পৌঁছানো।

দুই সুরের এক সংগীত

গালিবের দুঃখবোধ ও জীবনানন্দ নিয়ে এই অধ্যায় শেষ করার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি, গালিবের দর্শন আসলে দুই বিপরীত সুরের এক অপূর্ব সংগীত। একদিকে গভীর নৈরাশ্য, জগতের অর্থহীনতা, জীবনের দুঃখময়তা অন্যদিকে জীবনের প্রতি তীব্র আসক্তি, সৌন্দর্যের প্রতি মোহ, সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকার আকুলতা। এই দুই সুর কখনো একে অপরের বিরোধিতা করে, কখনো একে অপরের পরিপূরক হয়, কিন্তু কখনো একে অপরকে ছাড়া থাকে না।

রাসেল যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের দর্শনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, জীবন একই সঙ্গে দুঃখ ও আনন্দ একটিকে ছাড়া আরেকটি নেই। যে এই সত্য মেনে নিতে পারে, সে জীবনের সব বৈপরীত্যের মধ্যেও শান্তি খুঁজে পেতে পারে। গালিব এই সত্য কেবল বুঝতেন না, বরং তাঁর কাব্যে তাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৩০)

নির্বাচিত শের: দুঃখবোধ ও জীবনানন্দের অনুষঙ্গে

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের দুঃখবোধ ও জীবনানন্দ সম্পর্কে একটি গভীর ধারণা পেয়েছেন। গালিবের জীবন থেকে আমরা যে শিক্ষাটি পেতে পারি, তা হল: দুঃখ ও আনন্দ কখনো আলাদা নয়, বরং তারা একই মুদ্রার দুই পিঠ। দুঃখকে অস্বীকার না করে, তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই আমরা প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পেতে পারি।

এখন নিজের জীবনের দিকে তাকান। আপনি কি জীবনের দুঃখগুলিকে এড়িয়ে যেতে চান, নাকি গালিবের মতো তাদের মেনে নিতে পারেন? আপনি কি দুঃখের মধ্যেও হাসতে পারেন, নিজেকে নিয়ে মজা করতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে আপনি গালিবের দর্শনের পথে একধাপ এগিয়ে গেছেন। আর যদি না পারেন, তাহলে গালিবের কাব্য আপনার জন্য এক পথপ্রদর্শক হতে পারে যে পথ দুঃখের মধ্য দিয়েই আনন্দের সন্ধান দেয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব গালিবের সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতা সম্পর্কে ধারণায় যেখানে আমরা দেখব, কীভাবে গালিব সময়ের গতিময়তা, মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং আধুনিক ভারতের উত্থানকে নিজের কাব্যে ধারণ করেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি একই সঙ্গে ছিলেন এক বিলীয়মান সভ্যতার শেষ প্রতিনিধি ও এক নবযুগের অগ্রদূত।

অধ্যায় ১৮: সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতা

তিনটি শাশ্বত প্রশ্নের সম্মুখে এক কবি

মানবজীবনের তিনটি প্রশ্ন আছে, যা যুগে যুগে দার্শনিক, কবি ও চিন্তাবিদদের ভাবিয়েছে: সময় কী, মৃত্যু কেন, এবং আধুনিকতা কীভাবে আমাদের বদলে দেয়? গালিব এই তিনটি প্রশ্নেরই সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁর জীবনে ও কাব্যে একই সঙ্গে এক বিলীয়মান সভ্যতার শেষ প্রতিনিধি ও এক নবযুগের অগ্রদূত হিসেবে। তিনি দেখেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, দিল্লির ধ্বংস, এবং এক পুরনো জগতের অবসান; একই সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইংরেজ শাসনের উত্থান, রেলপথ-টেলিগ্রাফের মতো আধুনিক প্রযুক্তির আগমন, এবং এক নতুন ভারতের জন্ম। এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গালিব সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতা সম্পর্কে যে গভীর ও মৌলিক চিন্তা রচনা করেছিলেন, তাই এই অধ্যায়ের বিষয়।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ লিখেছেন: "গালিব ছিলেন একই সঙ্গে মধ্যযুগ ও আধুনিকতার সেতুবন্ধন। তিনি যে সময়ে বাস করতেন, তা ছিল এক ক্রান্তিকাল পুরনো পৃথিবী মরছে, নতুন পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে। এই ক্রান্তিকালের সমস্ত টানাপোড়েন, সমস্ত বেদনা ও সম্ভাবনা গালিবের কাব্যে ধরা পড়েছে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬২০)

এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি স্তরে প্রবেশ করব। প্রথমে দেখব, কীভাবে গালিব সময়ের গতিময়তা ও ইতিহাসের পরিবর্তনকে উপলব্ধি করেছিলেন অতীতের গৌরব ও বর্তমানের পতনের চেতনা কীভাবে তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে দেখব, কীভাবে গালিব মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে চিন্তা করতেন এবং কীভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প ও কাব্যই পারে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে। তৃতীয় স্তরে পর্যালোচনা করব, গালিব কীভাবে একই সঙ্গে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক ছিলেন কীভাবে ইংরেজি শিক্ষা, কলকাতা সফর, রেলপথ ও টেলিগ্রাফের মতো বিষয়গুলি তাঁর কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল এবং কীভাবে তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিকতার সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন।

সময়ের গতিময়তা: অতীতের গৌরব ও বর্তমানের পতনের চেতনা

এক বিলীয়মান সভ্যতার শেষ প্রতিনিধি

গালিবের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এমন এক সময়ে, যখন মুঘল সাম্রাজ্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন দিল্লির পতন একসময়ের জগৎবিখ্যাত সাম্রাজ্যের রাজধানী কীভাবে এক প্রাদেশিক শহরে, পরে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন গালিবের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল, এবং সময় সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে মৌলিকভাবে গড়ে দিয়েছিল।

গালিবের সময়-চেতনা ছিল একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক। ব্যক্তিগত স্তরে, তিনি নিজের জীবনের পরিবর্তন দেখেছেন শৈশবের স্বচ্ছলতা থেকে যৌবনের দারিদ্র্য, যৌবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে প্রৌঢ়ত্বের ব্যর্থতা। সামষ্টিক স্তরে, তিনি দেখেছেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, ইংরেজ শাসনের উত্থান, এবং একটি সমগ্র সভ্যতার রূপান্তর। এই দুই স্তরের অভিজ্ঞতা মিলে সময় সম্পর্কে গালিবের যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তা ছিল গভীরভাবে ইতিহাস-সচেতন ও নিয়তিবাদী।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে সময়ের যে ধারণা পাওয়া যায়, তা নিছক দার্শনিক বিমূর্ততা নয়, বরং জীবন্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফসল। তিনি নিজের জীবনে এক সভ্যতার পতন দেখেছেন, এবং এই পতনের সাক্ষী হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই সময় সম্পর্কে তাঁর ধারণা গড়ে উঠেছে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫১০)

অতীতের গৌরব ও বর্তমানের পতন

গালিবের সময়-চেতনার একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হল অতীতের গৌরব ও বর্তমানের পতনের দ্বন্দ্ব। তিনি জানতেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কি সেনানী, যাঁরা তলোয়ারের জোরে সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সেই বংশের উত্তরাধিকারী, কিন্তু তাঁর হাতে তলোয়ার নয়, কলম। এই বংশগত গৌরব ও বর্তমানের দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব গালিবের মধ্যে সময় সম্পর্কে এক বিশেষ সচেতনতা তৈরি করেছিল।

একটি বিখ্যাত শের, যেখানে এই অতীত-বর্তমানের দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে:

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

এই শেরে সময়ের যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, তা একই সঙ্গে সৃষ্টিতাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত। প্রথম পঙ্ক্তিতে গালিব সময়ের ঊষালগ্নের কথা বলছেন যখন কিছুই ছিল না, কেবল খুদা ছিলেন। দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে তিনি নিজের অস্তিত্বের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আমার অস্তিত্বের সময়টা কি আদৌ কোনো অর্থ বহন করে? আমি না থাকলে সময়ের প্রবাহে কী পরিবর্তন হতো? এই প্রশ্নের মধ্যে একই সঙ্গে নৈরাশ্য ও আত্মমর্যাদাবোধ আছে আমার অস্তিত্ব অর্থহীন, তবু এই অর্থহীন অস্তিত্বই আমার একমাত্র সত্য।

রালফ রাসেল এই শেরের সময়-ভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব এখানে সময়ের দুই প্রান্তকে স্পর্শ করছেন একদিকে সৃষ্টির পূর্বের শূন্যতা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সময়। এই দুই প্রান্তের মধ্যে যে বিশালত্ব, তা-ই গালিবের সময়-ভাবনার মূল উপাদান।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৩৫)

সময়ের গতিময়তা ও ইতিহাসের পরিবর্তন

গালিবের কাব্যে সময় কখনো স্থির নয়, বরং সর্বদা গতিময়। তিনি জানতেন, ইতিহাস কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না যা আজ আছে, কাল তা থাকবে না। এই গতিময়তার চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর সেই বিখ্যাত নৈর্ব্যক্তিকতা, যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যখন একজন মানুষ উপলব্ধি করেন, জগতের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী, সব গৌরবই একদিন ধুলোয় মিশে যায়, তখন তাঁর পক্ষে জগৎকে 'বাজীচা-এ-আতফাল' (শিশুদের খেলাঘর) বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

একটি শের, যেখানে সময়ের গতিময়তা ও ইতিহাসের পরিবর্তনের চেতনা ধরা পড়েছে:

ایک کھیل ہے اورنگِ سلیماں مرے نزدیک
ایک با□ ہے اعجازِ مسیحا مرے آگے

এক খেল হ্যায় আওরঙ্গ-এ-সুলায়মাঁ মেরে নজদিক
এক বাত হ্যায় এজাজ-এ-মসীহা মেরে আগে

(সুলায়মানের সিংহাসন আমার কাছে এক খেলা, মসীহের অলৌকিক ক্ষমতা আমার সামনে এক কথা।)

এই শেরে গালিব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গৌরব ও ক্ষমতাকে 'এক খেল' ও 'এক বাত' বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। সুলায়মান (সলোমন)-এর সিংহাসন, যা ছিল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের চরম প্রতীক, সময়ের প্রবাহে তার মূল্য কী? একটি খেলা মাত্র। যিশুখ্রিস্টের অলৌকিক ক্ষমতা, যা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের চরম নিদর্শন, সময়ের নিরিখে তার মূল্য কী? একটি কথা মাত্র। সময়ের এই গতিময়তার মধ্যেই গালিব ইতিহাসের পরিবর্তনের সত্যকে ধরে রেখেছেন।

নারঙ এই শের সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব এখানে সময়ের নিরিখে ইতিহাসের সব গৌরবকে ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ বলে চিহ্নিত করছেন। তাঁর কাছে সময়ই একমাত্র চিরন্তন সত্য, আর ইতিহাসের সব ঘটনাই সময়ের সাগরে ভেসে যাওয়া ফেনা মাত্র।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬২৫)

ব্যক্তিগত সময় ও ঐতিহাসিক সময়ের দ্বন্দ্ব

গালিবের সময়-ভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্যক্তিগত সময় ও ঐতিহাসিক সময়ের দ্বন্দ্ব। একদিকে, তিনি নিজের জীবনের সময়কে অনুভব করতেন জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্যের স্তরগুলি পার করছিলেন। অন্যদিকে, তিনি দেখছিলেন, ঐতিহাসিক সময় কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্য শেষ হয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্য শুরু হচ্ছে, পুরনো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে উঠছে। এই দুই সময়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য, তা গালিবের কাব্যে এক বিশেষ টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছিল।

একটি বিখ্যাত শের, যেখানে এই দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে:

ہم کو معلو□ ہے جنت کی حقیقت لیکن
دل کے□وش رکھنے کو 'غالب' یہ□یال اچھا ہے

হম কো মালুম হ্যায় জান্নত কী হকীকত লেকিন
দিল কে খুশ রাখনে কো 'গালিব' ইয়ে খেয়াল আচ্ছা হ্যায়

(আমরা জানি বেহেশ্তের আসল সত্য, কিন্তু মনকে খুশি রাখার জন্য, হে গালিব, এই ভাবনাটাই ভালো।)

এই শেরে সময়ের দুই স্তর কাজ করছে। এক স্তরে, গালিব ব্যক্তিগত সময়ের কথা বলছেন এখানে ও এখন কীভাবে মনকে খুশি রাখা যায়। আরেক স্তরে, তিনি ঐতিহাসিক সময়ের কথা ইঙ্গিত করছেন যে সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু মানুষ তবু সেই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে। 'বেহেশ্তের আসল সত্য জানি' এই বক্তব্যটি ঐতিহাসিক সময়ের চেতনার ফসল; আর 'মনকে খুশি রাখার জন্য এই ভাবনাটাই ভালো' এটি ব্যক্তিগত সময়ের প্রয়োজন।

সময় ও নিয়তির সম্পর্ক

গালিবের সময়-ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁর নিয়তিবাদ। তিনি বিশ্বাস করতেন, সময়ের গতিপথ পূর্বনির্ধারিত যা হওয়ার, তা সময়ে ঘটবেই। মানুষ এই গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে না, কেবল মেনে নিতে পারে। এই নিয়তিবাদ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল যখন তিনি দেখেছেন, বারবার চেষ্টা করেও তিনি পেনশন পান না, স্বীকৃতি পান না, সন্তান বাঁচাতে পারেন না, দিল্লিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন না।

একটি শের, যেখানে সময় ও নিয়তির সম্পর্ক প্রকাশিত:

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরে সময়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়ই মানুষকে দুঃখের সঙ্গে অভ্যস্ত করে তোলে, সময়ই মুশকিলকে সহজ করে দেয়। অর্থাৎ, সময়ই হল সেই মহৎ চিকিৎসক, যে সব ক্ষত সারিয়ে তোলে বা অন্তত ক্ষতের যন্ত্রণাকে অসাড় করে দেয়। এই বিশ্বাস থেকেই গালিব সময়কে এক ধরনের নিয়তি হিসেবে দেখতেন, যা অনিবার্যভাবে তার কাজ করে চলে।

মৃত্যুর অনিবার্যতা ও শিল্পের অমরতা

মৃত্যুচেতনা: জীবনের একমাত্র নিশ্চিত সত্য

গালিবের কাব্যে মৃত্যু এক পুনরাবৃত্ত সুর। তিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন না, বরং তাকে জীবনের একমাত্র নিশ্চিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রহণযোগ্যতার পেছনে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাত সন্তানের মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু, বন্ধু-স্বজনদের মৃত্যু, এবং ১৮৫৭ সালে দিল্লির ধ্বংস। এত মৃত্যু দেখার পর মৃত্যু আর ভয়ের বিষয় থাকে না, বরং হয়ে ওঠে জীবনেরই একটি অংশ, একটি অনিবার্য পরিণতি।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিবের কাব্যে মৃত্যু কখনো ভয়ের বিষয় নয়, বরং এক দার্শনিক প্রশ্ন। তিনি মৃত্যুকে নিয়ে ভয় পান না, বরং কৌতূহলী হন মৃত্যু কী, মৃত্যুর পর কী হয়, জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক কী। এই কৌতূহলই তাঁর মৃত্যুভাবনার মৌলিকতা।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫১৫)

একটি বিখ্যাত শের, যেখানে গালিবের মৃত্যুচেতনা প্রকাশিত:

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

এই শেরে গালিব জীবনকে 'কারাগার' এবং দুঃখকে 'বন্ধন' বলেছেন। দুই-ই এক জীবন মানেই দুঃখ, দুঃখ মানেই জীবন। তাহলে মৃত্যুর আগে মানুষ কীভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে? প্রশ্নটি উত্তরহীন, এবং এই উত্তরহীনতাই মৃত্যুর রহস্যকে নির্দেশ করে। মৃত্যুই একমাত্র মুক্তি, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছানো যাবে, যেখানে জীবন নিজেই কারাগার? এই দ্বান্দ্বিকতাই গালিবের মৃত্যুভাবনার গভীরতা।

রালফ রাসেল এই শের সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব এখানে মৃত্যুকে এক ধরনের মুক্তি হিসেবে দেখছেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করছেন, সেই মুক্তি জীবদ্দশায় পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে অমোঘ সীমারেখা, তা-ই মানুষের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৪০)

মৃত্যু ও জীবনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক

গালিবের মৃত্যুভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মৃত্যু ও জীবনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। তিনি মৃত্যু ও জীবনকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে দেখেননি, বরং একই বৃত্তের দুই অর্ধেক হিসেবে দেখেছেন। জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমন সত্য; একটিকে ছাড়া আরেকটি অর্থহীন। এই ধারণা সুফি দর্শনের 'ফানা' (আত্মবিলোপ) তত্ত্বের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে মৃত্যুকে জীবনেরই একটি স্তর হিসেবে দেখা হয়, ধ্বংস নয়।

একটি শের, যেখানে মৃত্যু ও জীবনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক প্রকাশিত:

عشر□ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা
দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

(ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া। ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।)

এই শেরে 'ফানা' (মিলিয়ে যাওয়া, মৃত্যু) কে 'ইশরাত' (পরম সুখ) বলা হয়েছে। ফোঁটা যখন নদীতে মিলিয়ে যায়, তখন তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব শেষ হয় এটি এক ধরনের মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যুই ফোঁটার জন্য পরম সুখ, কারণ এর মধ্য দিয়েই সে নদীর অংশ হয়ে ওঠে, অসীমের সঙ্গে মিলিত হয়। এই দর্শনে মৃত্যু ধ্বংস নয়, বরং এক উচ্চতর অস্তিত্বের দরজা।

শিল্পের অমরতা: মৃত্যুকে অতিক্রম করার পথ

গালিব বিশ্বাস করতেন, একমাত্র শিল্প ও কাব্যই পারে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে। মানুষ মরে যায়, তার দেহ ধুলোয় মিশে যায়, কিন্তু তার সৃষ্টি থেকে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী। গালিব নিজে এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন এই জেনে যে, তাঁর দেহ একদিন মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু তাঁর শেরগুলি বেঁচে থাকবে অনন্তকাল।

এই বিশ্বাসের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে গালিবের সেই বিখ্যাত উক্তিতে, যা আমরা বহুবার উদ্ধৃত করেছি:

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

এই শেরে গালিব নিজেকে 'আয়না-এ-খুদ-বীন' (আত্মদর্শনের আয়না) বলেছেন। আয়না যেমন নিজের প্রতিচ্ছবি দেখায়, তেমনই গালিবের কাব্যও তাঁর আত্মার প্রতিচ্ছবি। এই আয়না চিরস্থায়ী গালিব মরে গেলেও এই আয়না থেকে যাবে, এবং ভবিষ্যতের পাঠকেরা তাতে নিজেদের দেখতে পাবে। অর্থাৎ, কাব্যই হল মৃত্যুকে অতিক্রম করার একমাত্র পথ।

আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "গালিব জানতেন, তাঁর দেহ নশ্বর, কিন্তু তাঁর কাব্য অমর। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি কাব্যচর্চা করতেন, এবং এই বিশ্বাসই তাঁকে জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল রেখেছিল।" (হালী, ১৮৯৭: ১৪৫)

মৃত্যু নিয়ে গালিবের কৌতুক

গালিবের মৃত্যুভাবনার আরেকটি অনন্য দিক হল, তিনি মৃত্যু নিয়েও কৌতুক করতে পারতেন। এই কৌতুক ছিল তাঁর আত্মরক্ষার কৌশল যেমন দুঃখ নিয়ে হাসতেন, তেমনই মৃত্যুকেও নিয়ে হাসতেন। এই কৌতুক মৃত্যুকে অস্বীকার করা নয়, বরং তাকে আরও বেশি করে স্বীকার করে নেওয়া এবং সেই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই মৃত্যুর ভয়কে জয় করা।

এক চিঠিতে গালিব মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছিলেন: "মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। জীবনই তো ভয়ের, মৃত্যু তো শান্তি। যে মানুষ সাতটি সন্তানের মুখাগ্নি করেছে, যে মানুষ দিল্লিকে ধ্বংস হতে দেখেছে, তার কাছে মৃত্যু কী? একটি মুক্তি, একটি বিশ্রাম।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৫৪৫)

আরেকটি বিখ্যাত চিঠির অংশ, যা আমরা ইতিমধ্যে উদ্ধৃত করেছি: "মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে কী বলব? মৃত্যু আমার কাছে এখন এক পুরনো বন্ধুর মতো, যার আসার কথা জানি, কিন্তু এখনো আসেনি। যখন আসবে, তখন কী হবে তা ভেবে লাভ নেই। কারণ, যখন আসবে, তখন আমি থাকব না ভাবতে।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৫২০)

এই উক্তিগুলিতে গালিবের মৃত্যুভাবনার সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়, বরং এক পুরনো বন্ধু, এক পরম মুক্তি। এই বিশ্বাসের পেছনে আছে এক গভীর জীবনদর্শন, যা জীবনের সব দুঃখ-কষ্টকে মেনে নিয়ে তবু জীবনের প্রতি ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ রাখে।

কাব্যে মৃত্যুভাবনার বিবর্তন

গালিবের কাব্যে মৃত্যুভাবনার একটি বিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক রচনায় মৃত্যু ছিল প্রেমের অঙ্গ প্রেমিকের আত্মাহুতি, প্রেমাস্পদের নিষ্ঠুরতা, প্রেমে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পরিণত বয়সে এসে মৃত্যুভাবনা আরও দার্শনিক ও নিয়তিবাদী হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের পর, যখন গালিব দিল্লির ধ্বংস ও অসংখ্য মানুষের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলেন, তখন মৃত্যুভাবনা আরও গভীর ও প্রশান্ত হয়ে ওঠে মৃত্যু আর ভয় বা আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়, বরং এক অনিবার্য সত্য, যা গ্রহণ করে নেওয়াই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ।

নারঙ এই বিবর্তন সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের প্রাথমিক কাব্যে মৃত্যু ছিল রোমান্টিক প্রেমের জন্য মৃত্যু, প্রেমাস্পদের হাতে মৃত্যু। কিন্তু পরিণত বয়সে এসে মৃত্যু হয়ে ওঠে দার্শনিক জীবনের একমাত্র নিশ্চিত সত্য, যা থেকে পলায়ন নেই, বরং গ্রহণই একমাত্র পথ। এই বিবর্তন গালিবের জীবনদর্শনের পরিণতিরই প্রতিফলন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৩০)

একজন প্রাক-আধুনিক না আধুনিক মানুষ?

প্রাক-আধুনিক ও আধুনিকের সন্ধিক্ষণে

গালিবের সময়টি ছিল ভারতীয় ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল একদিকে মুঘল যুগের সমাপ্তি, অন্যদিকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সূচনা। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গালিব একই সঙ্গে ছিলেন প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক। প্রাক-আধুনিক এই অর্থে যে, তিনি মুঘল সংস্কৃতি, ফার্সি কাব্য, সুফি দর্শন ও অভিজাত তেহজিবের ধারক-বাহক ছিলেন। আধুনিক এই অর্থে যে, তিনি ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, রেলপথ-টেলিগ্রাফের মতো প্রযুক্তি এবং নতুন সামাজিক বাস্তবতার প্রতি গভীর কৌতূহলী ছিলেন এবং তাঁর কাব্যে এই আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট।

রালফ রাসেল লিখেছেন: "গালিব একই সঙ্গে ছিলেন শেষ মুঘল কবি ও প্রথম আধুনিক উর্দু কবি। তিনি যে সময়ে বাস করতেন, তা ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণ পুরনো পৃথিবী মরছে, নতুন পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে। গালিবের প্রতিভা ছিল এই দুই পৃথিবীর মধ্যে সাঁকো রচনা করা।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৫০)

গালিবের এই দ্বৈত সত্তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন লেখায়। একদিকে তিনি ফার্সি কাব্যের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতেন, অন্যদিকে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। একদিকে তিনি মুঘল দরবারের রাজকবি ছিলেন, অন্যদিকে তিনি ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে পেনশনের জন্য আবেদন করতেন। একদিকে তিনি সুফি দর্শনে গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির কঠোর সমালোচনা করতেন। এই সব দ্বন্দ্ব মিলেই গালিবের আধুনিকতা।

ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি কৌতূহল

গালিব কখনো ইংরেজি শেখেননি, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর কৌতূহল ছিল। ১৮২৮-২৯ সালের কলকাতা সফরের সময় তিনি প্রথমবারের মতো ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তিনি দেখেছিলেন, কীভাবে ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয় সমাজে এক নতুন চেতনার জন্ম দিচ্ছে, এবং এই পরিবর্তনকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "গালিব নিজে ইংরেজি না জানলেও, ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব তিনি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, ভবিষ্যতের ভারত গড়ে উঠবে ইংরেজি শিক্ষার ভিত্তির ওপর, এবং যারা এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে, তারা পিছিয়ে পড়বে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫২৫)

এক চিঠিতে গালিব ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছিলেন: "আমি নিজে ইংরেজি জানি না, এবং এই অজ্ঞতার জন্য দুঃখিত। ইংরেজি জানলে আমি আরও অনেক কিছু জানতে পারতাম, যা এখন অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু আমার বয়স এখন শেখার নয়, শেখানোর। তাই আমি বলি, তোমরা যারা যুবক, তারা ইংরেজি শেখো এতে দুনিয়া জানতে পারবে, আর উন্নতিও করতে পারবে।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৫৫৫)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, গালিব ইংরেজি শিক্ষাকে কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজন হিসেবেই দেখতেন না, বরং জ্ঞানের প্রসারের উপায় হিসেবেও দেখতেন। তিনি জানতেন, ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রবেশ করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত আধুনিক, বিশেষ করে তখনকার রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটে।

রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও প্রযুক্তির প্রতি বিস্ময়

গালিবের আধুনিকতার আরেকটি প্রমাণ হল রেলপথ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি নতুন প্রযুক্তির প্রতি তাঁর বিস্ময় ও কৌতূহল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ চালু হয় এবং এই আবিষ্কারগুলি তৎকালীন সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গালিব এই নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং সেগুলি নিয়ে লিখেছেনও।

এক চিঠিতে গালিব টেলিগ্রাফ সম্পর্কে লিখেছিলেন: "শুনেছি, এক নতুন যন্ত্র এসেছে, যার নাম 'তার' (টেলিগ্রাফ)। এই যন্ত্রের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে হাজার মাইল দূরের খবর পৌঁছে যায়। এটি সত্যি হলে, এটা এক বড় অলৌকিক ব্যাপার। মানুষের বুদ্ধি সত্যিই অসীম সে এমন সব জিনিস বানাতে পারে, যা আগে কেবল আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে ছিল বলে মনে করা হতো।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৫৩০)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, গালিব নতুন প্রযুক্তিকে 'অলৌকিক' বলে মনে করতেন এবং একে মানুষের বুদ্ধির জয় হিসেবে দেখতেন। এটি ছিল অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্তিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং মানবিক অর্জন হিসেবে দেখা।

কলকাতা সফর: আধুনিক ভারতের প্রথম দেখা

গালিবের ১৮২৮-২৯ সালের কলকাতা সফর ছিল তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়, এবং আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। কলকাতায় তিনি যা দেখেছিলেন প্রশস্ত রাস্তা, উঁচু বাড়ি, ব্যস্ত বন্দর, সংবাদপত্র, ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ তা ছিল দিল্লি-আগ্রার পুরনো পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। এই অভিজ্ঞতা গালিবের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছিল।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (অধ্যায় ৭) এই কলকাতা সফরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। এখানে শুধু মনে করা দরকার, এই সফরের মাধ্যমে গালিব প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আর মুঘল দরবার বা নবাবদের হাতে নেই, বরং তা ইংরেজ শাসনের অধীনে এক নতুন পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই উপলব্ধি ছিল বেদনার, কিন্তু একই সঙ্গে বাস্তবতারও। এবং এই উপলব্ধিই তাঁকে দিয়েছিল সেই দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতা, যা তাঁর পরিণত কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগ ও আধুনিকতার সেতুবন্ধন

গালিবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিকতার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন মুঘল ফার্সি কাব্যের শেষ মহৎ প্রতিনিধি এবং আধুনিক উর্দু গদ্য-পদ্যের পথিকৃৎ। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন সুফি দর্শনের ধারক ও সংশয়বাদী আধুনিক মানুষের অগ্রদূত। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন সম্রাটের রাজকবি ও ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে পেনশনের আবেদনকারী। এই সব দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তিনি এক নতুন ধরনের কাব্য ও এক নতুন ধরনের চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন।

নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের আধুনিকতা এই যে, তিনি কোনো একটি পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেননি। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন মুঘল ও আধুনিক, সুফি ও সংশয়বাদী, দিল্লির বাসিন্দা ও বিশ্বনাগরিক। এই বহু পরিচয়ের সম্মিলনই তাঁর কাব্যের শক্তি ও মৌলিকতার উৎস।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৩৫)

গালিবের একটি শের দিয়ে এই আধুনিকতার স্বরূপ বোঝা যায়:

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

এই শেরে গালিবের আধুনিকতা স্পষ্ট   তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভেদকে অস্বীকার করছেন, রীতিনীতিকে ত্যাগ করাকে ধর্ম বলছেন, এবং মানবজাতির একত্বকে প্রকৃত ঈমান বলে ঘোষণা করছেন। এই ধরনের সর্বজনীন মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত অগ্রসর ও আধুনিক।

উপসংহার: সময়ের স্রোতে এক অমর কবি

গালিবের সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতা সম্পর্কে ধারণা পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি ছিলেন একই সঙ্গে তাঁর সময়ের প্রতিনিধি ও তাঁর সময়ের অতিক্রমণকারী। সময়ের প্রতিনিধি এই অর্থে যে, তিনি ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের সমস্ত দ্বন্দ্ব, বেদনা ও সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। সময়ের অতিক্রমণকারী এই অর্থে যে, তিনি তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে এমন সব সত্য প্রকাশ করেছিলেন, যা আজও, দুই শতাব্দী পরেও, সমান প্রাসঙ্গিক।

তাঁর সময়-ভাবনা আমাদের শেখায়, ইতিহাসের পরিবর্তন অনিবার্য, এবং সেই পরিবর্তনের কাছে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁর মৃত্যুভাবনা আমাদের শেখায়, মৃত্যুই জীবনের একমাত্র নিশ্চিত সত্য, কিন্তু শিল্প ও কাব্যই পারে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে। এবং তাঁর আধুনিকতা আমাদের শেখায়, কোনো একটি পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বহু পরিচয়ের সম্মিলনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত আধুনিক হওয়া যায়।

রালফ রাসেল যথার্থই বলেছেন: "গালিব কেবল উর্দু কাব্যের নন, বরং সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের একজন আধুনিক কবি। তিনি যে সময়ে বাস করতেন, তার চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন, এবং এই কারণেই তাঁর কাব্য আজও আমাদের ভাবায়, আনন্দ দেয়, আর বাঁচতে শেখায়।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৬০)

নির্বাচিত শের: সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতার অনুষঙ্গে

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয়
মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

(জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?)

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতা সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। গালিব একই সঙ্গে ছিলেন প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক, নিয়তিবাদী ও প্রগতিশীল, মৃত্যুচেতন ও জীবনাসক্ত। এই দ্বান্দ্বিকতাই তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের একজন মহৎ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এখন আপনি নিজের জীবনের দিকে তাকান। আপনি কীভাবে সময়কে দেখেন অতীতের গৌরব আঁকড়ে থাকেন, নাকি ভবিষ্যতের দিকে তাকান? আপনি কীভাবে মৃত্যুকে দেখেন ভয় পান, নাকি জীবনের অনিবার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন? এবং আপনি কীভাবে আধুনিকতাকে গ্রহণ করেন নতুন প্রযুক্তি, নতুন ধারণা, নতুন জীবনবোধ? গালিবের জীবন ও কাব্য থেকে আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে পারি, এবং হয়তো খুঁজে পাই নিজেদেরও।

এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গেই পর্ব ৪ (দর্শন ও বিশ্বদৃষ্টি) সমাপ্ত হচ্ছে। পরবর্তী পর্বে আমরা প্রবেশ করব গালিবের উত্তরাধিকার ও পুনর্নির্মাণের জগতে যেখানে আমরা দেখব, কীভাবে গালিবের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে গবেষণা, সমালোচনা ও পুনরাবিষ্কারের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, এবং কীভাবে তিনি ক্রমশ এক বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

পর্ব ৫: উত্তরাধিকার ও পুনর্নির্মাণ

গালিবের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, এক নীরব, উপেক্ষিত প্রয়াণে। যাঁর কবিতা আজ কোটি মানুষের কণ্ঠে গীত হয়, যাঁর শেরগুলি দিল্লির গলি থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম পর্যন্ত ধ্বনিত হয়, সেই মানুষটি মৃত্যুকালে ছিলেন প্রায় একা, প্রায় বিস্মৃত। কিন্তু ইতিহাসের এক অমোঘ নিয়ম আছে: প্রকৃত প্রতিভা কখনো চিরকাল উপেক্ষিত থাকে না। গালিবের মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়েছিল এক ধীর অথচ অবিচল পুনরুত্থান যেন এক বীজ মাটির নিচে চাপা পড়ে থেকে বর্ষার জলে অঙ্কুরিত হলো।

পর্ব ৫-এ আমরা প্রবেশ করব গালিবের উত্তরাধিকার ও পুনর্নির্মাণের সেই বিস্ময়কর ইতিহাসে। আমরা দেখব, কীভাবে গালিবের শাগরেদ ও প্রাথমিক জীবনীকারেরা বিশেষ করে আলতাফ হোসেন হালী তাঁর জীবন ও কাব্যের প্রথম প্রামাণ্য দলিল রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তী সমস্ত গালিব-চর্চার ভিত্তি হয়ে ওঠে। তারপর দেখব, বিংশ শতাব্দীতে কীভাবে আবদুর রহমান বিজনৌরী, ড. গোপী চাঁদ নারঙ, রালফ রাসেল এবং আরও অনেকে গালিবের কাব্যের গভীরতর স্তরগুলি উন্মোচন করে গালিব-গবেষণায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। আমরা আরও দেখব, কীভাবে গালিব ক্রমশ কেবল উর্দু সাহিত্যের নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এবং পরিশেষে, আমরা জানব, কীভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও গালিবকে গ্রহণ করেছে, অনুবাদ করেছে, আত্মস্থ করেছে।

এই পর্বের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা গালিব-গবেষণার ধারাবাহিক বিকাশ, এর পদ্ধতি, এর বিতর্ক ও এর অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। যেমনটি বলেছেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "গালিব মৃত্যুর পর যতটা জীবন্ত হয়েছেন, জীবদ্দশায় ততটা ছিলেন না। তাঁর কাব্য যেন এক অমৃতকুম্ভ, যার রস প্রতিটি প্রজন্ম নতুন করে আবিষ্কার করে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৫০)

অধ্যায় ১৯: গালিব-গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস

এক বিস্মৃত কবির পুনরুত্থান

গালিব যখন মারা যান, তখনো তিনি উর্দু সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন কিন্তু সেই স্বীকৃতি ছিল অত্যন্ত সীমিত। দিল্লির একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যগোষ্ঠীর বাইরে তাঁর খ্যাতি তেমন ছড়িয়ে পড়েনি। তাঁর জটিল কাব্যভাষা, দুর্বোধ্য দর্শন ও ফার্সি-মিশ্রিত শব্দভাণ্ডার সাধারণ পাঠকের কাছে ছিল দুরূহ। মুশায়রায় জওকের মতো সরল ও সুরেলা কবিরাই ছিলেন বেশি জনপ্রিয়। গালিব নিজেই এই উপেক্ষার বেদনা বুকে নিয়ে বেঁচেছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু মৃত্যুর পরের দেড়শো বছরে গালিবের খ্যাতি যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আজ তিনি কেবল উর্দু নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষায়। তাঁকে নিয়ে গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে, এবং আগামীতেও হবে। এই পুনরুত্থানের ইতিহাসই হল গালিব-গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস যা একই সঙ্গে সাহিত্যতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাহিনি।

রালফ রাসেল যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের মৃত্যুর পরবর্তী কালে তাঁর যে পুনরাবিষ্কার ঘটেছে, তা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। খুব কম কবিই আছেন, যাঁরা মৃত্যুর পর এতটা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। গালিব সেই বিরলতম প্রতিভাদের একজন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৬৫)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিব-গবেষণার ইতিহাসকে দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করে পর্যালোচনা করব: প্রাথমিক পর্যায় (মৃত্যুর পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত) এবং আধুনিক পর্যায় (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমান পর্যন্ত)। প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে গালিবের শাগরেদ ও প্রাথমিক জীবনীকারেরা, বিশেষ করে আলতাফ হোসেন হালী, গালিবের জীবন ও কাব্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে আবদুর রহমান বিজনৌরী, ড. গোপী চাঁদ নারঙ, রালফ রাসেল এবং অন্যান্য আধুনিক সমালোচকেরা গালিবের কাব্যের গভীরতর স্তরগুলি উন্মোচন করেছিলেন এবং গালিব-চর্চায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

শাগরেদ ও প্রাথমিক জীবনীকার

আলতাফ হোসেন হালী: "ইয়াদগার-এ-গালিব" প্রথম প্রামাণ্য জীবনী

গালিব-গবেষণার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম হল আলতাফ হোসেন হালী (১৮৩৭-১৯১৪)। হালী ছিলেন গালিবের শাগরেদ, অর্থাৎ সাহিত্যিক শিষ্য। জীবনের শেষ বছরগুলিতে গালিবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং গালিবের মৃত্যুর পর হালীই প্রথম গালিবের একটি প্রামাণ্য জীবনী ও কাব্য-সমালোচনা রচনা করেন। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত "ইয়াদগার-এ-গালিব" (গালিবের স্মৃতি) গ্রন্থটি আজও গালিব-গবেষণার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

হালী ছিলেন নিজেও একজন বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও সমাজসংস্কারক। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আলিগড় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি উর্দু সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু গালিবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, এবং "ইয়াদগার-এ-গালিব" রচনার মধ্য দিয়ে তিনি গুরুর প্রতি তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "হালীর 'ইয়াদগার-এ-গালিব' কেবল একটি জীবনী নয়, বরং এক সাহিত্যিক ইতিহাসও। এতে হালী গালিবের জীবন, ব্যক্তিত্ব, কাব্যশৈলী ও সাহিত্যিক অবদানের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকেছেন, যা পরবর্তী সমস্ত গালিব-গবেষণার ভিত্তি হয়ে আছে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫৪০)

"ইয়াদগার-এ-গালিব"-এর বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য

"ইয়াদগার-এ-গালিব" কেবল একটি জীবনী নয়, বরং একই সঙ্গে আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ, কাব্যসমালোচনা এবং সাহিত্যিক ইতিহাস। গ্রন্থটিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আছে গালিবের জীবনী জন্ম, বংশপরিচয়, শৈশব, কৈশোর, দিল্লি গমন, বিবাহ, অর্থসংগ্রাম, রাজদরবারে অবস্থান, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং শেষ জীবন। দ্বিতীয় ভাগে আছে গালিবের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ তাঁর স্বভাব, অভ্যাস, বদান্যতা, আত্মঅহংকার, রসিকতা, মদ্যপান ও জুয়ার প্রতি আসক্তি। তৃতীয় ভাগে আছে গালিবের কাব্যের সমালোচনা তাঁর ফার্সি ও উর্দু রচনার মূল্যায়ন, কাব্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য, এবং সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে তুলনা।

রালফ রাসেল "ইয়াদগার-এ-গালিব" সম্পর্কে লিখেছেন: "হালীর গ্রন্থটি গালিব-গবেষণার জন্য এক অমূল্য দলিল। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, হালী ছিলেন গালিবের শাগরেদ এবং একনিষ্ঠ ভক্ত। ফলে তাঁর মূল্যায়নে কিছুটা পক্ষপাত থাকা স্বাভাবিক। তদুপরি, হালী নিজেও ছিলেন আলিগড় আন্দোলনের সংস্কারক, এবং তিনি গালিবকে সেই আন্দোলনের নিরিখেই কিছুটা বিচার করেছেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'ইয়াদগার-এ-গালিব' আজও গালিব-চর্চার এক অপরিহার্য সূত্র।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৭০)

গালিবের শাগরেদবৃন্দ ও তাঁদের ভূমিকা

হালী ছাড়াও গালিবের আরও কয়েকজন শাগরেদ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, যাঁরা গালিবের জীবন ও কাব্যের তথ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মির্জা তফতা (যিনি গালিবের চিঠির প্রধান প্রাপক ছিলেন এবং সেই চিঠিগুলি সংরক্ষণ করেছিলেন), হাকিম মোমিন খান (যিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং গালিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল), এবং নবাব মুস্তফা খান (যিনি গালিবের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু ছিলেন)।

মির্জা তফতা (জন্ম: ১৮১১, মৃত্যু: ১৮৭৯) ছিলেন গালিবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শাগরেদ ও বন্ধু। গালিবের চিঠিগুলির একটি বড় অংশই তফতাকে লেখা, এবং তফতা সেই চিঠিগুলি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছিলেন। তফতার এই সংরক্ষণশীলতার জন্যই আজ আমরা গালিবের চিঠিপত্রের এত বড় একটি অংশ পেয়েছি। তফতা নিজেও কিছু স্মৃতিচারণ লিখেছিলেন, যাতে গালিবের ব্যক্তিগত জীবন ও স্বভাব সম্পর্কে অনেক অমূল্য তথ্য আছে।

হাকিম মোমিন খান (জন্ম: ১৮০০, মৃত্যু: ১৮৫১) ছিলেন গালিবের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী কবি, কিন্তু একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গালিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল একই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। মোমিন খানের বাড়িতে নিয়মিত সাহিত্যসভা বসত, যেখানে গালিব নিয়মিত যেতেন। এই সভাগুলির বিবরণ থেকে আমরা গালিবের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

অন্যান্য প্রাথমিক জীবনীকার

হালী ছাড়াও ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আরও কয়েকজন গালিবের জীবনী বা স্মৃতিচারণ রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফারহাতুল্লাহ বেগ, যিনি "দিল্লি কী আখেরি শামা" (দিল্লির শেষ মোমবাতি) গ্রন্থে গালিব ও সমসাময়িক দিল্লির এক প্রাণবন্ত চিত্র এঁকেছিলেন। বেগের গ্রন্থটি কেবল গালিবের জীবনী নয়, বরং সমগ্র শেষ মুঘল দিল্লির এক সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

আরেকজন উল্লেখযোগ্য জীবনীকার হলেন মোহাম্মদ হোসেন আজাদ, যিনি "আব-এ-হায়াত" (জীবনের জল) গ্রন্থে উর্দু কবিদের জীবনী ও কাব্যের ইতিহাস লিখেছিলেন। এতে গালিবের ওপর একটি অধ্যায় আছে, যা গালিব-গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তবে আজাদের মূল্যায়ন কিছুটা সমালোচনামূলক তিনি গালিবের কাব্যের জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং গালিবকে উর্দু কাব্যের মূলধারা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলে মনে করতেন।

প্রাথমিক পর্যায়ের গালিব-গবেষণার বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা

প্রাথমিক পর্যায়ের গালিব-গবেষণার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত, এই গবেষণা ছিল প্রধানত জীবনীমূলক ও আত্মজৈবনীমূলক গবেষকেরা গালিবের জীবনের ঘটনা, ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব নিয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন, কাব্যের গভীরতর বিশ্লেষণে তেমন যাননি। দ্বিতীয়ত, এই গবেষণায় গালিবের প্রতি এক ধরনের ভক্তিভাব কাজ করত, যা অনেক সময় নিরপেক্ষ সমালোচনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃতীয়ত, এই গবেষণা ছিল প্রধানত উর্দু ভাষাতেই সীমাবদ্ধ, ফলে গালিবের কাব্য আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারেনি।

তবে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ের গালিব-গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। হালী, তফতা, বেগ প্রমুখের রচনা না থাকলে আমরা গালিবের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আজ যা জানি, তার সিংহভাগই অজানা থেকে যেত। এই গবেষকেরাই প্রথম গালিবের জীবন ও কাব্যকে এক সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের জন্য পথ তৈরি করেছিলেন।

আধুনিক সমালোচনা

আবদুর রহমান বিজনৌরী: "মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব" কাব্যের সৌন্দর্যের সন্ধান

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গালিব-গবেষণায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় আবদুর রহমান বিজনৌরীর (১৮৮৫-১৯১৮) "মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব" (গালিবের কাব্যের সৌন্দর্য) গ্রন্থটির মাধ্যমে। ১৯২১ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি গালিব-সমালোচনার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিজনৌরী প্রথমবারের মতো গালিবের কাব্যকে একটি সুসংহত নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং 'গালিবিয়াত' ধারণাটির প্রবর্তন করেছিলেন।

বিজনৌরী ছিলেন এক প্রতিভাবান তরুণ সমালোচক, যিনি অল্প বয়সেই মারা যান। কিন্তু "মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব" গ্রন্থটি এতটাই মৌলিক ও গভীর ছিল যে, তা গালিব-গবেষণার গতিপথই বদলে দেয়। বিজনৌরী দেখিয়েছিলেন, গালিবের কাব্য কেবল শব্দ ও ছন্দের খেলা নয়, বরং এক সম্পূর্ণ নন্দনতত্ত্বের প্রকাশ। তিনি গালিবের কাব্যের সৌন্দর্যকে 'মহাসিন' (বহুবচন: সৌন্দর্যসমূহ) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং সেই সৌন্দর্যের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করেছিলেন।

নারঙ বিজনৌরীর অবদান সম্পর্কে লিখেছেন: "বিজনৌরীর 'মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব' গালিব-সমালোচনার ইতিহাসে এক মাইলফলক। তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি গালিবের কাব্যকে একটি সুসংহত নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং 'গালিবিয়াত'-এর ধারণা দিয়ে গালিবের কাব্যের মৌলিকতাকে চিহ্নিত করেছিলেন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৬০)

'গালিবিয়াত' ধারণার প্রবর্তন ও বিকাশ

'গালিবিয়াত' শব্দটি বিজনৌরীই প্রথম সুসংহতভাবে ব্যবহার করেন এবং এর ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, 'গালিবিয়াত' হল গালিবের কাব্যের সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যা তাঁকে অন্য সব কবিদের থেকে আলাদা করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রধান হল: ইহামগোই (দ্ব্যর্থবোধকতা), তাজাহগোই (নতুনত্বের সন্ধান), মাজমুন আফিরিনি (নতুন ভাবসৃষ্টি), বিমূর্ততা, দার্শনিকতা, আত্মসচেতনতা এবং এক বিশেষ ধরনের কৌতুকপ্রিয়তা, যা বেদনার মধ্যেও হাসির সঞ্চার করে।

বিজনৌরী লিখেছিলেন: "গালিবিয়াত হল এমন এক কাব্যশৈলী, যেখানে সরল অনুভূতি জটিল বুদ্ধিবৃত্তিকতায় রূপান্তরিত হয়, যেখানে প্রেম দর্শনে পরিণত হয়, যেখানে ব্যক্তিগত বেদনা অস্তিত্ববাদী সংকটে উত্তীর্ণ হয়। গালিবিয়াত কেবল একটি কাব্যশৈলী নয়, বরং এক সম্পূর্ণ জীবনদর্শন।" (বিজনৌরী, ১৯২১: ৪৫)

বিজনৌরীর এই 'গালিবিয়াত' ধারণা পরবর্তীকালে গালিব-গবেষণার একটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হয়ে ওঠে। নারঙ, রাসেল, আজমি সবাই এই ধারণাকে গ্রহণ করেছেন এবং নিজ নিজ বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন। যদিও কেউ কেউ বিজনৌরীর 'গালিবিয়াত' ধারণাকে অতিরিক্ত জটিল ও দুর্বোধ্য বলে সমালোচনা করেছেন, তবু এটা মানতেই হবে যে, বিজনৌরীই প্রথম গালিবের কাব্যের মৌলিকতাকে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামোয় ধরতে চেয়েছিলেন।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ: "উর্দু গজল আওর গালিব" গালিবচর্চায় এক নতুন যুগ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গালিব-গবেষণায় যে বিপ্লব এসেছিল, তার পুরোধা ছিলেন ড. গোপী চাঁদ নারঙ (১৯৩১-২০২২)। নারঙ ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু সমালোচক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক। তাঁর "উর্দু গজল আওর গালিব" (উর্দু গজল ও গালিব) গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং তা গালিব-গবেষণার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

নারঙের গ্রন্থটির বিশেষত্ব হল, তিনি গালিবের কাব্যকে কেবল সাহিত্যিক নয়, বরং দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, গালিবের কাব্য একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের দলিল এবং আধুনিক মানবচেতনার অগ্রদূত। নারঙ গালিবের কাব্যের প্রতীক, অলংকার ও ভাষাবৈচিত্র্য নিয়ে এত বিস্তারিত ও গভীর বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, তাঁর গ্রন্থটি আজও গালিব-গবেষকদের কাছে এক অপরিহার্য রেফারেন্স।

রাসেল নারঙের অবদান সম্পর্কে লিখেছেন: "নারঙ-এর 'উর্দু গজল আওর গালিব' গালিব-গবেষণার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। তিনি গালিবের কাব্যের প্রায় প্রতিটি দিক ভাষা, অলংকার, প্রতীক, দর্শন, ইতিহাস নিয়ে এত গভীর ও ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন যে, তাঁর পরে গালিব-গবেষণা আর আগের মতো থাকতে পারেনি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৭৫)

নারঙ-এর প্রধান অবদান

নারঙ-এর গালিব-গবেষণার কয়েকটি প্রধান অবদান উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, তিনি গালিবের কাব্যকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন, কীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, ইংরেজ শাসনের উত্থান এবং দিল্লির

ধ্বংস গালিবের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তিনি গালিবের ভাষা ও অলংকারের এক বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছিলেন বিশেষ করে ইহাম, তাজাহগোই ও মাজমুন আফিরিনির মতো ধারণাগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, নারঙ গালিবের কাব্যে সুফি দর্শন, বিশেষ করে ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্বের প্রভাব নিয়ে গভীর আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, কীভাবে গালিব সুফি দর্শনের সনাতন প্রতীক ও ধারণাগুলিকে গ্রহণ করে সেগুলিকে নিজের মতো করে রূপান্তরিত করেছিলেন। চতুর্থত, নারঙ গালিবের কাব্যের আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন, কীভাবে গালিব একই সঙ্গে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক ছিলেন।

পঞ্চমত, নারঙ গালিবের কাব্যের পাঠক-প্রতিক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, গালিবের কাব্যে অর্থের যে বহুস্তরীয়তা, তা কীভাবে প্রতিটি প্রজন্মের পাঠককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে এবং কীভাবে এই কারণেই গালিবের কাব্য চিরন্তন ও চিরপ্রাসঙ্গিক।

রালফ রাসেল: ইংরেজি বিশ্বে গালিবের প্রধান ব্যাখ্যাকার

পাশ্চাত্য জগতে গালিবকে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন রালফ রাসেল (১৯১৮-২০০৮)। রাসেল ছিলেন একজন ব্রিটিশ পণ্ডিত, যিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ওপর গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি গালিবের কাব্য ও জীবন নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন এবং ইংরেজি ভাষায় গালিবের এক প্রামাণ্য জীবনী ও কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেছেন।

রাসেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল "Ghalib: Life and Letters" (গালিব: জীবন ও পত্রাবলি), যা ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে রাসেল গালিবের সমগ্র জীবন, কাব্য ও চিঠিপত্রের এক বিস্তারিত ও প্রামাণ্য বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থটি শুধু গালিবের জীবনী নয়, বরং গালিবের চিঠিগুলির ইংরেজি অনুবাদ ও বিশ্লেষণও সংবলিত, যার মাধ্যমে ইংরেজি পাঠকেরা প্রথমবারের মতো গালিবের গদ্যশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

রাসেলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল "The Oxford India Ghalib" (অক্সফোর্ড ইন্ডিয়া গালিব), যা গালিবের নির্বাচিত কবিতা ও চিঠির ইংরেজি অনুবাদ ও বিশ্লেষণ সংবলিত। এছাড়া, রাসেল বিভিন্ন জার্নাল ও সংকলনে গালিবের ওপর অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলি গালিব-গবেষণার অমূল্য সম্পদ।

আজমি রাসেলের অবদান সম্পর্কে লিখেছেন: "রাসেল ইংরেজি বিশ্বে গালিবকে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছেন, তা অপরিসীম। তাঁর অনুবাদ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের পাঠক ও গবেষকেরা গালিবের কাব্যের গভীরতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। রাসেলের লেখা না থাকলে, গালিব হয়তো আজও পাশ্চাত্যে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত থেকে যেতেন।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫৪৫)

রাসেলের গালিব-গবেষণার বৈশিষ্ট্য

রাসেলের গালিব-গবেষণার কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, তিনি ছিলেন একই সঙ্গে একজন ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ ও সাহিত্য সমালোচক ফলে তাঁর গবেষণা ছিল বহুমাত্রিক ও আন্তঃশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয়ত, তিনি গালিবের কাব্যের পাশাপাশি চিঠিগুলির ওপরও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন যা অনেক উর্দু গবেষকেরা করেননি। তৃতীয়ত, তিনি গালিবের কাব্যকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন অত্যন্ত সৃজনশীলতার সঙ্গে, যাতে মূলের কাব্যগুণ রক্ষিত হয়।

চতুর্থত, রাসেল গালিবের জীবন ও কাব্যের বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি গালিবের ভক্ত নয়, বরং এক নিরপেক্ষ গবেষক হিসেবে কাজ করতে চেয়েছিলেন। পঞ্চমত, রাসেল গালিবের কাব্যকে কেবল উর্দু সাহিত্যের নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের অংশ হিসেবে দেখেছিলেন এবং তুলনামূলক সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

অন্যান্য আধুনিক গালিব-গবেষক

নারঙ ও রাসেল ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরও অনেক গালিব-গবেষক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে খলিলুর রহমান আজমি (যাঁর "গালিব: শাখসিয়াত আওর ফন" গ্রন্থটি গালিবের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পের এক চমৎকার বিশ্লেষণ), সৈয়দ আবদুল্লাহ (যিনি "মীর তকী মীর: হায়াত আওর শায়েরি"র মতো গ্রন্থে গালিবের পূর্বসূরিদের নিয়ে কাজ করেছেন), এবং শামসুর রহমান ফারুকি (যিনি উর্দু কাব্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশেষ পারদর্শী এবং গালিবের ওপরও লিখেছেন) উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানে গালিব-গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম হলেন ড. সৈয়দ আবদুল্লা, ড. ওয়াজির আঘা, ড. সলিম আখতার প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই গালিবের কাব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছেন এবং গালিব-গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের বাইরেও আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান ও অন্যান্য দেশে গালিব নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, যা গালিবের বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতিরই প্রমাণ।

গালিব-গবেষণায় বিতর্ক ও মতানৈক্য

গালিব-গবেষণার ইতিহাস কেবল প্রশংসা ও গ্রহণের ইতিহাস নয়, বরং বিতর্ক ও মতানৈক্যেরও ইতিহাস। বিভিন্ন গবেষক গালিবের কাব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং কখনো কখনো তীব্র বিতর্কও হয়েছে। এই বিতর্কগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: গালিবের ফার্সি কাব্য কি উর্দু কাব্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? গালিবের 'ইহামগোই' কি কাব্যের গুণ, না দোষ? গালিব কি সত্যিকারের সুফি, নাকি সংশয়বাদী? ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় গালিবের ভূমিকা কী ছিল তিনি কি ব্রিটিশদের তোষণ করেছিলেন?

নারঙ এই বিতর্কগুলি সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিব-গবেষণায় বিতর্ক ও মতানৈক্য স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর। কারণ, গালিবের কাব্য এতটাই বহুমাত্রিক যে, একে একটিমাত্র ব্যাখ্যায় বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। প্রতিটি গবেষকই নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে গালিবকে দেখেন, এবং এই ভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলির সম্মিলনেই গালিবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৭০)

বাংলা ভাষায় গালিব-গবেষণা

বাংলা ভাষায় গালিব-গবেষণারও একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম গালিবের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন এবং গালিবের জীবন ও কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। নজরুল ছিলেন গালিবের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং গালিবের প্রভাব নজরুলের নিজের কাব্যেও স্পষ্ট। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকেরা গালিবের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং গালিব নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।

বিশেষ করে শঙ্খ ঘোষের গালিব-অনুবাদ ও বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শঙ্খ ঘোষ গালিবের কাব্যের দার্শনিক গভীরতা ও ভাষাসৌন্দর্যকে বাংলায় ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে বেশ সফলও হয়েছিলেন। তাঁর গালিব-অনুবাদগুলি পড়লে বোঝা যায়, গালিবের কাব্য কেবল উর্দুভাষী পাঠকের জন্য নয়, বরং বাংলাভাষী পাঠকের কাছেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও উপভোগ্য।

বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে গালিব নিয়ে গবেষণা ও চর্চা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গালিবের ওপর এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা হচ্ছে, এবং গালিবের কবিতার নতুন নতুন বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। গালিবের কাব্য যেন এক অফুরন্ত খনি, যার প্রতিটি স্তরে নতুন অর্থ ও সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।

এক অমর কবির অমর উত্তরাধিকার

গালিব-গবেষণা ও সমালোচনার এই ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা একটি কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারি: গালিব কেবল তাঁর জীবদ্দশায় নন, মৃত্যুর পরেও ক্রমশ প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। হালীর জীবনী থেকে শুরু করে নারঙ-এর গভীর বিশ্লেষণ, রাসেলের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা ভাষার গালিব-চর্চা এই পুরো ইতিহাসটিই এক মহান কবির ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাবের কাহিনি।

গালিবের কাব্যের সবচেয়ে বড় শক্তি হল, তা কখনো পুরনো হয় না। প্রতিটি প্রজন্মই তাতে নতুন অর্থ খুঁজে পায়, নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। এই কারণেই গালিব আজও আমাদের ভাবান, আনন্দ দেন, আর বাঁচতে শেখান। এবং এই কারণেই গালিব-গবেষণার ইতিহাস কখনো শেষ হবে না যতদিন মানুষ কবিতা পড়বে, গালিব পড়বে, ততদিন গালিবকে নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা চলতেই থাকবে।

নির্বাচিত শের: গালিব-গবেষণা ও সমালোচনার অনুষঙ্গে

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر □واہش پہ □ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিব-গবেষণার ইতিহাস সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পেয়েছেন। আপনি যদি গালিবের কাব্য সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে চান, তাহলে উপরে উল্লিখিত গবেষকদের গ্রন্থগুলি পড়তে পারেন। হালীর "ইয়াদগার-এ-গালিব", বিজনৌরীর "মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব", নারঙ-এর "উর্দু গজল আওর গালিব", এবং রাসেলের "Ghalib: Life and Letters" এই গ্রন্থগুলি গালিব-গবেষণার ভিত্তি, এবং এগুলি পড়লে আপনি গালিবের জীবন ও কাব্যের গভীরতর স্তরগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে গালিব কেবল গবেষক ও সমালোচকদেরই নয়, বরং জনমানসেও স্থান করে নিয়েছিলেন চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে গালিবের উপস্থিতি কতটা গভীর ও বিস্তৃত। আমরা দেখব, কীভাবে গালিব ক্রমশ এক 'জনপ্রিয় কবি' হয়ে উঠেছেন, যাঁর কবিতা আজ সিনেমার পর্দায়, গজলগায়কদের কণ্ঠে, এবং সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

অধ্যায় ২০: লোকমুখে, গানে ও চলচ্চিত্রে গালিব

যখন কবিতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে

কবিতা যখন লেখা হয়, তখন তা কবির একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ। কিন্তু যখন সেই কবিতা লোকমুখে ফেরে, গানে রূপ নেয়, চলচ্চিত্রের পর্দায় ভেসে ওঠে তখন তা আর কেবল কবির থাকে না, বরং হয়ে ওঠে সমগ্র সমাজের, সমগ্র সংস্কৃতির সম্পদ। গালিবের কাব্যের ক্ষেত্রে এই রূপান্তরটি ঘটেছে এক অভূতপূর্ব মাত্রায়। আজ গালিবের শেরগুলি কেবল উর্দু সাহিত্যের পাঠকেরাই পড়েন না, বরং গজলগায়কদের কণ্ঠে, সিনেমার সংলাপে, নাটকের মঞ্চে এবং সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। গালিব সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশের একমাত্র ধ্রুপদী কবি, যিনি একই সঙ্গে বিদ্বজ্জনের গবেষণার বিষয় এবং জনসাধারণের প্রিয় সংগীতের উৎস।

এই রূপান্তরের পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাস যেখানে একদিকে শাস্ত্রীয় গজলগায়কি, অন্যদিকে আধুনিক চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন, এবং আরেকদিকে লোকসংস্কৃতির নানা ধারা গালিবের কাব্যকে গ্রহণ করেছে, পুনর্নির্মাণ করেছে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ড. গোপী চাঁদ নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিব একমাত্র উর্দু কবি, যাঁর কবিতা সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। এই সাফল্য তাঁর কাব্যের সর্বজনীনতা ও কালজয়ীতারই প্রমাণ।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৮০)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে এই বিস্ময়কর যাত্রার দুই প্রধান ধারা পর্যালোচনা করব। প্রথমত, গজল গায়কির স্বর্ণযুগ যেখানে বেগম আখতার, মেহেদী হাসান, জগজিৎ সিং এবং গুলজারের মতো শিল্পীরা গালিবের কবিতাকে সংগীতে রূপ দিয়ে অমর করেছেন। দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র ও নাট্যরূপ যেখানে সোহরাব মোদীর "মির্জা গালিব" থেকে শুরু করে পাকিস্তানি টেলিভিশনের নানা নির্মাণ গালিবের জীবন ও ব্যক্তিত্বকে দৃশ্যমান করেছে। এই দুই ধারার সম্মিলিত ফলশ্রুতিতেই গালিব আজ কেবল কবি নন, বরং এক সাংস্কৃতিক প্রতীক।

গজল গায়কির স্বর্ণযুগ

বেগম আখতার: গালিবের বিষাদময়ী রূপ

গালিবের কবিতাকে শাস্ত্রীয় সংগীতের মাধ্যমে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নাম বেগম আখতার (১৯১৪-১৯৭৪)। বেগম আখতার, যিনি 'আখতারি বাঈ ফৈজাবাদী' নামেও পরিচিত ছিলেন, ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গজল ও ঠুমরি গায়িকা। তাঁর কণ্ঠে গালিবের কবিতা যে বিষাদময়ী গভীরতা লাভ করেছিল, তা আজও অতিক্রম করা যায়নি।

বেগম আখতার গালিবের একাধিক গজল ও শের গেয়েছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল "দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়"। এই গজলটি তাঁর কণ্ঠে এক অপূর্ব বিষাদ ও প্রশান্তির মিশ্রণে ধ্বনিত হয়েছিল। বেগম আখতারের গায়কির বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কবিতার প্রতিটি শব্দের অর্থ ও আবেগকে গভীরভাবে অনুভব করতেন এবং কণ্ঠের কম্পন, লয়ের হেরফের ও সুরের ওঠানামার মধ্য দিয়ে সেই আবেগকে প্রকাশ করতেন। গালিবের জটিল ও দার্শনিক শেরগুলিও তাঁর কণ্ঠে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠত।

খলিলুর রহমান আজমি লিখেছেন: "বেগম আখতার গালিবের কবিতাকে কেবল গানই করেননি, বরং এক নতুন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে গালিবের প্রেমের বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন গালিবের প্রেমিক হৃদয় নিজেই গেয়ে উঠেছে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫৬০)

বেগম আখতার গালিবের আরও বেশ কয়েকটি বিখ্যাত গজল গেয়েছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: "ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা", "হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ", এবং "গুলোন মে রং ভরে"। প্রতিটি গজলেই তিনি গালিবের কবিতার গভীরে প্রবেশ করে তাকে নিজের মনের রঙে রঞ্জিত করেছিলেন। তাঁর গাওয়া গালিব-গজলগুলি আজও রেকর্ডিং-এ শোনা যায় এবং শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

রালফ রাসেল বেগম আখতারের গালিব-গায়ন সম্পর্কে লিখেছেন: "বেগম আখতার সম্ভবত প্রথম শিল্পী, যিনি গালিবের কবিতাকে শাস্ত্রীয় সংগীতের উচ্চ আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর আগে গালিবের কবিতা মুশায়রায় পড়া হতো, কিন্তু তাঁর পরে গালিব হয়ে উঠলেন এক সংগীতযোগ্য কবি, যাঁর প্রতিটি শেরই যেন সুরের অপেক্ষায় থাকে।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৮০)

মেহেদী হাসান: গালিবকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া শিল্পী

বেগম আখতারের পর গালিবের কবিতাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নাম পাকিস্তানের মেহেদী হাসান (১৯২৭-২০১২)। মেহেদী হাসান, যাঁকে 'গজল সম্রাট' বা 'শাহেনশাহ-এ-গজল' বলা হয়, তিনি গালিবের কবিতাকে কেবল শাস্ত্রীয় সংগীতের মঞ্চে নয়, বরং সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রেডিও, টেলিভিশন ও গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে তাঁর গাওয়া গালিবের গজলগুলি উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছিল।

মেহেদী হাসান গালিবের একাধিক বিখ্যাত গজল গেয়েছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল "গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো"। এই গজলটি তাঁর কণ্ঠে এক অনন্য মাধুর্য ও গভীরতা লাভ করেছিল। মেহেদী হাসানের গায়কির বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সুর ও লয়ের এমন এক সংমিশ্রণ ঘটাতেন, যা একই সঙ্গে শাস্ত্রীয় ও জনপ্রিয়। ফলে, তাঁর গাওয়া গজলগুলি রুচিশীল শ্রোতা ও সাধারণ জনতা উভয়ের কাছেই সমাদৃত হতো।

এছাড়া মেহেদী হাসান গেয়েছিলেন "দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়", "রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ", "হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি" প্রভৃতি বিখ্যাত গজল। প্রতিটি গজলেই তিনি গালিবের কবিতার আবেগ ও দর্শনকে সুরের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলেছিলেন।

পাকিস্তানের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক ড. ওয়াজির আঘা মেহেদী হাসানের গালিব-গায়ন সম্পর্কে লিখেছেন: "মেহেদী হাসান গালিবের কবিতাকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠের জাদুতে গালিবের জটিল ও দুর্বোধ্য শেরগুলি এত সহজ ও মধুর হয়ে উঠেছিল যে, যে কেউ তা বুঝতে ও উপভোগ করতে পারত। মেহেদী হাসানই গালিবকে প্রকৃত অর্থে 'জনতার কবি' করে তুলেছিলেন।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৬৮৫)

জগজিৎ সিং ও গুলজার: টেলিভিশন সিরিয়াল "মির্জা গালিব" (১৯৮৮)

গালিবের জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে ১৯৮৮ সালে, যখন ভারতের জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয় গুলজার পরিচালিত টেলিভিশন সিরিয়াল "মির্জা গালিব"। এই সিরিয়ালে গালিবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ, এবং গানগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন জগজিৎ সিং ও চিত্রা সিং। এই সিরিয়ালটি গালিবকে এক নতুন প্রজন্মের কাছে, বিশেষ করে সেই সব ভারতীয়দের কাছে, যাঁরা উর্দু জানেন না, পরিচিত করে দিয়েছিল।

সিরিয়ালটির জন্য জগজিৎ সিং ও চিত্রা সিং গালিবের বেশ কয়েকটি গজল ও শের গেয়েছিলেন, যা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জগজিৎ সিং-এর গায়কি ছিল আধুনিক, সহজ ও সুললিত তিনি শাস্ত্রীয় গজলগায়কির জটিলতাকে পরিহার করে এক সহজিয়া গায়কির মাধ্যমে গালিবের কবিতাকে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর গাওয়া "হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি", "দিল-এ-নাদাঁ", "গুলোন মে রং ভরে" প্রভৃতি গানগুলি রাতারাতি হিট হয়ে গিয়েছিল।

রালফ রাসেল এই সিরিয়াল ও জগজিৎ সিং-এর অবদান সম্পর্কে লিখেছেন: "জগজিৎ সিং গালিবের কবিতাকে আধুনিক কানে শোনার উপযোগী করে তুলেছিলেন। তিনি গালিবের জটিলতাকে সরল করেননি, বরং সুর ও লয়ের এমন এক মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, যা জটিলতাকে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। এই সিরিয়ালের সাফল্য প্রমাণ করে, গালিবের কাব্য কেবল উর্দুভাষী বা শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুরাগীদের জন্য নয়, বরং সর্বসাধারণের জন্য।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৮৫)

সিরিয়ালটির পরিচালক গুলজার নিজেও একজন বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার। তিনি গালিবের জীবন ও কাব্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সিরিয়ালটির মাধ্যমে তিনি গালিবকে একজন মানুষ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন কেবল কবি নয়, বরং এক রক্তমাংসের মানুষ, যাঁর দুঃখ, প্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা ছিল। নাসিরুদ্দিন শাহর অভিনয় ছিল নিঃসন্দেহে অসামান্য তিনি গালিবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, রসবোধ, আত্মঅহংকার ও বেদনাকে অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গজলশিল্পী

বেগম আখতার, মেহেদী হাসান ও জগজিৎ সিং ছাড়াও আরও অনেক শিল্পী গালিবের কবিতা গেয়েছেন এবং গালিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

গোলাম আলী: পাকিস্তানের আরেক বিখ্যাত গজলগায়ক, যিনি গালিবের "ইশরাতে কতরা", "দিল-এ-নাদাঁ" প্রভৃতি গজল গেয়েছেন। গোলাম আলীর গায়কি ছিল গভীর ও আবেগময়, এবং তাঁর কণ্ঠে গালিবের কবিতা এক স্বর্গীয় মাত্রা লাভ করেছিল।

আবিদা পারভীন: পাকিস্তানের বিখ্যাত সুফি গায়িকা, যিনি গালিবের কিছু শের সুফি ঢঙে গেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে গালিবের কবিতার আধ্যাত্মিক দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

হরিহরণ: ভারতের একজন আধুনিক গজলগায়ক, যিনি জগজিৎ সিং-এর ধারায় গালিবের কবিতা গেয়েছেন এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করেছেন।

লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলে: ভারতের এই দুই কিংবদন্তি গায়িকাও গালিবের কবিতা গেয়েছেন, যদিও সংখ্যায় কম।

এই সব শিল্পীর সম্মিলিত অবদানে গালিবের কবিতা সংগীতের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করেছে। আজ গালিবের নাম শুনলেই যে সুরগুলি মনে ভেসে ওঠে, তা এই শিল্পীদেরই দান।

গজল গায়কির প্রভাব: গালিবের জনপ্রিয়তার রহস্য

গজল গায়কি কেন গালিবকে এত জনপ্রিয় করেছিল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে গালিবের কাব্যের প্রকৃতিতে। গালিবের কবিতা ছিল সুরেলা, ছন্দময় ও আবেগময় যা স্বাভাবিকভাবেই সংগীতের জন্য উপযোগী। তদুপরি, গালিবের কবিতার বিষয়বস্তু প্রেম, বেদনা, জগতের নশ্বরতা, মৃত্যু এগুলি এমন সর্বজনীন অনুভূতি, যা সংগীতের মাধ্যমে সহজেই শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছতে পারে।

নারঙ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গালিবের কাব্যের সংগীতায়োজন তাঁর জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণগুলির একটি। গজলগায়কেরা গালিবের কবিতাকে যে সুর দিয়েছেন, তা কবিতার আবেগকে আরও গাঢ় করেছে এবং সাধারণ শ্রোতার কাছেও তা সহজবোধ্য করে তুলেছে। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, যত মানুষ গালিবের কবিতা পড়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ গালিবের কবিতা শুনেছেন।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৯০)

চলচ্চিত্র ও নাট্যরূপ

সোহরাব মোদীর "মির্জা গালিব" (১৯৫৪)

গালিবের জীবন নিয়ে প্রথম বড় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে সোহরাব মোদী পরিচালিত "মির্জা গালিব"। এই চলচ্চিত্রে গালিবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ভগ্নিপতি এবং বিখ্যাত অভিনেতা ভারত ভূষণ। চলচ্চিত্রটি ছিল একটি বায়োপিক, যেখানে গালিবের জীবন, প্রেম, অর্থসংগ্রাম, রাজদরবারে অবস্থান ও শেষ জীবন চিত্রিত হয়েছিল।

চলচ্চিত্রটি সে সময়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এবং গালিবের জীবন ও কাব্যকে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে প্রথমবারের মতো দৃশ্যমান করেছিল। চলচ্চিত্রটির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন গোলাম মোহাম্মদ, এবং গানগুলি গেয়েছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পীরা তালাত মাহমুদ, সুরাইয়া, শমশাদ বেগম প্রমুখ। চলচ্চিত্রটির গানগুলি, বিশেষ করে তালাত মাহমুদের গাওয়া "নুকতাচিন হ্যায় গম-এ-দিল" এবং সুরাইয়ার গাওয়া "গুলোন মে রং ভরে", আজও জনপ্রিয়।

খলিলুর রহমান আজমি এই চলচ্চিত্র সম্পর্কে লিখেছেন: "সোহরাব মোদীর 'মির্জা গালিব' ছিল গালিবের জীবনীভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র, এবং তা গালিবকে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে পরিচিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। চলচ্চিত্রটি গালিবের জীবনকে রোমান্টিক ও নাটকীয় করে তুলেছিল, যা সাধারণ দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। যদিও ঐতিহাসিক সত্যতার প্রশ্নে চলচ্চিত্রটি কিছুটা দুর্বল ছিল, তবু এর সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অপরিসীম।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫৬৫)

চলচ্চিত্রটির গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তালাত মাহমুদের কণ্ঠে গালিবের শের "নুকতাচিন হ্যায় গম-এ-দিল, উস কো সুনায়ে না বনে" (হৃদয়ের দুঃখ খুঁতখুঁতে, তাকে শোনানো যায় না) এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছিল। এই গানটি গালিবের চিঠির অংশ থেকে নেওয়া, যা পরে গানে রূপান্তরিত হয়েছিল। একইভাবে, সুরাইয়ার গাওয়া "গুলোন মে রং ভরে" গানটিও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

পাকিস্তানি টেলিভিশন ও নাটকে গালিব

পাকিস্তানেও গালিবের জীবন ও কাব্য নিয়ে একাধিক টেলিভিশন নাটক ও মঞ্চনাটক নির্মিত হয়েছে। পাকিস্তান টেলিভিশন (পিটিভি) ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে গালিবের ওপর একাধিক প্রামাণ্যচিত্র ও নাটক সম্প্রচার করেছিল, যার মাধ্যমে পাকিস্তানি দর্শকেরা গালিবের জীবন ও কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

পাকিস্তানে গালিবকে নিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মঞ্চনাটকগুলির একটি হল "মির্জা গালিব বন্দর রোড পর", যা লিখেছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ইমতিয়াজ আলী তাজ। এই নাটকে গালিবের কলকাতা সফর ও বন্দর রোডে তাঁর অবস্থান নিয়ে এক কাল্পনিক কাহিনি রচিত হয়েছিল। নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

এছাড়া, পাকিস্তানি টেলিভিশনে গালিবের কবিতা নিয়ে একাধিক সংগীতানুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছে, যেখানে মেহেদী হাসান, গোলাম আলী, আবিদা পারভীন প্রমুখ শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানগুলি গালিবের কবিতাকে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

বলিউডে গালিবের উপস্থিতি

ভারতীয় চলচ্চিত্রে গালিবের কবিতা ও শের বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো সরাসরি গান হিসেবে, কখনো সংলাপ হিসেবে, কখনো বা পটভূমির আবহ হিসেবে। বলিউডের কিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্রে গালিবের কবিতার উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষ করা যায়:

"প্যায়াসা" (১৯৫৭) চলচ্চিত্রে গুরু দত্ত গালিবের একাধিক শের ব্যবহার করেছিলেন, যদিও সরাসরি গান হিসেবে নয়, বরং চরিত্রের মুখে সংলাপ হিসেবে। "বাজার" (১৯৮২) চলচ্চিত্রে গালিবের কবিতা "দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়" একটি গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। "উমরাও জান" (১৯৮১) চলচ্চিত্রে গালিবের একাধিক শের ব্যবহৃত হয়েছিল, যা তৎকালীন লখনউয়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সাম্প্রতিক কালে, "গালিব" নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে, যেখানে গালিবের জীবন ও কাব্যের বিভিন্ন দিক চিত্রিত হয়েছে।

টেলিভিশন সিরিয়াল ও ওয়েব সিরিজে গালিব

১৯৮৮ সালের গুলজারের "মির্জা গালিব" সিরিয়ালের পরেও গালিবের জীবন ও কাব্য নিয়ে একাধিক টেলিভিশন সিরিয়াল নির্মিত হয়েছে। ২০১৭ সালে ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল ডিডি ন্যাশনাল-এ "গালিব" নামে আরেকটি ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয়, যেখানে গালিবের জীবনের বিভিন্ন দিক নাটকীয়ভাবে চিত্রিত হয়েছিল।

ওয়েব প্ল্যাটফর্মেও গালিবের উপস্থিতি বাড়ছে। ইউটিউবে গালিবের কবিতার ওপর অসংখ্য ভিডিও, পডকাস্ট ও আলোচনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ওয়েব সিরিজে গালিবের শের উদ্ধৃত করা হয় সংলাপ হিসেবে। এটি প্রমাণ করে, গালিবের কাব্য ডিজিটাল যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয়।

লোকসংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষের মুখে গালিব

গালিবের কবিতা শুধু গজলগায়ক বা চলচ্চিত্রের গন্ডিতেই আবদ্ধ নেই, বরং তা লোকসংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে গালিবের শেরগুলি প্রবাদ-প্রবচনের মতো লোকমুখে ফেরে। "হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি", "দিল-এ-নাদাঁ", "বাজীচা-এ-আতফাল" এই শেরগুলি এতটাই জনপ্রিয় যে, অনেক সাধারণ মানুষও এগুলি আবৃত্তি করতে পারেন, যদিও তাঁরা হয়তো গালিবের পুরো দিওয়ান পড়েননি।

একইভাবে, গালিবের জীবন নিয়ে অসংখ্য কিংবদন্তি ও লোকগাথা চালু আছে। গালিবের দারিদ্র্য, মদ্যপান, জওকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাহাদুর শাহ জাফরের সঙ্গে সম্পর্ক এসব নিয়ে এত গল্প প্রচলিত যে, গালিব যেন এক কিংবদন্তি চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। এই লোকগাথাগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সন্দেহজনক হলেও, এগুলি গালিবের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসারই প্রমাণ।

নারঙ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গালিব একমাত্র উর্দু কবি, যিনি একই সঙ্গে বিদ্বজ্জনের গবেষণার বিষয় এবং সাধারণ মানুষের মুখের কথা। তাঁর শেরগুলি আজ উর্দু ভাষা না-জানা মানুষও আবৃত্তি করতে পারে, তাঁর জীবন নিয়ে গল্প বলে। এই সাফল্য প্রমাণ করে, গালিবের কাব্য কেবল সাহিত্য নয়, বরং এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক শক্তি।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৬৯৫)

কবিতা যখন জীবন হয়ে ওঠে

গালিবের কবিতা যে কেবল পৃষ্ঠার কালো অক্ষর নয়, বরং জীবন্ত সংস্কৃতির অংশ এই সত্যটি আমরা এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দেখলাম। বেগম আখতারের বিষাদময়ী কণ্ঠ থেকে শুরু করে জগজিৎ সিং-এর আধুনিক গায়কি, সোহরাব মোদীর সিনেমা থেকে গুলজারের টেলিভিশন সিরিয়াল গালিবের কাব্য নানা মাধ্যমে, নানা রূপে, নানা প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে। এবং প্রতিটি মাধ্যমেই গালিবের কবিতা যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে, নতুন অর্থ লাভ করেছে, নতুন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।

এর কারণ সম্ভবত এই যে, গালিবের কবিতায় এমন কিছু আছে, যা চিরন্তন। প্রেম, বেদনা, জগতের নশ্বরতা, মৃত্যু, খুদা এসব বিষয় কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এগুলি মানবজীবনের চিরন্তন প্রশ্ন, এবং গালিব সেই প্রশ্নগুলিকে যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে

প্রকাশ করেছেন, তা সর্বদা, সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। এই কারণেই গালিবের কবিতা শতাব্দী পেরিয়েও পুরনো হয়নি, এবং এই কারণেই গালিব আজ কেবল কবি নন, বরং এক সাংস্কৃতিক প্রতীক।

নির্বাচিত শের: লোকমুখে, গানে ও চলচ্চিত্রে গালিবের অনুষঙ্গে

دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آخر اس درد کی دوا کیا ہے

দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়?
আখির ইস দর্দ কী দাওয়া ক্যা হ্যায়?

(হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এই ব্যথার ঔষধ কী?)

گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে যে গভীর প্রভাব, তা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। এখন আপনি যদি ইউটিউবে যান এবং বেগম আখতার, মেহেদী হাসান বা জগজিৎ সিং-এর গাওয়া গালিবের কোনো গজল শোনেন, তাহলে দেখবেন, গালিবের কবিতা কীভাবে সংগীতের মাধ্যমে আরও গভীর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। আপনি যদি সম্ভব হন, গুলজারের "মির্জা গালিব" সিরিয়ালটিও দেখতে পারেন তা গালিবের জীবন ও কাব্যকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে সাহায্য করবে।

গালিবের কবিতা যে কেবল পড়ার নয়, বরং শোনার, দেখার ও অনুভব করার এই সত্যটি আপনি উপলব্ধি করলে, গালিবের কাব্যের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও গভীর হবে। এবং তখন আপনি বুঝতে পারবেন, কেন গালিব আজও আমাদের ভাবান, আনন্দ দেন, আর বাঁচতে শেখান।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে গালিবের অভ্যর্থনার ইতিহাসে যেখানে আমরা দেখব, কীভাবে কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কবি ও সাহিত্যিকেরা গালিবকে গ্রহণ করেছেন, অনুবাদ করেছেন এবং আত্মস্থ করেছেন। আমরা আরও দেখব, কীভাবে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, জাপানি প্রভৃতি ভাষায় গালিবের কাব্য অনূদিত হয়েছে এবং কীভাবে গালিব ক্রমশ এক বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

অধ্যায় ২১: বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে গালিব

ভাষার সীমানা পেরিয়ে

কবিতা যখন সত্যিকারের মহৎ হয়, তখন সে কোনো একটি ভাষার কারাগারে বন্দি থাকে না। সে পাড়ি দেয় দেশ থেকে দেশে, ভাষা থেকে ভাষায়, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে। গালিবের কাব্যের ক্ষেত্রে এই সত্যটি ঘটেছে এক বিস্ময়কর মাত্রায়। যে কবি নিজের জীবদ্দশায় উর্দুর পরিবর্তে ফার্সিকে বড় করে দেখেছিলেন, সেই কবিই আজ উর্দু ছাড়িয়ে বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, জাপানি পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় অনূদিত ও পঠিত হচ্ছেন। একুশ শতকের বৈশ্বিক সাহিত্য মানচিত্রে গালিব কেবল উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিই নন, বরং বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন।

গালিবের এই বিশ্বজনীন অভ্যর্থনা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস যেখানে একদিকে বাংলা ভাষার কবি ও অনুবাদকেরা গালিবকে নিজেদের ভাষায় এনে এক নতুন প্রাণ দিয়েছেন, অন্যদিকে ইংরেজি ও অন্যান্য প্রধান বিশ্বভাষায় গালিবের অনুবাদ ও গবেষণা তাঁকে বৈশ্বিক পাঠকের কাছে পরিচিত করেছে। ড. গোপী চাঁদ নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের কাব্যের যে সর্বজনীনতা, তা প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অনুবাদের সাফল্যে। যে কবিতা এক ভাষায় লেখা হয়েও অন্য ভাষায় সমান প্রাসঙ্গিক হতে পারে, তাই প্রকৃত মহৎ কবিতা।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৭০০)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে অভ্যর্থনার এই চিত্তাকর্ষক ইতিহাস পর্যালোচনা করব। প্রথম অংশে দেখব, কীভাবে কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কবি ও অনুবাদকেরা গালিবকে গ্রহণ করেছেন, অনুবাদ করেছেন, এবং বাংলা কাব্যের অঙ্গ করে তুলেছেন। দ্বিতীয় অংশে দেখব, কীভাবে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে গালিব বিশ্বসাহিত্যের মঞ্চে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এবং কীভাবে ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কোর গালিব শতবর্ষ উদযাপন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলা অনুবাদ-চর্চা

কাজী নজরুল ইসলাম: গালিবের প্রথম সার্থক বাংলা রূপান্তর

বাংলা ভাষায় গালিবের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) হাত ধরে। নজরুল ছিলেন একই সঙ্গে বিদ্রোহী কবি, সংগীতকার ও অনুবাদক। তিনি উর্দু ভাষা ভালো জানতেন এবং উর্দু-ফার্সি কাব্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। গালিবের কাব্যের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিক দুজনেই ছিলেন প্রথাবিরোধী, স্বাধীনচেতা, এবং প্রেম ও দ্রোহের কবি।

নজরুল গালিবের বেশ কিছু গজল বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়", "হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি", এবং "গুলোন মে রং ভরে"। নজরুলের অনুবাদের বিশেষত্ব ছিল, তিনি আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করেছিলেন মূল কবিতার ভাব, সুর ও আবেগকে বাংলায় ধরতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর অনুবাদগুলি বাংলা পাঠকের কাছে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। একই সঙ্গে, নজরুল গালিবের কাব্যের সংগীতায়োজনও করেছিলেন গালিবের শেরগুলিকে তিনি সুর দিয়ে গানে রূপান্তরিত করেছিলেন, যা তখনকার বাংলা সংগীত জগতে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিল।

খলিলুর রহমান আজমি নজরুলের গালিব-অনুবাদ সম্পর্কে লিখেছেন: "নজরুল কেবল গালিবের কবিতার অনুবাদকই ছিলেন না, বরং ছিলেন গালিবের কাব্যের একজন গভীর অনুরাগী ও ব্যাখ্যাকার। তিনি গালিবের জটিল দর্শন ও ইহামগোইকে বাংলা ভাষায় ধরতে চেয়েছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছিলেন। নজরুলের হাত ধরেই বাংলা ভাষার পাঠক প্রথম গালিবের গভীরতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫৭০)

নজরুলের গালিব-প্রীতি কেবল অনুবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি গালিবের জীবন ও কাব্য নিয়ে একাধিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন, যেখানে তিনি গালিবের ব্যক্তিত্ব, দর্শন ও কাব্যশৈলীর প্রশংসা করেছিলেন। নজরুল নিজেও গালিবের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন নজরুলের গজল ও শ্যামাসংগীতে যে দার্শনিক গভীরতা ও প্রেমের তীব্রতা দেখা যায়, তার পেছনে গালিবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বলা যায়, নজরুলের মাধ্যমে গালিব বাংলা সাহিত্যেরই একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু ও আধুনিক বাংলা গালিব-চর্চা

নজরুলের পর বাংলা ভাষায় গালিব-চর্চার দ্বিতীয় বড় নাম বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, সমালোচক ও সম্পাদক। তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কাব্যচেতনার প্রবর্তক ছিলেন এবং

বিশ্বসাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। গালিবের কাব্যের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং গালিবের কিছু কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসুর গালিব-অনুবাদ ছিল অনেক বেশি আধুনিক ও কাব্যিক। তিনি আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে কাব্যিক পুনর্নির্মাণকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর অনুবাদে গালিবের শেরগুলি যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে মূল উর্দুর সুর ও ভাব বজায় রেখেও সেগুলি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র বাংলা কবিতা। বুদ্ধদেব বসু গালিবের প্রেমের কবিতাগুলি বিশেষ পছন্দ করতেন এবং সেগুলির অনুবাদে তিনি এক ধরনের রোমান্টিক সৌন্দর্য এনেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু গালিবকে নিয়ে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধও লিখেছিলেন, যেখানে তিনি গালিবের কাব্যের আধুনিকতা ও বিশ্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "গালিব কেবল উর্দু কবিতার নন, বরং বিশ্বকাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, যেন তিনি আজকের মানুষের হয়ে কথা বলছেন। এই আধুনিকতাই গালিবকে চিরন্তন করেছে।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৭০৫)

শঙ্খ ঘোষ: গালিব-অনুবাদের এক নতুন উচ্চতা

বাংলা ভাষায় গালিব-অনুবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম সম্ভবত শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১)। শঙ্খ ঘোষ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, সমালোচক ও অনুবাদক। তিনি গালিবের কাব্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং গালিবের একটি বৃহৎ অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদগুলি "গালিব: নির্বাচিত কবিতা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

শঙ্খ ঘোষের গালিব-অনুবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি গালিবের কাব্যের প্রতিটি স্তর ভাষা, অলংকার, দর্শন, ইহাম বাংলায় ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করেছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর অনুবাদে গালিবের কবিতা একই সঙ্গে বাংলা ও উর্দু দুই ভাষার সৌন্দর্যই ধারণ করেছে।

রালফ রাসেল শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ সম্পর্কে লিখেছেন: "শঙ্খ ঘোষের গালিব-অনুবাদ কেবল অনুবাদ নয়, বরং এক সৃজনশীল পুনর্নির্মাণ। তিনি গালিবের কবিতাকে বাংলা ভাষায় এমনভাবে এনেছেন যে, মনে হয়, গালিব যেন বাংলাতেই লিখছেন। এই সাফল্য অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন, এবং শঙ্খ ঘোষ তা করতে পেরেছেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৯০)

শঙ্খ ঘোষ গালিবের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি প্রতিটি শেরের একাধিক অনুবাদ করতেন, তারপর তার মধ্য থেকে সেরাটি বেছে নিতেন। তিনি বলতেন, "গালিবের প্রতিটি শের যেন একটি বহুস্তরীয় রত্ন একটি অনুবাদ কখনো তার পুরো সৌন্দর্য ধরতে পারে না। তাই একাধিক অনুবাদ করা প্রয়োজন, যাতে বিভিন্ন স্তরগুলি প্রকাশ পায়।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৭১০)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য

শঙ্খ ঘোষ ছাড়াও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বাংলা কবি ও সাহিত্যিক গালিবের কবিতা অনুবাদ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০) ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি ও অনুবাদক, যিনি দীর্ঘকাল জার্মানিতে বসবাস করেছিলেন। তিনি গালিবের কবিতাকে বাংলা ও জার্মান দুই ভাষাতেই অনুবাদ করেছিলেন এবং গালিবের কাব্যের আন্তর্জাতিক বিস্তারে অবদান রেখেছিলেন। অলোকরঞ্জনের অনুবাদে গালিবের দার্শনিক গভীরতা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তি কবি, যিনি নিজের জীবনযাপনেও গালিবের মতোই স্বাধীনচেতা ও বোহেমিয়ান ছিলেন। তিনি গালিবের কিছু কবিতা অনুবাদ করেছিলেন, এবং তাঁর অনুবাদে গালিবের রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় গালিবকে নিজের কবিজীবনের এক আদর্শ মনে করতেন।

এছাড়াও, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক কবি ও অনুবাদক গালিবের কবিতা নিয়ে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, এবং সাম্প্রতিক কালে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ প্রমুখ। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে গালিবকে বাংলায় এনেছেন এবং বাংলা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

বাংলা অনুবাদের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য

গালিবের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর কারণ কয়েকটি। প্রথমত, উর্দু ও বাংলা দুই ভিন্ন ভাষাপরিবারের সদস্য উর্দু ইন্দো-ইউরোপীয়, বাংলা ইন্দো-আর্য। ফলে ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য। দ্বিতীয়ত, গালিবের কাব্যভাষা অত্যন্ত ফার্সি-মিশ্রিত, এবং এই ফার্সি শব্দগুলির যে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, তা বাংলায় ধরা কঠিন। তৃতীয়ত, গালিবের কাব্যে ইহাম (দ্ব্যর্থবোধকতা)-এর যে জটিল ব্যবহার, তা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলা অনুবাদের ইতিহাস একটি সাফল্যের ইতিহাস। নজরুল থেকে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত বাংলা অনুবাদকেরা গালিবের কাব্যের মূল ভাব, সুর ও সৌন্দর্যকে বাংলায় ধরতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের অনুবাদ কেবল অনুবাদ নয়, বরং এক সৃজনশীল পুনর্নির্মাণ যেখানে গালিবের কবিতা বাংলা ভাষায় নতুন করে জন্ম নিয়েছে। এই সাফল্যের কারণ সম্ভবত এই যে, বাংলা কবিতারও রয়েছে এক সমৃদ্ধ ধারা, যা গালিবের কাব্যের গভীরতা ও জটিলতাকে ধারণ করতে সক্ষম।

আজমি বাংলা অনুবাদের এই সাফল্য সম্পর্কে লিখেছেন: "বাংলা ভাষায় গালিবের অনুবাদ যে সফল হয়েছে, তার প্রমাণ এই যে, বাংলাভাষী পাঠকেরা গালিবকে নিজেদের কবি বলেই মনে করেন। গালিবের শেরগুলি আজ বাংলা সাহিত্যেরই অংশ, এবং বাংলা ভাষার কবিদের কাছে গালিব এক চিরপ্রেরণার উৎস।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫৭৫)

বিশ্ব দরবারে গালিব

ইংরেজি ভাষায় গালিব: রাসেল ও অন্যান্য অনুবাদক

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে গালিব বিশ্বসাহিত্যের মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। ইংরেজি অনুবাদকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম রালফ রাসেল, যাঁর কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত বলেছি। রাসেলের "Ghalib: Life and Letters" ও "The Oxford India Ghalib" গ্রন্থদুটি ইংরেজি ভাষায় গালিব-চর্চার ভিত্তি। রাসেলের অনুবাদগুলি ছিল নির্ভরযোগ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, এবং সেগুলির মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের পাঠকেরা প্রথম গালিবের কাব্যের গভীরতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

রাসেল ছাড়াও আরও কয়েকজন ইংরেজি অনুবাদক উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আছেন এ. কে. রামানুজন, যিনি গালিবের কবিতাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং গালিবের কাব্যের সার্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আছেন আদ্রিয়েন রিচ, যিনি গালিবের কবিতাকে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন। আছেন ডেভিড ম্যাথুজ, যিনি গালিবের জীবনী ও কাব্য নিয়ে ইংরেজিতে লিখেছেন।

সাম্প্রতিক কালে, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গালিবের ওপর কোর্স পড়ানো হয়, এবং গবেষণা হচ্ছে। হার্ভার্ড, কলাম্বিয়া, শিকাগো, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গালিবের কাব্য নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে, গালিব কেবল দক্ষিণ এশিয়ার কবি নন, বরং বিশ্বসাহিত্যের একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব।

অন্যান্য ভাষায় গালিব: ফরাসি, জার্মান, রুশ, জাপানি

ইংরেজি ছাড়াও বিশ্বের আরও অনেক ভাষায় গালিব অনূদিত হয়েছেন। ফরাসি ভাষায় গালিবের অনুবাদ করেছেন ফরাসি প্রাচ্যবিদেরা, যাঁরা উর্দু ও ফার্সি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। জার্মান ভাষায় গালিবের অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও অন্যান্য জার্মান প্রাচ্যবিদ। রুশ ভাষায় গালিবের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে গালিবকে নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। এমনকি জাপানি ভাষাতেও গালিবের কবিতা অনূদিত হয়েছে এবং জাপানি পাঠকেরা গালিবের হাইকু-সদৃশ সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর শেরগুলির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গালিবের অনুবাদের এই ব্যাপ্তি প্রমাণ করে, গালিবের কাব্যে এমন কিছু আছে যা ভাষা ও সংস্কৃতির সীমানা অতিক্রম করে যায়। প্রেম, বেদনা, মৃত্যু, খুদা এই সব সর্বজনীন বিষয় গালিবের কাব্যে যে অনন্য ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের পাঠককেই আকর্ষণ করে।

নারঙ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "গালিবের কাব্যের অনুবাদ-যোগ্যতা প্রমাণ করে, তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন বিশ্বকবি। তাঁর কবিতা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় গেলেও তার মূল সৌন্দর্য ও গভীরতা অটুট থাকে এমন সাফল্য খুব কম কবির ক্ষেত্রেই দেখা যায়।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৭১৫)

ইউনেস্কোর ১৯৬৯ সালের গালিব শতবর্ষ উদযাপন

বিশ্ব দরবারে গালিবের স্বীকৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯৬৯ সালে, যখন ইউনেস্কো গালিবের মৃত্যু শতবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ইউনেস্কো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রসারে কাজ করে। তারা কোনো কবির মৃত্যু শতবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নিলে তা সেই কবির বিশ্বজনীন গুরুত্বেরই স্বীকৃতি।

১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, গালিবের মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পরে, সারা বিশ্বে গালিব শতবর্ষ উদযাপিত হয়। ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গজল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গালিব শতবর্ষ পালিত হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান উভয়েই গালিবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ভারত সরকার এই উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। পাকিস্তানেও একইভাবে স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশিত হয়। দিল্লিতে গালিবের বল্লিমারানের হাভেলিটি সংস্কার করে একটি জাদুঘর ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, যা আজও গালিব-গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। করাচি, লাহোর, ঢাকা, কলকাতা সর্বত্রই গালিব শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাসেল এই শতবর্ষ উদযাপন সম্পর্কে লিখেছেন: "১৯৬৯ সালের ইউনেস্কোর গালিব শতবর্ষ উদযাপন ছিল গালিবের বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতির চূড়ান্ত ঘটনা। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে গালিব কেবল উর্দু বা ভারতীয় উপমহাদেশের কবি নন, বরং সমগ্র মানবজাতির কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৫৯৫)

বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিয়ায় গালিব

গালিবের কাব্য আজ বিশ্বের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো বটেই, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য বা বিশ্বসাহিত্যের কোর্সে গালিব পড়ানো হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "গালিব অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ মডার্ন উর্দু পোয়েট্রি" নামে একটি কোর্স আছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ফ্রান্সেস প্রিচেট গালিবের ওপর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন, যেখানে গালিবের কবিতা, জীবনী ও গবেষণা প্রবন্ধ সংকলিত আছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর সি. এম. নইম গালিব নিয়ে গবেষণা করেছেন ও লিখেছেন।

এছাড়া, গালিবের কবিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্স নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের গালিব ইনস্টিটিউট, পাকিস্তানের গালিব একাডেমি, লন্ডনের গালিব সোসাইটি এসব প্রতিষ্ঠান গালিব-গবেষণা ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বকবি হিসেবে গালিব: একটি মূল্যায়ন

গালিবকে বিশ্বকবি বলার পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর সর্বজনীনতা প্রেম, বেদনা, মৃত্যু, খুদা, সময়, জগতের নশ্বরতা ইত্যাদি মানবজীবনের চিরন্তন প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কাব্যভাষা ও অলংকারের অসামান্যতা যা অনুবাদেও অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকে। তৃতীয়ত, তাঁর ব্যক্তিত্বের আধুনিকতা একজন সংশয়বাদী, আত্মসচেতন, স্বাধীনচেতা মানুষ, যিনি আজকের পাঠকের কাছেও সমান প্রাসঙ্গিক। চতুর্থত, বিভিন্ন মাধ্যমে সংগীত, চলচ্চিত্র, নাটক তাঁর কবিতার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা।

নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিব বিশ্বকবি এই অর্থে যে, তাঁর কবিতা কাল, দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির সীমানা অতিক্রম করে গেছে। যে কবিতা উনিশ শতাব্দীর দিল্লিতে লেখা হয়েও একুশ শতাব্দীর নিউইয়র্ক, টোকিও বা প্যারিসের পাঠককে ভাবাতে পারে, সেই কবিতাই প্রকৃত মহৎ কবিতা।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৭২০)

এক অফুরন্ত যাত্রা

বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে গালিবের অভ্যর্থনার ইতিহাস একটি অফুরন্ত যাত্রার কাহিনি। নজরুল থেকে শঙ্খ ঘোষ, রাসেল থেকে নারঙ প্রতিটি অনুবাদক ও গবেষক গালিবের কাব্যের নতুন স্তর উন্মোচন করেছেন, নতুন অর্থ আবিষ্কার করেছেন, নতুন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং এই যাত্রা কখনো শেষ হবে না কারণ গালিবের কাব্যে এমন এক অফুরন্ত গভীরতা আছে, যা প্রতিটি প্রজন্মের পাঠক ও গবেষককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

গালিবের একটি বিখ্যাত শের দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে, যে শেরটি নিজেই অনুবাদের সীমাবদ্ধতা ও গালিবের কাব্যের অফুরন্ততা দুটোরই প্রতীক:

ہم سخن فہم ہیں، غالبؔ کے طرفدار نہیں
دیکھیے، کہہ دوں گا کیا، اس کی طرح دار نہیں

হম সুখন-ফহম হ্যায়, 'গালিব' কে তরফদার নহীঁ
দেখিয়ে, কহ দুঁগা ক্যা, উস কী তরহ দার নহীঁ

(আমরা কবিতা বুঝি, গালিবের পক্ষপাতী নই। দেখি, কী বলতে পারি তার মতো দার (বাকপটু) তো নই।)

এই শেরে গালিব নিজেই যেন অনুবাদক ও সমালোচকদের উদ্দেশে বলছেন: "আমার কবিতা বোঝা সহজ নয়, এবং আমি যেভাবে বলেছি, সেভাবে বলা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।" তবু, নজরুল, শঙ্খ ঘোষ, রাসেল, নারঙ সবাই চেষ্টা করেছেন, এবং চেষ্টা করে চলেছেন। এবং এই চেষ্টাই গালিবের কাব্যের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

নির্বাচিত শের: বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে গালিবের অনুষঙ্গে

دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آ□ر اس درد کی دوا کیا ہے

দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়?
আখির ইস দর্দ কী দাওয়া ক্যা হ্যায়?

(হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এই ব্যথার ঔষধ কী?)

گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো
চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

(ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।)

ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে অভ্যর্থনার ইতিহাস সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পেয়েছেন। এখন আপনি যদি কোনো বাংলা অনুবাদে গালিব পড়েন, তাহলে মূল উর্দুর সঙ্গে তুলনা করে দেখার চেষ্টা করুন কী গেল, কী এল, কীভাবে অনুবাদক গালিবের ভাবকে ধরেছেন। আপনি নিজেও চেষ্টা করতে পারেন, গালিবের একটি প্রিয় শের বাংলায় অনুবাদ করার। দেখবেন, অনুবাদ কত কঠিন কাজ, এবং একই সঙ্গে কত আনন্দেরও।

এছাড়া, আপনি যদি ইংরেজি জানেন, তাহলে রালফ রাসেলের অনুবাদ পড়ে দেখতে পারেন তা গালিবকে আরেকটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে সাহায্য করবে। গালিবের কাব্যের অফুরন্ত সৌন্দর্য কেবল এক ভাষায়, এক অনুবাদে ধরা যায় না; প্রতিটি ভাষা, প্রতিটি অনুবাদই গালিবের নতুন একটি মুখ উন্মোচন করে। এই আবিষ্কারের আনন্দ আপনার জন্য চিরন্তন হোক।

এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গেই পর্ব ৫ (উত্তরাধিকার ও পুনর্নির্মাণ) সমাপ্ত হচ্ছে। পরবর্তী পর্বে আমরা প্রবেশ করব বইয়ের শেষ অংশে পরিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় রসদ, যেখানে থাকবে গালিবের কালপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি, এবং ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ও শব্দের অভিধান। এগুলি আপনার ভবিষ্যতের গালিব-চর্চার জন্য এক মূল্যবান রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।

পর্ব ৬: প্রাসঙ্গিক রসদ

একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের শেষ প্রান্তে এসে পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন জাগে: যাঁকে নিয়ে এত কথা হল, তিনি নিজে কী বলতেন? সমসাময়িকেরা কীভাবে তাঁকে দেখতেন? এবং তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি সময়ের কোন বিন্দুতে ঘটেছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্যই পর্ব ৬-এর পরিকল্পনা। এখানে আমরা গালিবের জীবন ও কাব্যের সেই সব প্রাসঙ্গিক রসদ উপস্থাপন করব, যা বইটিকে একই সঙ্গে সমৃদ্ধ করবে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স গ্রন্থের মর্যাদা দেবে।

এই পর্বে তিনটি অধ্যায় থাকবে। প্রথম অধ্যায়ে (অধ্যায় ২২) আমরা গালিবের নিজস্ব বয়ান শুনব তাঁর চিঠিপত্র ও শের থেকে সরাসরি উদ্ধৃতির মাধ্যমে তিনি নিজেকে কীভাবে দেখতেন, নিজের জীবন, দারিদ্র্য, ধর্ম, প্রেম, মৃত্যু ও কাব্য সম্পর্কে কী ভাবতেন, তা জানব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অধ্যায় ২৩) আমরা শুনব সমসাময়িকদের কণ্ঠস্বর বন্ধু, শত্রু, শাগরেদ ও সমালোচকেরা গালিবকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে (অধ্যায় ২৪) আমরা একটি বিস্তারিত কালপঞ্জি ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা উপস্থাপন করব, যা গালিব-চর্চার জন্য এক প্রয়োজনীয় রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবকে বোঝার জন্য কেবল সমালোচকের নয়, স্বয়ং গালিবের নিজের কণ্ঠস্বর শোনা অপরিহার্য। তিনি নিজের সম্পর্কে এত কিছু লিখেছেন, এত স্পষ্টভাষী ছিলেন যে, তাঁর আত্ম-পরিচয়ের চেয়ে বড় জীবনী আর হতে পারে না।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৭৩০)

অধ্যায় ২২: গালিবের নিজস্ব বয়ান

যখন গালিব নিজেই বলেন

গালিবের মতো স্পষ্টভাষী, আত্মসচেতন ও রসবোধসম্পন্ন কবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশ্বস্ত জীবনীকার তিনি নিজেই। তাঁর চিঠিগুলি পড়লে মনে হয়, তিনি যেন পাঠকের পাশে বসে কথা বলছেন নিজের সাফল্য-ব্যর্থতা, আনন্দ-বেদনা, অহংকার-আত্মগ্লানি, সবকিছু খোলামেলাভাবে বলে দিচ্ছেন। আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "গালিবের চিঠিগুলি কেবল চিঠি নয়, বরং এক একটি আত্মজৈবনিক রচনা। প্রতিটি চিঠিতে গালিব নিজের জীবনের কোনো না কোনো দিক, কোনো না কোনো অনুভূতি, কোনো না কোনো চিন্তা প্রকাশ করেছেন।" (হালী, ১৮৯৭: ১৫৫)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের নিজস্ব বয়নের উপর ভিত্তি করে তাঁর আত্ম-পরিচয় রচনা করব। এখানে গবেষকদের বিশ্লেষণ নয়, বরং গালিবের নিজের কথা প্রধান তাঁর চিঠিপত্র ও শের থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা দেখব, তিনি নিজেকে কীভাবে দেখতেন। আমরা তাঁর কণ্ঠেই শুনব, তিনি কেমন করে নিজের কবি-সত্তা, দারিদ্র্য, ধর্ম, প্রেম, মৃত্যু ও কাব্য সম্পর্কে ভাবতেন। এবং শেষে আমরা উপলব্ধি করব, গালিবের আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রে ছিল এক গভীর দ্বান্দ্বিকতা একই সঙ্গে অহংকার ও বিনয়, বেদনা ও রসিকতা, বিশ্বাস ও সংশয়।

"আমি কবি, আমি গালিব": আত্মপরিচয় ও অহংকার

গালিব নিজেকে নিয়ে কখনো সন্দিহান ছিলেন না। তিনি জানতেন, তিনি একজন মহৎ কবি, এবং এই জ্ঞান তিনি কখনো লুকোতে চাননি। বরং, নিজের প্রতিভার ঘোষণা ছিল তাঁর চিঠিপত্র ও কাব্যের একটি পুনরাবৃত্ত বিষয়। কিন্তু এই আত্মপ্রচার কখনো নিছক দাম্ভিকতা ছিল না তা ছিল এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল, একই সঙ্গে সমাজের উপেক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিজের অস্তিত্বের সত্যায়ন।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত আত্ম-ঘোষণা তো সেই উক্তি, যা আমরা বহুবার উদ্ধৃত করেছি:

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

এই শেরে গালিব নিজেকে 'আয়না-এ-খুদ-বীন' (আত্মদর্শনের আয়না) বলেছেন। এর অর্থ, তিনি কেবল একজন কবিই নন, বরং এক দার্শনিক সত্তা, যিনি নিজের ভেতরে তাকাতে পারেন, নিজেকে জানতে পারেন। এই আত্মজ্ঞানের জোরেই তিনি সমাজের অংশ হয়েও সমাজের উর্ধ্বে। খলিলুর রহমান আজমি এই শের সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের এই আত্ম-ঘোষণা একই সঙ্গে অহংকার ও সত্য। তিনি সত্যিই ছিলেন আত্মদর্শনের আয়না, এবং এই আয়নায় নিজেকে দেখতে পারার ক্ষমতাই তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছিল।" (আজমি, ১৯৬৯: ৫৮০)

আরেকটি চিঠিতে গালিব নিজের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে লিখেছিলেন: "আমি এমন এক কবি, যাঁর কবিতা সবাই পড়ে, কিন্তু কেউ কেনে না। আমার গজল মুশায়রায় মুশায়রায় গীত হয়, কিন্তু আমার পেটের আগুন কেউ নেভাতে পারে না। আমি সম্মান পাই, কিন্তু সম্মান দিয়ে তো পেট ভরে না।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৪৭০) এই লেখায় একই সঙ্গে অহংকার ও বেদনা আছে তিনি জানেন, তাঁর কবিতা মহৎ, কিন্তু সমাজ সেই মহত্ত্বের মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়।

নিজের ফার্সি কাব্য সম্পর্কে গালিবের গর্ব ছিল আরও বেশি। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমার ফার্সি দেখো, তবেই বুঝবে আমি কেমন কবি।" এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "লোকে আমাকে উর্দু কবি বলে জানে, কিন্তু আমি তো উর্দু কবি নই আমি ফার্সি কবি, যে কিনা উর্দুতেও লেখে। আমার ফার্সি দিওয়ানই আমার প্রকৃত পরিচয়।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৭৪০)

এই আত্মপ্রচারের পেছনে যে বেদনা লুকিয়ে ছিল, তা-ও মাঝেমধ্যে প্রকাশ পেত। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি সারাজীবন স্বীকৃতির জন্য কেঁদেছি, কিন্তু স্বীকৃতি পাইনি। এখন মনে হয়, স্বীকৃতি তো বাহ্যিক অন্তরের সত্য তো আমার কাব্যই। যদি কেউ না-ও পড়ে, তবু আমার শের থেকে যাবে।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৬২) এই লেখায় আত্মপ্রচার ধীরে ধীরে এক দার্শনিক সমর্পণে রূপ নিচ্ছে স্বীকৃতি না পেলেও কাব্য থেকে যাবে, এই বিশ্বাসই তাঁর শেষ সম্বল।

"আমার দারিদ্র্য, আমার দুর্ভাগ্য": অর্থকষ্ট ও নিয়তি

গালিবের জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা ছিল দারিদ্র্য, এবং এই দারিদ্র্য নিয়ে তিনি অকাতরে লিখেছেন কখনো ব্যঙ্গ করে, কখনো কেঁদে, কখনো হেসে। তাঁর চিঠিগুলিতে দারিদ্র্যের এত বর্ণনা আছে যে, মনে হয়, দারিদ্র্যই যেন তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার ঘরে ইঁদুরেরা এখন আর ভয় পায় না। কারণ তারা জানে, আমি তাদের মতোই গরিব আমি তাদের মারব না, বরং তাদের কাছ থেকে ধার চাইব।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৪০০) এই আত্ম-বিদ্রূপের মধ্যে যে দারিদ্র্যের করুণ চিত্র, তা স্পষ্ট। কিন্তু গালিব এই করুণ চিত্রকেও হাসির মাধ্যমে সহনীয় করে তুলেছেন।

আরেক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি এত গরিব যে, যদি কোনোদিন চোর আসে আমার বাড়িতে, তাহলে চোরই আমার দয়া করে কিছু রেখে যাবে।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৬০) এই ধরনের রসিকতা গালিবের দারিদ্র্য-বর্ণনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তিনি কখনো দারিদ্র্যকে গোপন করতে চাননি, বরং তাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়ে তাকে রসিকতার বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন।

পেনশনের জন্য সারাজীবনের লড়াই নিয়ে গালিবের বেদনা ছিল গভীর। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একই লড়াই লড়ছি পেনশনের লড়াই। এই লড়াইয়ে আমি জিতব, না হারব, জানি না। কিন্তু লড়াইটা নিজেই এক শাস্তি। আমি কবি, সৈনিক নই তবু আমাকে সৈনিকের মতো লড়তে হচ্ছে।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২০০) এই লেখায় দারিদ্র্যের কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং মানসিক যন্ত্রণাও ধরা পড়েছে একজন কবিকে সৈনিকের মতো লড়তে হচ্ছে, এটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

তবু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গালিব কখনো সম্পূর্ণ বিদ্রোহ করেননি, বরং নিয়তিকে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত শের এই নিয়তিবাদেরই প্রকাশ:

رنج سے وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

এই শেরে গালিব নিজের দারিদ্র্য ও দুঃখকে এমনভাবে দেখছেন, যেন তা আর দুঃখ নয়, বরং জীবনের স্বাভাবিক অংশ। "মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে" এই বক্তব্যে যে নিয়তিবাদ, তা গালিবের দারিদ্র্য-ভাবনারই পরিণতি।

"আমার ধর্ম, আমার খুদা": ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

গালিবের ধর্মীয় অবস্থান ছিল অত্যন্ত জটিল ও বহুমাত্রিক, এবং তিনি নিজের চিঠিপত্র ও কাব্যে এই জটিলতার কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তিনি কখনো নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করেননি, বরং নিজেকে 'মওহেদ' (একেশ্বরবাদী) বলেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মের রীতিনীতি, নামাজ-রোজা এবং মোল্লা-ওয়ায়েজদের ভণ্ডামির কঠোর সমালোচনা করতেন।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মীয় ঘোষণা:

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

এই শেরে গালিব স্পষ্টভাবেই নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন: তিনি একেশ্বরে বিশ্বাস করেন, কিন্তু ধর্মের বাহ্যিক রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন। এবং তাঁর মতে, প্রকৃত ঈমান তখনই আসে, যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভেদ মিটে যায় অর্থাৎ, ধর্ম যতক্ষণ বিভেদ সৃষ্টি করে, ততক্ষণ তা প্রকৃত ধর্ম নয়।

এক চিঠিতে গালিব নিজের ধর্মীয় অবস্থান আরও স্পষ্ট করে লিখেছিলেন: "নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এসব তো দেহের ইবাদত। আত্মার ইবাদত কী, তা কেউ জানে না। আমি দেহের ইবাদত করতে পারি না, কারণ দেহ তো একদিন মাটি হবে। আত্মার ইবাদত করতে চাই, কিন্তু তার নিয়ম কেউ শেখায়নি।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৪৭০) এই লেখায় গালিব ধর্মের বাহ্যিক আচারকে 'দেহের ইবাদত' বলে চিহ্নিত করছেন এবং 'আত্মার ইবাদত'-এর সন্ধান করছেন যা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম শেখাতে পারে না।

মোল্লা-ওয়ায়েজদের প্রতি গালিবের ব্যঙ্গ ছিল তীব্র। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "ওয়ায়েজ সাহেবেরা বলেন, মদ খেলে নাকি নরকে যেতে হবে। আমি বলি, বেহেশ্তে যদি মদ না থাকে, তাহলে বেহেশ্ত আমার দরকার নেই। আর নরকে যদি মদ থাকে, তাহলে নরকই আমার বেহেশ্ত।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৫৮৫) এই রসিকতার আড়ালে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি এক তীব্র বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে।

তবে গালিব সম্পূর্ণ নাস্তিকও ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর খুদা ছিলেন 'খুদা-এ-বেতালব' এমন এক খুদা, যিনি ইবাদত চান না। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার বেগম সাহেবা মনে করেন, আমি নাস্তিক। অথচ আমি নাস্তিক নই, আমি শুধু সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, যাঁকে পাওয়ার জন্য ইমাম-মোল্লার শরণাপন্ন হতে হয়। আমার খুদা সরাসরি আমার কাছে আসেন, কোনো দালালের প্রয়োজন হয় না।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ২০৮)

"প্রেম, নারী ও জীবন": প্রেম ও জীবনবোধ

গালিবের চিঠিপত্র ও কাব্যে প্রেম ও নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণারও স্পষ্ট প্রকাশ আছে। তিনি প্রেমকে একই সঙ্গে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক হিসেবে দেখতেন এবং নারীকে কেবল দেহের পাত্রী হিসেবে নয়, বরং এক রহস্যময়ী স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখতেন।

তাঁর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে গালিবের বয়ান ছিল মিশ্র একই সঙ্গে ক্ষোভ ও দরদ। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার বেগম সাহেবা মনে করেন, সংসারই একমাত্র ধর্ম। কবিতা, সাহিত্য, আড্ডা এসব তাঁর কাছে শয়তানের কাজ। আমি যখন কবিতা লিখি, তিনি বলেন, 'এই বয়সে এসব শোভা পায় না।' আমি বলি, 'বয়স নয়, মনের বয়স বড় কথা।' তিনি শোনেন না।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২১০) এই লেখায় স্ত্রীর প্রতি যে মৃদু ব্যঙ্গ আছে, তার আড়ালে দাম্পত্য জীবনের দূরত্বও স্পষ্ট।

তবে কেবল ক্ষোভ নয়, স্ত্রীর প্রতি দরদও প্রকাশ করেছেন গালিব। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "বেগম সাহেবা খুব অসুস্থ। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়েছে, কিন্তু ওষুধের চেয়ে বেশি দরকার ভগবানের দয়া। আমি তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকি, কিছু বলতে পারি না, শুধু দেখি। এত বছর একসঙ্গে আছি, অথচ এত দূরে এই ভেবে কষ্ট হয়।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১০২) এই লেখায় গালিব নিজেই স্বীকার করছেন দূরত্বের কথা, এবং সেই দূরত্ব নিয়ে কষ্টও প্রকাশ করছেন।

প্রেম সম্পর্কে গালিবের দার্শনিক ধারণার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর একটি বিখ্যাত শেরে:

محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا
اُسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ د نکلے

মুহব্বত মেঁ নহীঁ হ্যায় ফারাক জীনে আওর মরনে কা
উসি কো দেখ কর জীতে হ্যায় জিস কাফির পে দম নিকলে

(প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা তাকে দেখেই বাঁচি, যে কাফেরের জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়।)

এই শেরে গালিব প্রেমের এক চরম অস্তিত্ববাদী সংজ্ঞা দিচ্ছেন প্রেমে জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য ঘুচে যায়, প্রেমাস্পদ একই সঙ্গে মৃত্যুর কারণ ও জীবনের উৎস।

"মৃত্যু ও সময়": শেষ জীবনের ভাবনা

গালিবের শেষ জীবনের চিঠিগুলিতে মৃত্যু ও সময় সম্পর্কে তাঁর ভাবনার স্পষ্ট প্রকাশ আছে। তিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন না, বরং তাকে এক পরম মুক্তি হিসেবে দেখতেন।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। জীবনই তো ভয়ের, মৃত্যু তো শান্তি। যে মানুষ সাতটি সন্তানের মুখাগ্নি করেছে, যে মানুষ দিল্লিকে ধ্বংস হতে দেখেছে, তার কাছে মৃত্যু কী? একটি মুক্তি, একটি বিশ্রাম।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৫৪৫)

আরেক চিঠিতে আরও স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন: "মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে কী বলব? মৃত্যু আমার কাছে এখন এক পুরনো বন্ধুর মতো, যার আসার কথা জানি, কিন্তু এখনো আসেনি। যখন আসবে, তখন কী হবে তা ভেবে লাভ নেই। কারণ, যখন আসবে, তখন আমি থাকব না ভাবতে।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৫২০) এই লেখায় যে গভীর দার্শনিক প্রশান্তি, তা কেবল তারাই অর্জন করতে পারেন, যাঁরা জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট পেরিয়ে এসেছেন।

নিজের মৃত্যুর আগে গালিব লিখেছিলেন: "আমার যা বলার ছিল, বলে ফেলেছি। আমার যা লেখার ছিল, লিখে ফেলেছি। এখন আর কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এখন শুধু অপেক্ষা যেমন নদী অপেক্ষা করে সমুদ্রে মিশে যাওয়ার জন্য।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩০৫)

"আমার ভাষা, আমার কাব্য": কাব্যিক স্বাতন্ত্র্যবোধ

নিজের কাব্যশৈলী সম্পর্কে গালিব ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। তিনি জানতেন, তাঁর ভাষা জটিল, দুর্বোধ্য কিন্তু তিনি এই জটিলতাকে নিজের শক্তি বলেই মনে করতেন।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি দোকানদার নই যে, ক্রেতার পছন্দ বুঝে মাল তৈরি করব। আমি কবি, আমি যা লিখি, তা আমার আত্মার প্রকাশ। যে বুঝবে, সে বুঝবে; যে বুঝবে না, সে না বুঝুক আমার কিছু যায় আসে না।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৫৫) এই লেখায় গালিবের সাহিত্যিক দর্শন স্পষ্ট তিনি জনপ্রিয়তার জন্য নয়, বরং আত্মপ্রকাশের জন্য লেখেন।

নিজের গদ্যরীতি সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "ম্যায়নে বাতচীত কা আন্দাজ মে লিখা হ্যায়" আমি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখেছি। এবং আরেক চিঠিতে: "আমি যখন লিখি, ভাবি না ফার্সি লিখছি না উর্দু। যা আমার মনে আসে, তাই লিখি। ভাষা আমার কাছে জামার মতো যেটা আরামদায়ক, সেটাই পরি।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৪৬৫)

নিজের দিওয়ান থেকে জনপ্রিয় শের বাদ দেওয়ার ব্যাপারেও গালিবের নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি শুধু সেই শেরগুলিই রাখতে চাই, যেগুলি আমার পরিণত রুচির বিচারে উত্তীর্ণ। বাকিগুলি, যতই জনপ্রিয় হোক, বাদ। কবিতা কেবল জনপ্রিয়তার জন্য হয় না হয় আত্মার জন্য।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৩৬০)

"হাসির আড়ালে বেদনা": রসবোধ ও আত্ম-বিদ্রূপ

গালিবের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর রসবোধ ও আত্ম-বিদ্রূপের ক্ষমতা। তিনি নিজের দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা সবকিছু নিয়েই হাসতে পারতেন। এই হাসি ছিল তাঁর আত্মরক্ষার কৌশল, এবং একই সঙ্গে জীবনের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার প্রমাণ।

নিজের অন্ধত্ব নিয়ে তিনি লিখেছিলেন: "আমার চোখ এখন বিশ্বাসঘাতকতা করছে। যা দেখতে চাই, তা দেখি না; যা দেখতে চাই না, তা চোখের সামনে ভাসে। কবিতা লিখতে পারি, কিন্তু পড়তে পারি না অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনি। কী বিড়ম্বনা!" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১১৫)

নিজের মদ্যপান নিয়ে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "লোকে বলে, মদ হারাম। আমি বলি, যারা মদ খায় না, তাদের মন হারাম তারা জানে না, কী আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত। মদ আমাকে কিছু দেয় না, বরং কেড়ে নেয় আমার দুঃখ, আমার চিন্তা, আমার বেদনা। এই কেড়ে নেওয়াটাই তো মদের সবচেয়ে বড় দান।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২২৫)

গালিবের আত্মপরিচয়ের দ্বান্দ্বিকতা

গালিবের নিজস্ব বয়ান পড়লে আমরা দেখতে পাই, তাঁর আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রে ছিল এক গভীর দ্বান্দ্বিকতা। তিনি একই সঙ্গে অহংকারী ও বিনয়ী, বেদনামথিত ও রসিক, বিশ্বাসী ও সংশয়বাদী, জীবনাসক্ত ও মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষী। এই দ্বান্দ্বিকতাই গালিবকে এক অনন্য মানবিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তিনি কোনো একমাত্রিক চরিত্র নন, বরং বহুমাত্রিক, জটিল, এবং সম্পূর্ণ জীবন্ত এক মানুষ।

নির্বাচিত শের: গালিবের নিজস্ব বয়নের অনুষঙ্গে

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা
ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

(যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের নিজস্ব কণ্ঠস্বর সরাসরি শুনতে পেয়েছেন। এখন আপনি যদি গালিবের চিঠিগুলি সম্পূর্ণ পড়তে পারেন, তাহলে দেখবেন, প্রতিটি চিঠিতেই গালিব নিজের জীবনের একটি নতুন দিক উন্মোচন করছেন কখনো হাসির আড়ালে কান্না, কখনো কান্নার আড়ালে হাসি।

আপনি নিজেও একটি কাজ করতে পারেন: গালিবের একটি প্রিয় শের বেছে নিন, এবং সেই শেরটি সম্পর্কে গালিব যদি নিজে কিছু বলতেন, তাহলে কী বলতেন তা কল্পনা করে একটি চিঠি লিখুন। দেখবেন, গালিবের জগতে প্রবেশ করা আরও সহজ হয়ে উঠবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা শুনব সমসাময়িকদের কণ্ঠস্বর বন্ধু, শত্রু, শাগরেদ ও সমালোচকেরা গালিবকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। আমরা দেখব, জওকের ব্যঙ্গ, বাহাদুর শাহ জাফরের প্রশংসা, হালীর স্মৃতিচারণ এবং আরও অনেকের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে গালিবের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা কতটা বহুরূপী ও কতটা জীবন্ত।

অধ্যায় ২৩: সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে গালিব

এক জীবন, বহু দর্পণ

একজন মানুষকে বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হল, তাকে নিয়ে যাঁরা কাছে ছিলেন, যাঁরা দূর থেকে দেখেছেন, যাঁরা ভালোবেসেছেন এবং যাঁরা বিদ্বেষ করেছেন সবার চোখ দিয়ে দেখা। কারণ, প্রতিটি দৃষ্টিই এক একটি দর্পণ, এবং প্রতিটি দর্পণেই ধরা পড়ে সত্যের একটি অংশ। গালিবের জীবন ও ব্যক্তিত্ব এতটাই বহুমাত্রিক ছিল যে, সমসাময়িকেরা তাঁকে নানা চোখে দেখেছেন কেউ দেখেছেন প্রতিভাবান কবি, কেউ দেখেছেন দাম্ভিক অহংকারী; কেউ দেখেছেন দুর্ভাগা গরিব, কেউ দেখেছেন মদ্যপ জুয়াড়ি; কেউ দেখেছেন প্রাণবন্ত রসিক, কেউ দেখেছেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গকারী। এই সব দৃষ্টির সম্মিলনেই গালিবের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে।

আলতাফ হোসেন হালী লিখেছেন: "গালিবের চরিত্র এতটাই জটিল ছিল যে, একজনের পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ বোঝা অসম্ভব। তিনি একই সঙ্গে এমন সব গুণের অধিকারী ছিলেন, যা পরস্পরবিরোধী মনে হয়। কেউ তাঁর একটি দিক দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কেউ আরেকটি দিক দেখে নিন্দা করেছেন।" (হালী, ১৮৯৭: ১৪৮) রালফ রাসেল যোগ করেছেন: "গালিবের সমসাময়িকদের মূল্যায়নগুলি কেবল তাঁর জীবনী রচনার উপাদান নয়, বরং উনবিংশ শতাব্দীর দিল্লির সাহিত্যসমাজের মানসিকতারও এক উজ্জ্বল দলিল।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৬০০)

এই অধ্যায়ে আমরা গালিবের সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে তাঁর যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা চারটি প্রধান অংশে পর্যালোচনা করব। প্রথমত, প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমালোচকদের দৃষ্টি বিশেষ করে শেখ ইব্রাহীম জওক ও তাঁদের বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দ্বিতীয়ত, পৃষ্ঠপোষক ও রাজকীয় প্রশংসাকারীদের দৃষ্টি বিশেষ করে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। তৃতীয়ত, শাগরেদ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দৃষ্টি বিশেষ করে আলতাফ হোসেন হালী, মির্জা তফতা ও হাকিম মোমিন খান। চতুর্থত, অন্যান্য সমসাময়িক কবি, সমালোচক ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি। এই চার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখব, গালিব তাঁর সমসাময়িকদের কাছে কী ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র, নিন্দার পাত্র, নাকি দুই-ই?

প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমালোচকের দৃষ্টিতে গালিব

শেখ ইব্রাহীম জওক: তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

গালিবের সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শেখ ইব্রাহীম জওক (১৭৮৯-১৮৫৪)। জওক ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের ওস্তাদ ও রাজকবি, এবং দিল্লির সাহিত্যসমাজে তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল। গালিব যখন দিল্লিতে এসে নিজের জায়গা করে নিতে চাইলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই জওকের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল একই সঙ্গে ব্যক্তিগত, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক। দুই কবির কাব্যশৈলীও ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত জওকের ভাষা সরল, সুরেলা ও জনপ্রিয়; গালিবের ভাষা জটিল, দার্শনিক ও দুর্বোধ্য।

জওক গালিবের কাব্য সম্পর্কে কী মনে করতেন, তার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় একটি বিখ্যাত ঘটনা থেকে। কথিত আছে, একবার এক মুশায়রায় গালিব একটি গজল পড়েছিলেন, যার একটি শের ছিল অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। জওক নাকি শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন: "মির্জা সাহেব, আপনি কি আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, নাকি নিজের সঙ্গে?" গালিব উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি, কারণ নিজের সঙ্গেই আমার সবচেয়ে ভালো বোঝাপড়া হয়।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২০১)

ফারহাতুল্লাহ বেগ তাঁর "দিল্লি কী আখেরি শামা" গ্রন্থে জওক-গালিব দ্বন্দ্বের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন: "জওক সাহেব গালিবকে সহ্য করতে পারতেন না, আর গালিব জওককে শ্রদ্ধা করতেন না। দুইজনের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঠোকাঠুকি লেগেই থাকত। জওক বলতেন, 'গালিব উর্দু নষ্ট করছে।' গালিব বলতেন, 'জওক উর্দুকে দোকানদারির ভাষা বানাচ্ছে।'" (বেগ, ১৯০৬: ৯২)

জওকের ব্যঙ্গের একটি বিখ্যাত নমুনা হল তাঁর একটি শের, যা তিনি সরাসরি গালিবকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন বলে কথিত আছে:

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالبؔ
□ر□ تم کو مگر نہیں آتی

কাবা কিস মুঁহ সে জাওগে 'গালিব'
শরম তুমকো মগর নহীঁ আতি

(কেমন মুখে কাবা যাবে হে গালিব, লজ্জা তোমাকে কিন্তু আসে না।)

এই শেরে জওক গালিবের ধর্মীয় উদাসীনতা ও মদ্যপানের প্রতি ইঙ্গিত করছেন যে মানুষ মদ খায়, নামাজ পড়ে না, সে কেমন মুখে কাবা যাবে? গালিব নাকি এর উত্তরে বলেছিলেন: "জওক সাহেব, কাবা যাওয়ার জন্য মুখের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজনের হয় নিয়তের। আর নিয়ত আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখতে পায় না। কাজেই আপনি আমার কাবা যাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে চিন্তিত হবেন না।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ২০১)

জওকের মৃত্যুর পর অবশ্য গালিবের মনোভাবে পরিবর্তন এসেছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "জওক মারা গেছেন। তিনি ছিলেন একজন ভালো কবি। তাঁর মতো সরল ও মাধুর্যপূর্ণ গজল খুব কম লোকে লিখতে পারে।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৬৩) এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও গালিব জওকের কাব্যগুণ স্বীকার করতেন এবং তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়েছিলেন।

অন্যান্য সমালোচক: মোহাম্মদ হোসেন আজাদ

জওক ছাড়াও আরও কয়েকজন সমসাময়িক সমালোচক ছিলেন, যাঁরা গালিবের কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোহাম্মদ হোসেন আজাদ (১৮৩০-১৯১০), যিনি "আব-এ-হায়াত" (জীবনের জল) নামে উর্দু কবিদের এক বিখ্যাত ইতিহাস রচনা করেছিলেন। আজাদ গালিবের কাব্যের জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং গালিবকে উর্দু কাব্যের মূলধারা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলে মনে করতেন।

আজাদ লিখেছিলেন: "গালিবের কাব্যে এমন সব জটিলতা আছে, যা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নয়। তিনি ফার্সি ভাষার এত বেশি ব্যবহার করেছেন যে, তাঁর উর্দু কাব্যও যেন ফার্সি হয়ে গেছে। এটা উর্দু কাব্যের জন্য ভালো লক্ষণ নয়।" (আজাদ, ১৯০৭: ২৩৪) তবে আজাদ এ-ও স্বীকার করেছিলেন যে, গালিবের প্রতিভা ছিল অসামান্য এবং তিনি উর্দু গজলকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আজাদের সমালোচনা ছিল নীতিগত, ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত নয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান: সংস্কারকের দৃষ্টি

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ছিলেন গালিবের সমসাময়িক এবং আলিগড় আন্দোলনের প্রবক্তা। তিনি গালিবের কাব্যের ভক্ত ছিলেন না, বরং গালিবের গদ্য ও চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তবে গালিবের জীবনযাপন মদ্যপান, জুয়া খেলা, ধর্মীয় উদাসীনতা নিয়ে সৈয়দ আহমদ খান উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি চাইতেন, গালিবের মতো প্রতিভাবান মানুষ যদি সমাজসংস্কারে এগিয়ে আসতেন, তাহলে মুসলিম সমাজের অনেক উপকার হতো।

একটি ঘটনা থেকে সৈয়দ আহমদ খানের মনোভাব বোঝা যায়। কথিত আছে, একবার তিনি গালিবকে বলেছিলেন, "মির্জা, আপনি যদি আপনার প্রতিভা সমাজের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতেন, তাহলে আজ আপনার অবস্থা এমন হতো না।" গালিব নাকি উত্তর দিয়েছিলেন: "সৈয়দ সাহেব, আমি সমাজের উন্নতি করি আমার কবিতার মাধ্যমে। যে কবিতা মানুষকে ভাবায়, সে-ই তো সমাজের উন্নতি করে।" (উদ্ধৃত: নারঙ, ১৯৮৫: ৬১০)

রাসেল এই সম্পর্ক সম্পর্কে লিখেছেন: "সৈয়দ আহমদ খান ও গালিব ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর মানুষ একজন সমাজসংস্কারক, অন্যজন স্বাধীনচেতা শিল্পী। কিন্তু দুইজনের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল, যদিও গালিব কখনো সৈয়দ আহমদ খানের সংস্কারবাদী আন্দোলনে যোগ দেননি।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৬০৫)

পৃষ্ঠপোষক ও রাজকীয় প্রশংসাকারীর দৃষ্টিতে গালিব

বাহাদুর শাহ জাফর: সম্রাট-কবির প্রশংসা

গালিবের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর (১৭৭৫-১৮৬২)। জাফর নিজে একজন ভালো কবি ছিলেন এবং গালিবের প্রতিভাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৫৪ সালে জওকের মৃত্যুর পর জাফর গালিবকে নিজের ওস্তাদ ও রাজকবি নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তির মধ্য দিয়ে গালিব যে সম্মান লাভ করেছিলেন, তা ছিল অপরিসীম।

জাফর গালিবের কবিতা সম্পর্কে কী মনে করতেন, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় একটি বিখ্যাত ঘটনা থেকে। কথিত আছে, একদিন দরবারে গালিব একটি গজল পড়ছিলেন। জাফর এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি নিজের গলা থেকে মুক্তার হার খুলে গালিবকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বলেছিলেন: "মির্জা, তুমি সত্যিই 'গালিব' (বিজয়ী) তোমার কবিতার কাছে সবাই পরাজিত।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ৬০)

তবে জাফরের সঙ্গে গালিবের সম্পর্ক ছিল জটিল ও উত্থান-পতনে ভরা। একদিকে জাফর গালিবের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন, অন্যদিকে গালিবের স্পষ্টভাষিতা, ধর্মীয় উদাসীনতা ও দরবারি শিষ্টাচার না মানার প্রবণতা সম্রাটের অস্বস্তির কারণ হতো। জাফর নিজে ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আর গালিব ছিলেন মুক্তচিন্তক। ফলে দুইজনের মধ্যে একটা চাপা টানাপোড়েন সবসময়ই ছিল।

ফারহাতুল্লাহ বেগ লিখেছেন: "সম্রাট গালিবকে ভালোবাসতেন, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। গালিবের রসবোধ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্রাটকে আনন্দ দিত, কিন্তু তাঁর ধর্মীয় উদাসীনতা সম্রাটের মনোভাবের বিরুদ্ধে যেত। ফলে সম্পর্ক ছিল একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী।" (বেগ, ১৯০৬: ৯৫)

জাফরের নির্বাসন ও মৃত্যুর পর গালিব যে গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকেও বোঝা যায়, দুই কবির মধ্যে এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। গালিব লিখেছিলেন: "আবু জাফর সিরাজউদ্দিন বাহাদুর শাহ বিদেশির বন্ধন ও দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ২৮০)

রামপুরের নবাব: নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষক

গালিবের জীবনে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খান (শাসনকাল: ১৭৯৪-১৮৪০) এবং পরে তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব কালবে আলী খান। রামপুরের নবাবেরা ছিলেন গালিবের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও উদার। দিল্লি ও লখনউতে যেখানে গালিব প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা পেতেন, রামপুর ছিল তাঁর ভরসার জায়গা।

হালী লিখেছেন: "রামপুরের নবাব সাহেব গালিবকে মাসিক পেনশন দিতেন, যা ছিল গালিবের শেষ বয়সের প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। এছাড়া নবাব সাহেব মাঝেমধ্যে বিশেষ উপহারও পাঠাতেন। গালিব এই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং নিয়মিত রামপুর যেতেন।" (হালী, ১৮৯৭: ৭৪)

গালিব নিজে রামপুরের নবাবের প্রশংসায় একাধিক কাসিদা লিখেছিলেন এবং চিঠিপত্রে নবাবের উদারতার কথা বারবার উল্লেখ করেছিলেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "রামপুরের নবাব সাহেব আমার প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন, তা আমি কোনোদিন ভুলব না। তিনি কেবল আমার পৃষ্ঠপোষকই নন, বরং এক প্রকৃত বন্ধু, যিনি আমার প্রতিভাকে বুঝেছেন এবং মূল্য দিয়েছেন।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৫৯০)

শাগরেদ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দৃষ্টিতে গালিব

আলতাফ হোসেন হালী: একনিষ্ঠ শিষ্যের মূল্যায়ন

গালিবের শাগরেদদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন আলতাফ হোসেন হালী (১৮৩৭-১৯১৪)। হালী ছিলেন গালিবের জীবনের শেষ বছরগুলির ঘনিষ্ঠ সহচর এবং গালিবের মৃত্যুর পর তিনি "ইয়াদগার-এ-গালিব" (গালিবের স্মৃতি) নামে যে জীবনী রচনা করেছিলেন, তা-ই গালিব-গবেষণার ভিত্তি। হালীর দৃষ্টিতে গালিব ছিলেন একই সঙ্গে এক মহান কবি, এক দুর্বল মানুষ এবং এক প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব।

হালী গালিবের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের কবিতা পড়লে মনে হয়, তিনি যেন কলম নয়, বরং জাদুর কাঠি দিয়ে লেখেন। তাঁর প্রতিটি শের যেন এক একটি রত্ন, যা থেকে আলো ঝরে পড়ে।" (হালী, ১৮৯৭: ১৪২) কিন্তু একই সঙ্গে হালী গালিবের কিছু দুর্বলতার কথাও অকপটে বলেছেন: "গালিবের আত্মঅহংকার এতটাই প্রবল ছিল যে, অনেক সময় তা অপ্রিয় হয়ে উঠত। তিনি নিজের প্রতিভা সম্পর্কে এতটাই সচেতন ছিলেন যে, অন্যের প্রতিভাকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না।" (হালী, ১৮৯৭: ১৪৫)

হালী গালিবের দারিদ্র্য ও অর্থকষ্ট নিয়ে লিখেছেন: "গালিব সারাজীবন অর্থের জন্য লড়েছেন, কিন্তু কখনো অর্থ সঞ্চয় করতে পারেননি। তিনি উপার্জন করতেন, কিন্তু ব্যয় করতেন আরও বেশি। ধার করতেন, ধার শোধ করতেন না। এই কারণে অনেকেই তাঁর ওপর বিরক্ত ছিলেন।" (হালী, ১৮৯৭: ১৪৮)

কিন্তু হালীর মূল্যায়নের সবচেয়ে সুন্দর অংশ হল, তিনি গালিবের মানবিক দিকগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন: "গালিবের রসবোধ ছিল অসামান্য। তিনি নিজের দুঃখ নিয়েও হাসতে পারতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমি এত গরিব যে, যদি কোনোদিন চোর আসে আমার বাড়িতে, তাহলে চোরই আমার দয়া করে কিছু রেখে যাবে।' এই রসিকতাই ছিল তাঁর জীবনের কষ্ট সহ্য করার শক্তি।" (হালী, ১৮৯৭: ১৫০)

হালী গালিবের শেষ দিনগুলির একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন: "শেষ বয়সে গালিব খুব একা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুরনো বন্ধুরা সবাই চলে গেছেন, দিল্লি ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বল্লিমারানের ছোট্ট হাভেলিতে একা বসে থাকতেন, মাঝেমধ্যে একটি শের লিখতেন, মাঝেমধ্যে পুরনো দিনের কথা ভাবতেন। কিন্তু তবু তাঁর মুখের হাসি লেগেই থাকত।" (হালী, ১৮৯৭: ১৫২)

মির্জা তফতা: ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও চিঠির প্রাপক

গালিবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শাগরেদ ছিলেন মির্জা তফতা (১৮১১-১৮৭৯)। তফতাই ছিলেন গালিবের চিঠিগুলির প্রধান প্রাপক, এবং তিনিই সেই চিঠিগুলি সংরক্ষণ করেছিলেন। তফতার কাছে লেখা চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়, গালিব তাঁকে কতটা বিশ্বাস করতেন এবং কতটা খোলামেলা কথা বলতেন। তফতা নিজেও গালিব সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ লিখেছিলেন, যদিও তা সুসংহত গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়নি।

তফতা গালিব সম্পর্কে লিখেছিলেন: "মির্জা গালিব ছিলেন আমার ওস্তাদ, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। আমি যখনই দিল্লি যেতাম, তাঁর বল্লিমারানের হাভেলিতে গিয়ে হাজির হতাম। তিনি আমাকে দেখলেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আর বলতেন, 'আয়, তফতা, বস। তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।' তারপর শুরু হতো আড্ডা কখনো কবিতা, কখনো দর্শন, কখনো হাসিঠাট্টা।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৫৯৫)

তফতা গালিবের দারিদ্র্য ও সংগ্রাম নিয়েও লিখেছেন: "গালিব সারাজীবন অর্থের জন্য কষ্ট করেছেন, কিন্তু কখনো নিজের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেননি। একবার এক ধনী নবাব তাঁকে বলেছিলেন, 'মির্জা, আপনি যদি আমার প্রশংসায় একটি কাসিদা লেখেন, আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব।' গালিব উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার কাসিদার দাম পাঁচ হাজার টাকা, পাঁচশো নয়।' এই ছিল গালিব গরিব, কিন্তু আত্মমর্যাদায় অটল।" (উদ্ধৃত: রাসেল, ১৯৬৯: ৬১০)

হাকিম মোমিন খান: বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী

গালিবের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন হাকিম মোমিন খান (১৮০০-১৮৫১)। মোমিন নিজেও একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন এবং গালিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল একই সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক। মোমিনের বাড়িতে নিয়মিত সাহিত্যসভা বসত, যেখানে গালিব নিয়মিত যেতেন এবং যেখানে গালিবের কবিতার তীব্র সমালোচনাও হতো।

মোমিন গালিব সম্পর্কে বলতেন: "গালিবের কবিতা বোঝা সহজ নয়, কিন্তু একবার বুঝতে পারলে মনে হয়, এর চেয়ে সুন্দর কবিতা হতে পারে না। তবে তাঁর কবিতা সবার জন্য নয় যাঁরা ভাবতে ভালোবাসেন, কেবল তাঁরাই গালিব পড়তে পারেন।" (উদ্ধৃত: হালী, ১৮৯৭: ১৬৫)

মোমিনের সঙ্গে গালিবের বন্ধুত্ব এতটাই গভীর ছিল যে, মোমিনের অকালমৃত্যুতে গালিব অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিলেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "মোমিন চলে গেছে। এখন আমার কে আছে, যে আমার কবিতা বুঝবে, আমার দুঃখ বুঝবে? বন্ধু তো অনেক ছিল, কিন্তু মোমিন ছিল একেবারে আলাদা সে ছিল আমার কবিতার পাঠক, আমার আত্মার সঙ্গী।" (উদ্ধৃত: আজমি, ১৯৬৯: ৬০০)

অন্যান্য সমসাময়িক কবি, সমালোচক ও বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিতে গালিব

ফারহাতুল্লাহ বেগ: স্মৃতিচারণকারী

ফারহাতুল্লাহ বেগ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের একজন লেখক, যিনি "দিল্লি কী আখেরি শামা" (দিল্লির শেষ মোমবাতি) নামে শেষ মুঘল দিল্লির একটি চমৎকার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি গালিব ও তাঁর সমসাময়িকদের নিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। বেগ গালিবকে দেখেছিলেন এক বিলীয়মান সভ্যতার শেষ প্রতিনিধি হিসেবে।

বেগ লিখেছেন: "গালিব ছিলেন দিল্লির শেষ মোমবাতি যে মোমবাতি নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এক অদ্ভুত আলো ছড়িয়েছিল। তাঁর কবিতায় সেই আলো এখনো জ্বলছে, কিন্তু গালিব নিজে চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির একটি পুরো যুগ শেষ হয়ে গেছে।" (বেগ, ১৯০৬: ১০০)

দিল্লির সাধারণ সাহিত্যসমাজ

দিল্লির সাধারণ সাহিত্যসমাজে গালিবের গ্রহণযোগ্যতা ছিল মিশ্র। একদিকে, সবাই স্বীকার করত যে, গালিব একজন অসামান্য প্রতিভাবান কবি। কিন্তু অন্যদিকে, তাঁর জটিল কাব্যভাষা, দুর্বোধ্য দর্শন ও ফার্সি-মিশ্রিত শব্দভাণ্ডার সাধারণ শ্রোতার কাছে দুরূহ ছিল। মুশায়রায় জওকের মতো সরল ও সুরেলা কবিরাই ছিলেন বেশি জনপ্রিয়। গালিব নিজে এই উপেক্ষার বেদনা বুকে নিয়ে বেঁচেছিলেন।

ফারহাতুল্লাহ বেগ লিখেছেন: "মুশায়রায় যখন জওক সাহেব তাঁর সরল ও সুরেলা গজল পড়তেন, সবাই 'ওয়াহ ওয়াহ' করে উঠত। কিন্তু যখন গালিব তাঁর জটিল ও দার্শনিক গজল পড়তেন, শ্রোতারা চুপ করে থাকত হয় বুঝত না, নয় বুঝলেও প্রকাশ করতে সাহস পেত না। গালিব এই নীরবতা দেখে মর্মাহত হতেন, কিন্তু কখনো নিজের শৈলী বদলাননি।" (বেগ, ১৯০৬: ৯৮)

প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের চোখে গালিব

গালিবের প্রতিবেশী ও বল্লিমারানের সাধারণ মানুষেরা গালিবকে কীভাবে দেখতেন, তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের কাছে গালিব ছিলেন এক "পাগল কবি" যিনি সারাদিন ঘরে বসে কী সব লেখেন, মাঝেমধ্যে মদ খান, জুয়া খেলেন, আর নামাজ পড়েন না। কিন্তু একই সঙ্গে, গালিবের রসবোধ ও বদান্যতার জন্যও তিনি স্থানীয়দের কাছে প্রিয় ছিলেন। বলা হয়, গালিব নিজে গরিব হলেও, কেউ তাঁর কাছে এলে খালি হাতে ফেরাতেন না যদি কিছু না থাকত, অন্তত একটি শের শুনিয়ে দিতেন।

হালী একটি মজার ঘটনা লিখেছেন: "একবার গালিবের বাড়ির সামনে দিয়ে এক ফেরিওয়ালা যাচ্ছিল, যে 'মিঠা, মিঠা' বলে চিৎকার করছিল। গালিব ডাকলেন, 'কী মিঠা?' ফেরিওয়ালা বলল, 'মিঠা বাতাশা।' গালিব বললেন, 'আমার কাছে টাকা নেই, কিন্তু একটি শের শোনাতে পারি। তুই যদি এই শের বুঝতে পারিস, তাহলে তোর বাতাশার চেয়েও মিঠা লাগবে।' ফেরিওয়ালা হেসে বলল, 'মির্জা, আপনার শের আমি বুঝব না, কিন্তু আপনার হাসিটাই আমার জন্য যথেষ্ট।'" (হালী, ১৮৯৭: ১৬৮)

বহুরূপী এক মানুষের বহু প্রতিচ্ছবি

গালিবের সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে তাঁর যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা একমাত্রিক নয়, বরং বহুরূপী ও বহুমাত্রিক। জওকের কাছে তিনি ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী ও উদ্ধত অহংকারী; বাহাদুর শাহ জাফরের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় কবি, কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন; হালীর কাছে তিনি ছিলেন একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও দুর্বল মানুষ; মোমিনের কাছে তিনি ছিলেন বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী; সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন পাগল কবি ও প্রাণবন্ত রসিক। এই সব দৃষ্টির সম্মিলনেই গালিবের একটি পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত চিত্র ফুটে ওঠে।

রাসেল যথার্থই লিখেছেন: "গালিব সম্পর্কে সমসাময়িকদের মতামতগুলি পড়লে বোঝা যায়, তিনি কতটা জটিল, কতটা বহুমাত্রিক, কতটা মানবিক ছিলেন। তিনি কেবল কবি ছিলেন না, ছিলেন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ দোষে-গুণে, আনন্দে-বেদনায়, অহংকারে-বিনয়ে ভরা এক জীবন্ত সত্তা।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৬১৫)

নির্বাচিত শের: সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে গালিবের অনুষঙ্গে

ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন
খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

(যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।)

ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায়
মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

(আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।)

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিশ্চয়ই গালিবের সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে তাঁর যে বহুরূপী ছবি ফুটে উঠেছে, তা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। গালিব কেবল একজন কবি ছিলেন না, ছিলেন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ যাঁকে কেউ ভালোবেসেছেন, কেউ বিদ্বেষ করেছেন, কেউ শ্রদ্ধা করেছেন, কেউ সমালোচনা করেছেন। এবং এই সব প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গালিব হয়ে উঠেছেন আরও জীবন্ত, আরও মানবিক।

এখন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন: আপনি যদি গালিবের সমসাময়িক হতেন, তাহলে তাঁকে কীভাবে দেখতেন? আপনি কি জওকের মতো সমালোচক হতেন, না হালীর মতো একনিষ্ঠ ভক্ত? নাকি মোমিনের মতো বন্ধু, যিনি একই সঙ্গে ভালোবাসতে ও সমালোচনা করতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আপনি হয়তো দেখবেন, গালিবের প্রতি আপনার নিজের মনোভাবও একমাত্রিক নয় বরং জটিল, বহুমাত্রিক, এবং গভীরভাবে মানবিক।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব বইয়ের শেষ অধ্যায়ে গালিব-কালপঞ্জি ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা। এটি হবে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় অধ্যায়, যেখানে গালিবের জীবনের উল্লেখযোগ্য তারিখগুলি স্তম্ভাকারে উপস্থাপন করা হবে এবং গালিবের রচনাবলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হবে। এই অধ্যায়টি ভবিষ্যতের গালিব-গবেষকদের জন্য এক মূল্যবান রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।

অধ্যায় ২৪: গালিব-কালপঞ্জি ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা

সময়ের স্রোতে এক জীবনের মানচিত্র

একজন মানুষের জীবন হল সময়ের স্রোতে ভেসে চলা এক নৌকা, আর সেই নৌকার প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি ঘাট, প্রতিটি ঝড়ের স্মৃতি ধরা থাকে ঘটনাপঞ্জিতে। গালিবের ক্ষেত্রে এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ তাঁর জীবন ও সাহিত্যিক সৃষ্টির মধ্যে ছিল এক গভীর আন্তঃসম্পর্ক। জীবনের প্রতিটি আঘাত, প্রতিটি বঞ্চনা, প্রতিটি স্বল্পস্থায়ী আনন্দ যেন সরাসরি প্রবাহিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। তাই গালিবকে সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে আমাদের জানতে হবে, কোন সময়ে কী ঘটেছিল তাঁর জীবনে, এবং কোন সময়ে তিনি কী রচনা করেছিলেন।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ যথার্থই লিখেছেন: "গালিবের কালপঞ্জি কেবল তারিখ ও ঘটনার তালিকা নয়, বরং এক জীবনদর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। প্রতিটি তারিখের পেছনে লুকিয়ে আছে এক একটি মানসিক অবস্থা, এক একটি কাব্যিক রূপান্তর।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৭৫০) রালফ রাসেল আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন: "গালিবের জীবন ও কাব্যের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় যে, একটি পূর্ণাঙ্গ কালপঞ্জি ছাড়া তাঁর কাব্যের গভীরতর স্তরগুলি বোঝা অসম্ভব।" (রাসেল, ১৯৬৯: ৬২০)

এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমে গালিবের জীবনের একটি বিস্তারিত কালপঞ্জি উপস্থাপন করব, যেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রধান ঘটনাগুলি স্তম্ভাকারে সাজানো থাকবে। তারপর উপস্থাপন করব গালিবের রচনাবলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ফার্সি কাব্য, উর্দু কাব্য, গদ্য ও চিঠিপত্রের সংকলন। এই তালিকাগুলি কেবল তথ্যের সমাহার নয়, বরং গালিব-চর্চার জন্য এক প্রয়োজনীয় রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।

গালিব-কালপঞ্জি

গালিবের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি এখানে কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হলো। তারিখগুলি নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও, অধিকাংশ গবেষকের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিচের কালপঞ্জিটি তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে হালীর "ইয়াদগার-এ-গালিব", রাসেলের "Ghalib: Life and Letters" এবং নারঙ-এর "উর্দু গজল আওর গালিব" গ্রন্থের তথ্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭৯৭, ২৭ ডিসেম্বর: আগ্রায় জন্ম। পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খান, মাতা ইজ্জতুন্নিসা বেগম। জন্মের সময় নাম রাখা হয় মির্জা আসাদউল্লাহ বেগ খান। (হালী, ১৮৯৭: ৪)

১৮০২: পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খান আলওয়ার রাজ্যের একটি ছোট যুদ্ধে নিহত হন। গালিবের বয়স তখন মাত্র চার বছর ছয় মাস। (হালী, ১৮৯৭: ৬)

১৮০২-১৮০৬: চাচা নসরুল্লাহ বেগ খানের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন। চাচা ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সুবেদার। (রাসেল, ১৯৬৯: ৪১)

১৮০৬ (আনুমানিক): চাচা নসরুল্লাহ বেগ খান হাতি থেকে পড়ে নিহত হন। গালিব ও তাঁর ভাই ইউসুফ সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়েন। (হালী, ১৮৯৭: ৮)

১৮০৭-১৮১০: আগ্রায় কিছুদিন আবদুস সামাদ নামে এক ইরানি পন্ডিতের কাছে ফার্সি ও আরবি শিক্ষা। এই স্বল্পস্থায়ী শিক্ষাই গালিবের সমগ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। (হালী, ১৮৯৭: ৯)

১৮১০: মাত্র ১৩ বছর বয়সে নবাব ইলাহী বখশ খানের কন্যা উমরাও বেগমের সঙ্গে বিবাহ। কনের বয়স তখন ১১ বছর। এই বিবাহ গালিবের সারাজীবনের দায়ভার হয়ে ওঠে। (রাসেল, ১৯৬৯: ৭৫)

১৮১২ (আনুমানিক): আগ্রা ত্যাগ করে দিল্লিতে স্থায়ী বসতি স্থাপন। বল্লিমারান এলাকার একটি ছোট হাভেলিতে বসবাস শুরু। (হালী, ১৮৯৭: ২১)

১৮১২-১৮২০: দিল্লির সাহিত্যজগতে প্রবেশ। প্রথম কাব্যচর্চা শুরু। ছদ্মনাম হিসেবে প্রথমে 'আসাদ' ও পরে 'গালিব' গ্রহণ। ফার্সি ও উর্দু দুই ভাষাতেই কাব্যচর্চা। (নারঙ, ১৯৮৫: ৪১৩)

১৮২১: প্রথম ফার্সি দিওয়ান (কাব্যসংকলন) সংকলন। এই দিওয়ানে গালিবের প্রাথমিক ফার্সি কবিতাগুলি স্থান পায়। (রাসেল, ১৯৬৯: ১১০)

১৮২৬: ফার্সি কাসিদা লিখে দিল্লির ইংরেজ রেসিডেন্ট স্যার চার্লস মেটকাফের প্রশংসা অর্জন। এই সূত্রে পেনশনের জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবেদনের পথ খোলে। (আজমি, ১৯৬৯: ২৫০)

১৮২৮-১৮২৯: কলকাতা সফর। পেনশনের আবেদন নিয়ে প্রায় দুই বছর কলকাতায় অবস্থান। গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে একাধিক আবেদন পেশ। এই সফর গালিবের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় তিনি প্রথমবারের মতো দিল্লির বাইরের আধুনিক ভারত দেখেন। (রাসেল, ১৯৬৯: ১৩৫-১৫০)

১৮৩০-এর দশক: কলকাতা সফরের পর গদ্য চিঠির স্টাইলে আমূল পরিবর্তন। ফার্সি ভাষায় চিঠি লেখা কমিয়ে উর্দুতে চিঠি লেখা শুরু। চিঠির ভাষা হয়ে ওঠে সহজ, প্রাণবন্ত ও আড্ডার ভঙ্গিতে লেখা। (রাসেল, ১৯৬৯: ১৫০)

১৮৩৭: বাহাদুর শাহ জাফর মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। গালিবের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। (হালী, ১৮৯৭: ৫৬)

১৮৪১: প্রথম উর্দু দিওয়ান প্রকাশিত। এই সংস্করণে গজলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। (নারঙ, ১৯৮৫: ৪১৪)

১৮৪৭: ফার্সি মসনবি "আবরে গওহরবার" রচনা। এটি গালিবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফার্সি কাব্য হিসেবে বিবেচিত। (আজমি, ১৯৬৯: ৩৫০)

১৮৫০: ফার্সি গদ্য গ্রন্থ "পঞ্চ আয়না" রচনা। পঞ্চতন্ত্রের আঙ্গিকে লেখা এই গ্রন্থটি গালিবের ফার্সি গদ্যের একটি অনন্য নিদর্শন। (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৩০)

১৮৫৩: ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মেহের-এ-নীমরোজ" রচনা শুরু। বাহাদুর শাহ জাফরের অনুরোধে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার এই প্রকল্পটি অসমাপ্ত থেকে যায়। (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৩৫)

১৮৫৪: শেখ ইব্রাহীম জওকের মৃত্যু। জওকের মৃত্যুর পর গালিব বাহাদুর শাহ জাফরের ওস্তাদ ও রাজকবি নিযুক্ত হন। গালিবের জীবনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বীকৃতি আসে। (হালী, ১৮৯৭: ৫৮)

১৮৫৬: আওধের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহকে অপসারণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আওধ রাজ্য দখল করে। এই ঘটনা গালিবের মনে গভীর ছাপ ফেলে। (রাসেল, ১৯৬৯: ২৫০)

১৮৫৭, ১১ মে: দিল্লিতে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু। গালিব বল্লিমারানের বাড়িতে আত্মগোপন করেন। (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬০)

১৮৫৭, মে-সেপ্টেম্বর: বিদ্রোহী সিপাহিদের হাতে দিল্লি। গালিব ভয়ে-ভয়ে দিন কাটান। ফার্সি ভাষায় "দাস্তামবু" (পানসে কস্তুরি) নামে দিনলিপি লেখা শুরু করেন। (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬১)

১৮৫৭, সেপ্টেম্বর: ইংরেজ বাহিনী দিল্লি পুনর্দখল করে। ভয়াবহ গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ। গালিবের ভাই মির্জা ইউসুফ ইংরেজ সেনার গুলিতে নিহত হন বলে ধারণা করা হয়। (হালী, ১৮৯৭: ৮০)

১৮৫৮: বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়। গালিবের জন্য এটি ছিল জগৎ-বিধ্বংসী এক শোক। (রাসেল, ১৯৬৯: ২৮০)

১৮৫৮-১৮৬০: বিদ্রোহ-পরবর্তী দিল্লির ধ্বংসস্তূপে জীবনযাপন। গালিবের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম শোচনীয় হয়ে পড়ে। পেনশনের জন্য আবার আবেদন-নিবেদন শুরু। (হালী, ১৮৯৭: ১৩৮)

১৮৬১: উর্দু দিওয়ানের দ্বিতীয়, পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ। গালিব এই সংস্করণ থেকে বহু জনপ্রিয় শের বাদ দেন এবং নতুন শের যোগ করেন। (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৪৫)

১৮৬২, ৭ নভেম্বর: বাহাদুর শাহ জাফর রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মারা যান। গালিব গভীর শোক প্রকাশ করেন। (রাসেল, ১৯৬৯: ২৮০)

১৮৬২-১৮৬৫: গালিবের স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি। চোখের জ্যোতি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু চিঠিপত্র লেখা অব্যাহত থাকে। (হালী, ১৮৯৭: ১১৫)

১৮৬৫ (আনুমানিক): রামপুরের নবাব কালবে আলী খানের কাছ থেকে নিয়মিত পেনশন পাওয়া শুরু। শেষ বয়সে কিছুটা আর্থিক স্বস্তি আসে। (হালী, ১৮৯৭: ১২০)

১৮৬৮: গালিব শেষ বারের মতো নিজের উর্দু দিওয়ান পরিমার্জন করেন। এটি তাঁর জীবনের শেষ সাহিত্যিক কাজ। (নারঙ, ১৯৮৫: ৪১৪)

১৮৬৯, ১৫ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির বল্লিমারানের নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। মৃত্যুর সময় বয়স ৭১ বছর (চন্দ্রবর্ষে ৭২)। (হালী, ১৮৯৭: ১৩০)

১৮৬৯, ১৬ ফেব্রুয়ারি: নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা চত্বরে সমাধিস্থ। শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী দরগা চত্বরেই সমাধি দেওয়া হয়, যদিও জানাজা নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়েছিল। (রাসেল, ১৯৬৯: ৩০৮)

১৮৬৯, ফেব্রুয়ারি-মার্চ: গালিবের মৃত্যুর খবর ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। (হালী, ১৮৯৭: ১৩৫)

পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা

গালিবের রচনাবলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হলো। এই তালিকায় গালিবের জীবদ্দশায় প্রকাশিত ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত উভয় ধরনের গ্রন্থই স্থান পেয়েছে। তালিকাটি ফার্সি কাব্য, উর্দু কাব্য, ফার্সি গদ্য ও চিঠিপত্র এই চার ভাগে বিভক্ত।

নারঙ-এর মতে, গালিবের সম্পূর্ণ রচনাবলির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং আজও কিছু কিছু রচনা অপ্রকাশিত বা হারিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়। (নারঙ, ১৯৮৫: ৭৫৫)

ক. ফার্সি কাব্য

গালিবের ফার্সি কাব্যের পরিমাণ উর্দু কাব্যের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি ফার্সি ভাষায় গজল, কাসিদা, মসনবি, রুবাই, কিতা (খন্ডকবিতা) ইত্যাদি বহু রচনা করেছেন।

দিওয়ান-এ-ফার্সি (ফার্সি কাব্যসংকলন): গালিবের ফার্সি কাব্যের প্রধান সংকলন। জীবদ্দশায় একাধিকবার পরিমার্জিত। প্রথম সংকলন ১৮২১ সালে, শেষ পরিমার্জন ১৮৬৮ সালে। (রাসেল, ১৯৬৯: ৬২৫)

আবরে গওহরবার (মুক্তা-ঝরানো মেঘ): ১৮৪৭ সালে রচিত ফার্সি মসনবি। প্রকৃতি ও প্রেমের রূপকের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। (আজমি, ১৯৬৯: ৩৫০)

পঞ্চ আয়না (পাঁচ আয়না): ১৮৫০ সালে রচিত ফার্সি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্রের আঙ্গিকে পাঁচটি নীতিকথামূলক গল্প। (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৩০)

মেহের-এ-নীমরোজ (মধ্যাহ্নের সূর্য): ১৮৫৩ সালে রচনা শুরু করা এক অসমাপ্ত ইতিহাস গ্রন্থ। তৈমুর লঙ থেকে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বর্ণিত। (রাসেল, ১৯৬৯: ৩৩৫)

দাস্তামবু (পানসে কস্তুরি): ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও তার পরিণতির ওপর রচিত দিনলিপি। ফার্সির অতি প্রাচীন 'দাসাতির' শৈলীতে রচিত। (রাসেল, ১৯৬৯: ২৬১)

কালিয়াত-এ-ফার্সি (ফার্সি রচনাবলি): গালিবের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ফার্সি রচনার সমগ্র সংকলন। এতে ফার্সি কবিতা, গদ্য ও পত্রাবলি অন্তর্ভুক্ত। (নারঙ, ১৯৮৫: ৭৫৬)

খ. উর্দু কাব্য

গালিবের উর্দু কাব্য পরিমাণে ফার্সি কাব্যের চেয়ে কম হলেও, সাহিত্যিক গুণে ও জনপ্রিয়তায় তা ফার্সি কাব্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

দিওয়ান-এ-উর্দু (উর্দু কাব্যসংকলন): গালিবের উর্দু কাব্যের প্রধান সংকলন। জীবদ্দশায় তিনবার প্রকাশিত: প্রথম সংস্করণ ১৮৪১ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬১ সালে, তৃতীয় ও শেষ সংস্করণ ১৮৬৮ সালে। প্রতিটি সংস্করণেই গালিব পূর্ববর্তী সংস্করণ থেকে বহু শের বাদ দিয়েছেন এবং নতুন শের যোগ করেছেন। বর্তমানে প্রচলিত দিওয়ানটি সম্পাদকদের দ্বারা সংকলিত, যাঁরা গালিবের বাদ দেওয়া শেরগুলিকে আবার যুক্ত করেছেন। (নারঙ, ১৯৮৫: ৪৪৫)

গুল-এ-রানা (সুন্দর ফুল): গালিবের উর্দু গদ্য ও পদ্যের একটি সংকলন, যা গালিবের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। (রাসেল, ১৯৬৯: ৬২৫)

কালিয়াত-এ-উর্দু (উর্দু রচনাবলি): গালিবের মৃত্যুর পর প্রকাশিত উর্দু রচনার সমগ্র সংকলন। এতে উর্দু কবিতা, গদ্য ও চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত। (নারঙ, ১৯৮৫: ৭৫৬)

দিওয়ান-এ-গালিব (গালিবের কাব্যসংকলন): ভারত ও পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত গালিবের কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণ। এগুলির মধ্যে সম্পাদনার ভিন্নতা রয়েছে, এবং কোন সংস্করণটি 'প্রামাণ্য' তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। (রাসেল, ১৯৬৯: ৬২৫)

গ. চিঠিপত্র

গালিবের চিঠিগুলি উর্দু গদ্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়। তিনি জীবনের শেষ ত্রিশ বছরে (আনুমানিক ১৮৪০-১৮৬৯) অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন, যার একটি বড় অংশ এখনো সংরক্ষিত আছে।

উর্দু-এ-মুআল্লা (উচ্চাঙ্গ উর্দু): গালিবের চিঠিপত্রের প্রথম সংকলন। ১৮৬৮ সালে, গালিবের জীবদ্দশায়, প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে গালিব নিজেই কিছু চিঠি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। (হালী, ১৮৯৭: ১৫৫)

খতুত-এ-গালিব (গালিবের পত্রাবলি): গালিবের মৃত্যুর পর প্রকাশিত পত্রাবলির বিভিন্ন সংস্করণ। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণটি সম্পাদনা করেন মির্জা তফতা, যিনি ছিলেন গালিবের চিঠির প্রধান প্রাপক ও সংরক্ষক। (আজমি, ১৯৬৯: ৬০৫)

গালিব কে খতুত (গালিবের চিঠি): গালিবের চিঠিপত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন, যা পরবর্তীকালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রাপকের উদ্দেশে লেখা চিঠিগুলি স্থান পেয়েছে। (রাসেল, ১৯৬৯: ৬২৬)

Ghalib: Life and Letters (ইংরেজি): রালফ রাসেল সম্পাদিত ও অনূদিত গালিবের চিঠিপত্রের ইংরেজি সংস্করণ। ১৯৬৯ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে গালিবের জীবনের বিবরণ ও চিঠিগুলির ইংরেজি অনুবাদ একত্রে সংকলিত হয়েছে। (রাসেল, ১৯৬৯)

ঘ. আধুনিক সংকলন ও গবেষণা গ্রন্থ

গালিবের মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলি নিয়ে অসংখ্য সংকলন, সম্পাদনা ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিচে দেওয়া হলো।

ইয়াদগার-এ-গালিব (গালিবের স্মৃতি): আলতাফ হোসেন হালী রচিত গালিবের প্রথম প্রামাণ্য জীবনী ও কাব্যসমালোচনা। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত। (হালী, ১৮৯৭)

মহাসিন-এ-কালাম-এ-গালিব (গালিবের কাব্যের সৌন্দর্য): আবদুর রহমান বিজনৌরী রচিত। ১৯২১ সালে প্রকাশিত। গালিবের কাব্যের নান্দনিক বিশ্লেষণ ও 'গালিবিয়াত' ধারণার প্রবর্তন। (বিজনৌরী, ১৯২১)

উর্দু গজল আওর গালিব (উর্দু গজল ও গালিব): ড. গোপী চাঁদ নারঙ রচিত। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত। গালিবের কাব্যের এক বিস্তারিত দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও নান্দনিক বিশ্লেষণ। গালিব-গবেষণায় এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। (নারঙ, ১৯৮৫)

গালিব: শাখসিয়াত আওর ফন (গালিব: ব্যক্তিত্ব ও শিল্প): খলিলুর রহমান আজমি রচিত। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত। গালিবের ব্যক্তিত্ব ও কাব্যশিল্পের এক চমৎকার বিশ্লেষণ। (আজমি, ১৯৬৯)

The Oxford India Ghalib (অক্সফোর্ড ইন্ডিয়া গালিব): রালফ রাসেল সম্পাদিত। গালিবের নির্বাচিত কবিতা ও চিঠির ইংরেজি অনুবাদ ও বিশ্লেষণ। (রাসেল, ১৯৬৯)

দিল্লি কী আখেরি শামা (দিল্লির শেষ মোমবাতি): ফারহাতুল্লাহ বেগ রচিত। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত। শেষ মুঘল দিল্লির এক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ, যাতে গালিব ও তাঁর সমসাময়িকদের নিয়ে মূল্যবান তথ্য আছে। (বেগ, ১৯০৬)

কালপঞ্জি ও গ্রন্থতালিকার ঐতিহাসিক তাৎপর্য

গালিবের জীবনের ঘটনাপঞ্জি ও রচনাবলির তালিকা পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে: গালিবের জীবন ও সাহিত্যিক সৃষ্টির মধ্যে এক গভীর আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। প্রতিটি জীবনের আঘাত, প্রতিটি আনন্দ, প্রতিটি বঞ্চনা যেন সরাসরি তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, ১৮২৮-২৯ সালের কলকাতা সফর কেবল একটি ভ্রমণ নয়, বরং তা গালিবের গদ্যশৈলীর আমূল পরিবর্তনের সূচনা বিন্দু। একইভাবে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও তার পরিণতি গালিবের শেষ জীবনের কাব্যে এক গভীর দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতার জন্ম দিয়েছিল।

আজমি এই আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে লিখেছেন: "গালিবের কালপঞ্জি ও গ্রন্থতালিকা পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায়, কীভাবে জীবন ও কাব্য হাত ধরাধরি করে চলেছে। যে সময়ে তিনি পেনশনের জন্য লড়ছেন, সেই সময়েই তিনি লিখছেন 'রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ'। যে সময়ে দিল্লি ধ্বংস হচ্ছে, সেই সময়েই তিনি লিখছেন 'বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া'। গালিবের প্রতিটি শেরের পেছনে জীবনের একটি অধ্যায় লুকিয়ে আছে।" (আজমি, ১৯৬৯: ৬১০)

সময়ের সাক্ষী, কাব্যের স্থপতি

গালিবের কালপঞ্জি ও গ্রন্থতালিকা পর্যালোচনা শেষে আমরা উপলব্ধি করি, তিনি ছিলেন একই সঙ্গে তাঁর সময়ের সাক্ষী এবং কাব্যের স্থপতি। সময়ের সাক্ষী এই অর্থে যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত বড় ঘটনা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, ইংরেজ শাসনের উত্থান, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, দিল্লির ধ্বংস নিজের চোখে দেখেছেন এবং তাঁর লেখায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন। কাব্যের স্থপতি এই অর্থে যে, তিনি এই সব অভিজ্ঞতাকে কেবল নথিভুক্তই করেননি, বরং তাকে শিল্পে, কাব্যে, অমর সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমরা গালিবের জীবন ও রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র পেলাম। এই মানচিত্র হাতে নিয়ে এখন আমরা প্রবেশ করব বইয়ের শেষ পর্বে পরিশিষ্ট, যেখানে থাকবে গালিবের ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ও শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান এবং বইয়ে ব্যবহৃত সমস্ত গ্রন্থের একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি।

নির্বাচিত শের: কালপঞ্জি ও গ্রন্থতালিকার অনুষঙ্গে

ہزاروں □واہشیں ایسی کہ ہر □واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

(হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।)

رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ
মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

(দুঃখের সঙ্গে মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।)

بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে
হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

(শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।)

ব্যক্তিগত অনুশীলন:

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়টি পড়ার পর আপনার হাতে গালিবের জীবন ও রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র এসেছে। এখন আপনি যদি গালিবের কোনো শের পড়েন, তাহলে সেই শেরটি তাঁর জীবনের কোন সময়ে লেখা, কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে লেখা তা এই কালপঞ্জির সাহায্যে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, গালিবের প্রতিটি শের যেন এক নতুন জীবন নেবে আপনার চোখের সামনে।

এছাড়া, আপনি যদি গালিবের ওপর আরও গবেষণা করতে চান, তাহলে এখানে প্রদত্ত গ্রন্থতালিকা আপনার জন্য এক মূল্যবান রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। হালীর "ইয়াদগার-এ-গালিব" দিয়ে শুরু করে নারঙ-এর "উর্দু গজল আওর গালিব" পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থই গালিবের জীবন ও কাব্যের এক একটি নতুন দরজা খুলে দেবে। গালিবের জগতে আপনার এই যাত্রা কখনো শেষ না হোক কারণ গালিবের কাব্য যেমন অফুরন্ত, তেমনই গালিব-চর্চাও এক জীবনে শেষ হবার নয়।

এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গেই পর্ব ৬ (প্রাসঙ্গিক রসদ) সমাপ্ত হচ্ছে। এখন আমরা প্রবেশ করব বইয়ের একেবারে শেষ অংশে পর্ব ৭: পরিশিষ্ট। সেখানে থাকবে গালিবের ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাব্যশব্দ ও প্রতীকের একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান, এবং পুরো বইয়ে ব্যবহৃত সমস্ত গ্রন্থ ও উৎসের একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি। এই পরিশিষ্টগুলি বইটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স গ্রন্থের মর্যাদা দেবে।

পর্ব ৭: পরিশিষ্ট

একটি জীবন ও কাব্যের এত বিশদ আলোচনার শেষে কিছু প্রয়োজনীয় রসদ জুড়ে দেওয়া দরকার, যা ভবিষ্যতের গালিব-পাঠক ও গবেষকের পথে প্রদীপ হয়ে থাকবে। পর্ব ৭-এ আমরা তিনটি পরিশিষ্ট সংযোজন করছি: প্রথম পরিশিষ্টে গালিবের কাব্যে বহুল ব্যবহৃত ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকের একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান, দ্বিতীয় পরিশিষ্টে বইটির জন্য ব্যবহৃত প্রধান গ্রন্থ ও উৎসের তালিকা, এবং তৃতীয় পরিশিষ্টে একটি বিষয় ও ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট। এই তিনটি পরিশিষ্ট একত্রে বইটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থের রূপ দেবে।

ড. গোপী চাঁদ নারঙ তাঁর "উর্দু গজল আওর গালিব" গ্রন্থে লিখেছেন: "গালিবের কাব্য বুঝতে গেলে তাঁর প্রতীক-জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য। তিনি সনাতন প্রতীকগুলিকে যে নতুন অর্থ দিয়েছেন, তা না বুঝলে গালিবের গভীরতা অধরাই থেকে যায়।" (নারঙ, ১৯৮৫: ৭৬০)

পরিশিষ্ট ১: গালিবের ব্যবহৃত ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য-প্রতীকের অর্থ ও ব্যাখ্যা

গালিবের কাব্যে ফার্সি-উর্দু সাহিত্যের সনাতন প্রতীক ও রূপকগুলি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। নিচে সেই সব প্রতীকের একটি নির্বাচিত তালিকা দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রতীকের মূল উর্দু, বাংলা উচ্চারণ, সাধারণ অর্থ এবং গালিবের স্বতন্ত্র প্রয়োগ-ব্যাখ্যা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. **شمع (Shama)** – মোমবাতি: প্রেমাস্পদ বা জ্ঞানের আলো। গালিবের হাতে শামা কেবল প্রেমাস্পদ নয়, বরং নিয়তির অনিত্যতা ও জগতের আলো-অন্ধকার চক্রের প্রতীক।

২. **پروانہ (Parwana)** – পতঙ্গ: প্রেমিক, যে শামার শিখায় আত্মাহুতি দেয়। গালিবের পরওয়ানা আত্মাহুতির পাশাপাশি সংশয় ও প্রশ্নও করে।

৩. **شیشہ / آئینہ (Sheesha / Aaina)** – আয়না: আত্মদর্শন ও আত্মজ্ঞান। গালিব নিজেকে “আয়না-এ-খুদ-বীন” বলে চিহ্নিত করেছেন যে নিজেকে দেখে ও জগৎকে প্রতিফলিত করে।

৪. **ساقی (Saqi)** – মদপরিবেশক: সুফি অর্থে আধ্যাত্মিক গুরু বা খুদা; পার্থিব অর্থে প্রেমাস্পদ বা তাওয়াইফ। গালিব উভয় অর্থই ইহামের মাধ্যমে ব্যবহার করেন।

৫. **مے / مے (Mai / May)** – মদ: পার্থিব নেশা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান উভয়ের প্রতীক। গালিবের “ময়” একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ ও আত্মিক মুক্তি নির্দেশ করে।

৬. **مہتاب (Mahtab)** – চাঁদ: সৌন্দর্য, প্রেমাস্পদের মুখ, বা ঐশ্বরিক আলো। গালিব চাঁদকে কখনো সাক্ষী, কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপন করেন।

৭. **دائرہ (Daayara)** – বৃত্ত, জগৎ-সংসার: সীমাবদ্ধতা ও নিয়তি। গালিবের কাছে দায়ার একই সঙ্গে কারাগার ও অসীমের প্রতিচ্ছবি।

৮. **حرف (Harf)** – অক্ষর: ভাষা, জ্ঞান, সৃষ্টির মূল উপাদান। গালিব “হরফ” দিয়ে নিজের কবিতাকে সৃষ্টির আদি অক্ষরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

৯. **دل (Dil)** – হৃদয়: আবেগ ও বুদ্ধির মিলনস্থল। গালিবের “দিল” একই সঙ্গে কাঁদে ও প্রশ্ন করে; “দিল-এ-নাদাঁ” তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি।

১০. **غم (Gham)** – দুঃখ: জীবনের নিয়তসঙ্গী। গালিবের কাছে দুঃখ এতটাই স্বাভাবিক যে তা আর দুঃখ থাকে না তা এক দার্শনিক বন্ধনে পরিণত হয়।

১১. **رنج (Ranj)** – বেদনা: গাম-এর সমার্থক, তবে আরও গভীর। “রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ” গালিবের দুঃখদর্শনের মূল মন্ত্র।

১২. **درد (Dard)** – ব্যথা: প্রেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গালিবের কাছে ব্যথাই প্রেমের প্রমাণ; ব্যথা এত তীব্র যে হৃদয়ে গর্ত সৃষ্টি করে।

১৩. **زخم (Zakhm)** – ক্ষত: প্রেম বা জীবনের আঘাতের চিহ্ন। গালিব ক্ষতকে শুকাতে দেন না, বরং তাজা রাখতে বলেন কারণ তা-ই প্রেমের নিদর্শন।

১৪. **اشک (Ashk)** – অশ্রু: নীরব ভাষা। গালিবের অশ্রু কথা বলতে পারে না, তবু সব বলে দেয়।

১৫. **آہ (Aah)** – দীর্ঘশ্বাস: প্রেমের বেদনার ধ্বনি। গালিবের “আহ” ফলের জন্য এক জীবন অপেক্ষা করতে হয় এমনই গভীর।

১৬. **فریاد (Faryad)** – অভিযোগ, আর্তি: প্রেমিকের নালিশ। গালিবের ফরিয়াদ কখনো প্রেমাস্পদের কাছে, কখনো নিয়তির কাছে।

১৭. **حیات (Hayat)** – জীবন: একই সঙ্গে কারাগার ও একমাত্র সত্য। গালিব জীবনকে "কয়দ" বলেছেন, আবার তাকে নিয়েই সমস্ত কাব্য।

১৮. **موت (Maut)** – মৃত্যু: জীবনের একমাত্র নিশ্চিত পরিণতি। গালিবের কাছে মৃত্যু পুরনো বন্ধু, পরম মুক্তি।

১৯. **فنا (Fana)** – আত্মবিলোপ: সুফি দর্শনে অসীমে মিশে যাওয়া। গালিব ফোঁটার নদীতে বিলীন হওয়াকে "ইশরাত" (পরম সুখ) বলেছেন।

২০. **بقا (Baqa)** – স্থায়িত্ব: ফানার পরবর্তী স্তর অসীমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে টিকে থাকা। গালিবের কাব্যে ফানা-বাকার দ্বান্দ্বিকতা বারবার এসেছে।

২১. **وجود (Wujood)** – অস্তিত্ব: গালিবের দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা। "ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে" অস্তিত্বই যন্ত্রণার কারণ।

২২. **نیستی (Neesti)** – অনস্তিত্ব: অস্তিত্বের বিপরীত, কিন্তু গালিবের কাছে তা-ই প্রশান্তির সম্ভাবনা।

২৩. **خودی (Khudi)** – আত্মসত্তা: ইকবালের আগেই গালিব আত্মসত্তার মহিমা ঘোষণা করেছিলেন, বিশেষ করে "হুঁ গরচে মুসাহিব" শেরে।

২৪. **بے خودی (Bekhudi)** – আত্মহারা অবস্থা: প্রেম বা নেশায় নিজেকে ভোলা। গালিবের কাছে এটি একই সঙ্গে আনন্দ ও পলায়ন।

২৫. **کعبہ (Kaaba)** – কাবা: ইসলামের পবিত্রতম স্থান। গালিব কাবাকে প্রথাগত ধর্মের প্রতীক হিসেবে দেখেন এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে ফিরে আসার কথা বলেন।

২৬. **بت (But)** – মূর্তি: প্রথাগত অর্থে পৌত্তলিকতার প্রতীক, কিন্তু গালিবের কাছে প্রেমাস্পদের রূপক। "মেরে বুত মেঁ জো, না কাবা মেঁ ঠহর"।

২৭. **کافر (Kafir)** – ধর্মচ্যুত, নিষ্ঠুর প্রেমাস্পদ। গালিব প্রেমাস্পদকে "কাফির" বলে সম্বোধন করে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করেছেন।

২৮. **واعظ (Waaiz)** – ধর্মোপদেশক: গালিবের ব্যঙ্গের অন্যতম লক্ষ্য। ওয়ায়েজ হল ভণ্ডামির প্রতীক, আর ময়-খানা তার বিপরীত সত্য।

২৯. **ملا (Mulla)** – মোল্লা: ধর্মীয় গোঁড়া। গালিব মোল্লার খোদাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের "খুদা-এ-বেতালব"-এর কথা বলেন।

৩০. **زاہد (Zahid)** – ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, প্রায়ই ভণ্ড। গালিবের কাব্যে জাহিদ মদ ও প্রেমের বিরোধী শক্তি।

৩১. **ناصح (Nasih)** – উপদেশক: যে প্রেম না বুঝে উপদেশ দেয়। গালিব নাসিহ-এর উপদেশকে উপহাস করেন।

৩২. **رند (Rind)** – মস্তান, সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ সুফি বা কবি। গালিব নিজেকে রিন্দ হিসেবে কল্পনা করতে ভালোবাসতেন।

৩৩. **قلندر (Qalandar)** – বাউল, সর্বত্যাগী সুফি। গালিবের মুক্তচেতনার প্রতীক।

৩৪. **گل (Gul)** – ফুল: সৌন্দর্য, প্রেম, নশ্বরতা। গালিবের "গুলোন মে রং ভরে" ফুলের মধ্য দিয়ে প্রাণের আবাহন।

৩৫. **بلبل (Bulbul)** – বুলবুলি: প্রেমিক পাখি, ফুলের প্রতি আকৃষ্ট। গালিবের বুলবুলি প্রেমের গান গায়, কিন্তু প্রায়ই বন্দি।

৩৬. **چمن (Chaman)** – বাগান: প্রেমের জগৎ বা পৃথিবী। গালিবের চমন বসন্তে সজীব হয়, কিন্তু বন্দি পাখির কাছে তা অর্থহীন।

৩৭. **قفس (Qafas)** – খাঁচা: বন্দিত্ব, বিচ্ছেদ। গালিব নিজেকে খাঁচার পাখি বলে চিহ্নিত করেছেন, যার মুক্তি কেবল প্রেমাস্পদের আগমনে।

৩৮. بادِ بہار (Baad-e-Bahaar) – বসন্তের বাতাস: প্রেমের আগমনী বার্তা। "বাদ-এ-নওবাহার চলো" গালিবের প্রেম-আকুতির গান।

৩৯. خزاں (Khizaan) – শরৎ, পতন: প্রেমের অবসান, বার্ধক্য, বা মৃত্যু। গালিবের কাব্যে খিজাঁ যেন এক অনিবার্য পরিণতি।

৪০. سحر (Sahar) – ভোর: আশার আলো, প্রেমের সম্ভাবনা। গালিবের ভোর কখনো আসে, কখনো আসে না।

৪১. شب (Shab) – রাত: বিরহ, অন্ধকার, রহস্য। গালিবের "শব-এ-হিজরাঁ" (বিচ্ছেদের রাত) বিখ্যাত।

৪২. روز (Roz) – দিন: আলো, দর্শন, অথচ তামাশার অংশ।

৪৩. تیرگی (Teeragi) – অন্ধকার: অজ্ঞতা বা বিরহ। গালিব অন্ধকারকে অস্বীকার করেন না, বরং তাকে জীবনের সত্য বলে গ্রহণ করেন।

৪৪. نور (Noor) – আলো: জ্ঞান বা প্রেমাস্পদের মুখ। গালিবের নূর কখনো শামায়, কখনো চাঁদে প্রতিফলিত।

৪৫. خواب (Khwab) – স্বপ্ন: আশা, কল্পনা, কিন্তু ভঙ্গুর। গালিবের অনেক আরমানই "খোয়াব" থেকে যায়।

৪৬. □ یا (Yaas) – হতাশা: গালিবের নৈরাশ্যবাদের ভিত্তি। কিন্তু হতাশাও এক ধরনের শান্তি দেয়।

৪৭. امید (Ummeed) – আশা: প্রেমিকের চিরন্তন রোগ। "হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ" যেখানে আশা করাই প্যারাডক্স।

৪৮. آرزو (Aarzoo) – আকাঙ্ক্ষা: "হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি" আকাঙ্ক্ষা যত বেশি, প্রাণ তত তীব্রভাবে বেরিয়ে যায়।

৪৯. طلب (Talab) – চাহিদা, অন্বেষণ। গালিবের তলব কখনো পূরণ হয় না, তবু থামে না।

৫০. □جنو (Junoon) – পাগলামি: প্রেমের চরম অবস্থা। গালিবের কাছে জুনুন একই সঙ্গে অভিশাপ ও গৌরব।

৫১. ہوش (Hosh) – চেতনা: প্রেমিকের কাছে এক অভিশাপ, কারণ তা বেদনার স্মৃতি জাগায়। গালিব নেশায় হোশ হারাতে চান।

৫২. خرد (Khirad) – বুদ্ধি: গালিব বুদ্ধির ওপর নির্ভর করলেও প্রেমের কাছে তা অসহায়।

৫৩. عقل (Aql) – জ্ঞান: গালিব জ্ঞানী, কিন্তু প্রেমে অজ্ঞান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

৫৪. مستی (Masti) – নেশা: মদ বা প্রেমের নেশা। গালিবের মাস্তি দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়।

৫৫. جلوہ (Jalwa) – প্রকাশ, দীপ্তি: প্রেমাস্পদের আবির্ভাব। গালিব জলওয়ার জন্য তৃষ্ণার্ত।

৫৬. پردہ (Parda) – পর্দা: গোপনতা, দূরত্ব। গালিব প্রেমাস্পদের পর্দা উঠিয়ে দেখতে চান, কিন্তু পর্দাই রহস্যের সৌন্দর্য।

৫৭. زلف (Zulf) – কেশ: প্রেমাস্পদের চুল, জটিলতা ও আকর্ষণের প্রতীক। "জুল্ফ কে সর হোতে তক" কে বাঁচে? গালিবের বিখ্যাত প্রশ্ন।

৫৮. چشم (Chashm) – চোখ: নিষ্ঠুরতা বা মোহের আধার। গালিবের প্রেমাস্পদের "শোখ চশম" হেসে কবিকে পাগল বলে।

৫৯. ابرو (Abru) – ভুরু: ধনুকের মতো বাঁকা, যা তীর নিক্ষেপ করে। গালিবের কাছে ভুরুও অস্ত্র।

৬০. لب (Lab) – ঠোঁট: মদ বা অমৃতের উৎস। গালিব ঠোঁটকে "হরফ-এ-লব" বলে ভাষার সঙ্গেও জুড়েছেন।

৬১. قد (Qad) – দেহ, গড়ন: প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যের প্রতিমা। গালিব কদকে সাইপ্রেসের সঙ্গে তুলনা করেন।

৬২. رخ (Rukh) – মুখ: প্রেমাস্পদের মুখমণ্ডল, চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল।

৬৩. عارض (Aariz) – গাল: গোলাপের মতো রক্তিম। গালিব গালকে ফুল ও প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করেন।

৬৪. خال (Khaal) – তিল: মুখের সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু। গালিব খালকে কালো দানার মতো দেখেন যা হৃদয় পোড়ায়।

৬৫. خط (Khat) – দাড়ির রেখা, যৌবনের আগমনী। গালিব খতকে সৌন্দর্যের নতুন মাত্রা বলেন।

৬৬. کمر (Kamar) – কোমর: সূক্ষ্মতা, ভঙ্গুরতা, এবং শক্তি। গালিব কোমরকে তীরের মতো তীক্ষ্ণ দেখেন।

৬৭. قدح (Qadah) – পানপাত্র: মদের পাত্র, ভোগের প্রতীক। গালিব কদহ ভরার আকাঙ্ক্ষা করেন।

৬৮. جا (Jaam) – জাম: মদের পেয়ালা। জাম-এ-জাম (জমশেদের পেয়ালা) জ্ঞানের প্রতীক; গালিবের কাছে তা-ও এক তামাশা।

৬৯. مینا (Meena) – মদের বোতল বা পাত্র। গালিব মীনা নিয়ে সাকির সঙ্গে কথোপকথন রচনা করেন।

৭০. خم (Khum) – মদের বড় পাত্র। গালিবের কাছে খুম যেন সাকির ঘরের গোপন ভান্ডার।

৭১. میخانہ (Maikhana) – মদের দোকান: গালিবের কাছে সত্যের মন্দির, ওয়ায়েজের মসজিদের বিপরীত।

৭২. خرابات (Kharabaat) – মদের আড্ডা বা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান। গালিব খারাবাতে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পান।

৭৩. مسجد (Masjid) – মসজিদ: প্রথাগত ইবাদতের স্থান। গালিব মসজিদের চেয়ে ময়-খানাকে বড় করে দেখেন।

৭৪. محراب (Mehrab) – মসজিদের খিলান: প্রেমাস্পদের ভুরুর সঙ্গে তুলিত। গালিব মেহরাবে গিয়ে প্রেমাস্পদকেই খুঁজে পান।

৭৫. تسبیح (Tasbeeh) – জপমালা: ভন্ডামির প্রতীক। গালিব তসবিহ ছিঁড়ে ফেলতে বলেন।

৭৬. دیر (Dair) – মন্দির: হিন্দুদের উপাসনাস্থল। গালিব “গিয়া চলো” বলে দায়ার ও কাবার বিভেদ ঘোচাতে চান।

৭৭. صلیب (Saleeb) – ক্রুশ: খ্রিস্টধর্মের প্রতীক। গালিব সব ধর্মের মিলনের কথা বলেন।

৭৮. کلیسا (Kaleesa) – গির্জা: গালিবের কাছে সব ইবাদতখানাই এক ভালোবাসার ঠিকানা।

৭৯. گنبد (Gumbad) – গম্বুজ: আকাশ বা সৌন্দর্যের বক্রতা। গালিব গুম্বদ-এ-মীনা (নীল গম্বুজ) দিয়ে আসমান বোঝান।

৮০. طاق (Taaq) – দেওয়ালের খোপ: প্রদীপ রাখার জায়গা। গালিব শামা-পরওয়ানার কাহিনিতে তাক উল্লেখ করেন।

৮১. دروازہ (Darwaza) – দরজা: বাধা বা প্রবেশপথ। গালিবের কাছে কাবার দরজা বা ময়-খানার দরজা উভয়ই প্রতীকী।

৮২. رہگزر (Rahguzar) – পথ, গলি: প্রেমাস্পদের গলি। গালিব সেই গলিতে অসম্মানিত হয়ে ফিরে আসেন।

৮৩. کارواں (Karwaan) – কাফেলা: জীবনের যাত্রীদল। গালিবের কারওয়াঁ প্রায়ই লুট হয়ে যায়।

৮৪. منزل (Manzil) – গন্তব্য: গালিবের কাছে মনজিল অনিশ্চিত, তাই যাত্রাই সত্য।

৮৫. گردش (Gardish) – চক্র, ভাগ্যের ফের: গালিবের নিয়তিবাদ এখানে প্রকাশ পায়। ফালকের গর্দিশই সব।

৮৬. فلک (Falak) – আকাশ, ভাগ্য: গালিব ফালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, আবার তার কাছে নতও হন।

৮৭. تقدیر (Taqdeer) – ভাগ্য: গালিব তকদিরকে কখনো লিখন, কখনো কারাগার বলেন।

৮৮. قسمت (Qismat) – নিয়তি: গালিবের কিসমত তাঁকে রাজকবি বানিয়েও গরিব রেখেছিল।

৮৯. ستارہ (Sitaara) – তারা: ভাগ্য বা আশার আলো। গালিবের সিতারা প্রায়ই খারাপ থাকে।

৯০. آفتاب (Aaftaab) – সূর্য: প্রেমাস্পদের মুখ বা রাজার তেজ। গালিব সূর্যের আলোয় অন্ধ হয়ে যান।

৯১. بادل (Baadal) – মেঘ: গালিবের "আবরে গওহরবার"-এর মেঘ মুক্তা ঝরায় দয়া ও প্রেমের প্রতীক।

৯২. باراں (Baaran) – বৃষ্টি: রহমত, প্রেমের বর্ষণ। গালিবের বৃষ্টি ফুল হাসায়।

৯৩. صبح (Subh) – সকাল: নতুন আশা, কিন্তু গালিবের সকাল প্রায়ই মিথ্যে প্রমাণিত হয়।

৯৪. شا (Shaam) – সন্ধ্যা: বিষাদের সময়। গালিব শামে বিরহের রাতের আগমনী দেখেন।

৯৫. آتش (Aatish) – আগুন: প্রেমের তাপ বা ধ্বংস। গালিবের "আতিশ-এ-খামোশ" (নীরব আগুন) তাঁর অস্তিত্বের রূপক।

৯৬. دود (Dood) – ধোঁয়া: অগ্নির চিহ্ন, বিভ্রম। গালিবের জগৎ প্রায়ই "ধুআঁ ধুআঁ সা"।

৯৭. شیشہ (Sheesha) – কাঁচ: ভঙ্গুরতা, হৃদয়ের প্রতীক। গালিবের কাচের পাত্র ভেঙে যায় সহজেই।

৯৮. سنگ (Sang) – পাথর: নির্মমতা, বাধা। গালিব প্রেমাস্পদের হৃদয়কে পাথর বলেন, আবার নিজের পথের বাধাও।

৯৯. مشکل (Mushkil) – মুশকিল: সমস্যা, যা গালিবের জন্য এত বেশি যে সহজ হয়ে গেছে।

১০০. آساں (Aasaan) – সহজ: গালিবের কাছে এই শব্দটি আসে চরম কষ্টের পর, যখন সবকিছু অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

এই ১০০টি প্রতীকের মধ্য দিয়েই গালিবের কাব্যের জগৎ গড়ে উঠেছে। সনাতন প্রতীকগুলিকে তিনি ভেঙেছেন, নতুন অর্থ দিয়েছেন, এবং নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে একীভূত করেছেন। এই তালিকাটি গালিব-পাঠের সহায়ক একটি রসদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

পরিশিষ্ট ২: বইয়ে ব্যবহৃত ২৫টি গজলের মূল উর্দু, বাংলায় হরফ ও ভাবানুবাদ

এই পরিশিষ্টে গালিবের ২৫টি নির্বাচিত গজল থেকে এক বা একাধিক শের উদ্ধৃত করা হলো। প্রতিটি শেরের মূল উর্দু নাস্তালিক, বাংলা হরফে উচ্চারণ এবং ভাবানুবাদ দেওয়া হয়েছে। গজলগুলি বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং গালিবের কাব্যদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে।

১. হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি

مطلع:
ہزاروں□واہشیں ایسی کہ ہر□واہش پہ د□ نکلے
بہت نکلے مرے ارما□ لیکن پھر بھی کم نکلے

বাংলা হরফ: হাজারোঁ খ্বাহিশেঁ অ্যায়সি কে হর খ্বাহিশ পে দম নিকলে / বহুত নিকলে মেরে আরমান লেকিন ফির ভি কম নিকলে

ভাবানুবাদ: হাজারো আকাঙ্ক্ষা এমন যে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ বেরিয়ে যায়। অনেক পূর্ণ হয়েছে আমার আরমান, কিন্তু তবু কমই রয়ে গেছে।

ایک□عر:
نکلنا□لد سے آد□ کا سنتے آئے ہیں لیکن
بہت بے آبرو ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے

বাংলা হরফ: নিকলনা খুল্দ সে আদম কা সুনতে আয়ে হ্যায় লেকিন / বহুত বে-আব্রু হো কর তেরে কুচে সে হম নিকলে

ভাবানুবাদ: আদমের বেহেশ্ত থেকে বেরিয়ে আসার কথা শুনে আসছি, কিন্তু খুব অসম্মানিত হয়ে তোমার গলি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি।

২. ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা

مطلع:
عشر□ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

বাংলা হরফ: ইশরাতে কতরা হ্যায় দরিয়া মে ফানা হো জানা / দর্দ কা হদ্দ সে গুজরনা হ্যায় দাওয়া হো জানা

ভাবানুবাদ: ফোঁটার পরম সুখ নদীতে মিলিয়ে যাওয়া। ব্যথার সীমা পেরিয়ে যাওয়াই হল ঔষধ হয়ে ওঠা।

ایک□عر:
ہے غیبِ غیب جسے سمجھے ہیں ہم، وہ ہے□دا
ہوتا ہے غیبِ غیب، وہ آ□کارا ہو جانا

বাংলা হরফ: হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব জিসে সমঝে হ্যায় হম, ওহ হ্যায় খুদা / হোতা হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব, ওহ আশকারা হো জানা

ভাবানুবাদ: যাকে আমরা অদৃশ্যের অদৃশ্য মনে করি, সেই হল খুদা। হয় অদৃশ্যের অদৃশ্য, তা প্রকাশিত হয়ে ওঠা।

৩. গুলোন মে রং ভরে

مطلع:
گلوں میں رنگ بھرے، بادِ نوبہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

বাংলা হরফ: গুলোন মে রং ভরে, বাদ-এ-নওবাহার চলো / চলে ভি আও কে গুলশন কা কারোবার চলো

ভাবানুবাদ: ফুলে রং ভরতে, বসন্তের নতুন বাতাস চলো। এসো তো, যাতে বাগানের কাজকর্ম চলে।

ایک□عر:
قفس میں ہم سے ہیں، رہتا ہے چمن میں کو□ سا □
طبیبِ گل کو سمجھ، آئے کہ ا□ نکھار چلے

বাংলা হরফ: কফস মে হম সে হ্যায়, রহতা হ্যায় চমন মেঁ কৌন সা দম / তবীব-এ-গুল কো সমঝ, আয়ে কে অব নিখার চলো

ভাবানুবাদ: খাঁচায় আমাদের মতো, বাগানে থাকে কেমন করে? ফুলের চিকিৎসককে বোঝাও, এসো, যাতে এখন সৌন্দর্য খেলে।

৪. দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়

مطلع:
دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آ□ر اس درد کی دوا کیا ہے

বাংলা হরফ: দিল-এ-নাদাঁ তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়? / আখির ইস দর্দ কী দাওয়া ক্যা হ্যায়?

ভাবানুবাদ: হে নির্বোধ হৃদয়, তোমার কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত এই ব্যথার ঔষধ কী?

ایک□عر:
ہم کو □ سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

বাংলা হরফ: হম কো উন সে ওফা কী হ্যায় উম্মীদ / জো নহীঁ জানতে ওফা ক্যা হ্যায়

ভাবানুবাদ: যারা বিশ্বস্ততা কাকে বলে জানে না, তাদের কাছে আমরা বিশ্বস্ততার আশা করি।

৫. বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া

مطلع:
بازیچۂ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے □ب و روز تما□ا مرے آگے

বাংলা হরফ: বাজীচা-এ-আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে / হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তামাশা মেরে আগে

ভাবানুবাদ: শিশুদের খেলাঘর এই জগৎ আমার চোখে, রাতদিন চলে এক তামাশা আমার সামনে।

ایک□عر:
ایک کھیل ہے اورنگِ سلیماں مرے نزدیک
ایک با□ ہے اعجازِ مسیحا مرے آگے

বাংলা হরফ: এক খেল হ্যায় আওরঙ্গ-এ-সুলায়মাঁ মেরে নজদিক / এক বাত হ্যায় এজাজ-এ-মসীহা মেরে আগে

ভাবানুবাদ: সুলায়মানের সিংহাসন আমার কাছে এক খেলা, মসীহের অলৌকিক ক্ষমতা আমার সামনে এক কথা।

৬. নুকতাচিন হ্যায় গম-এ-দিল

مطلع:
نکتہ چیں ہے غمِ دل، اس کو سنائے نہ بنے
کیا بنے با□ جہاں با□ بنائے نہ بنے

বাংলা হরফ: নুকতাচিন হ্যায় গম-এ-দিল, উস কো সুনায়ে না বনে / ক্যা বনে বাত জহাঁ বাত বনায়ে না বনে

ভাবানুবাদ: হৃদয়ের দুঃখ খুঁতখুঁতে, তাকে শোনানো যায় না। কী করে কথা বলি, যেখানে কোনো কথা বলাই যায় না।

৭. আহ কো চাহিয়ে ইক উমর

مطلع:
آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہوتے تک
کو□ جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک

বাংলা হরফ: আহ কো চাহিয়ে ইক উমর অসর হোতে তক / কৌন জিতা হ্যায় তেরি জুল্ফ কে সর হোতে তক

ভাবানুবাদ: এক দীর্ঘ জীবন চাই একটি দীর্ঘশ্বাসের ফল ফলতে। কে বাঁচে ততদিন, যতদিনে তোর চুলের জট খোলে।

৮. কোই উম্মীদ বার নহীঁ আতি

مطلع:
کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی □ور□ نظر نہیں آتی
مو□ کا ایک د□ معین ہے، نیند کیوں را□ بھر نہیں آتی

বাংলা হরফ: কোই উম্মীদ বার নহীঁ আতি, কোই সুরত নজর নহীঁ আতি / মৌত কা এক দিন মুআইয়ান হ্যায়, নীঁদ কিঁউ রাত ভর নহীঁ আতি

ভাবানুবাদ: কোনো আশা পূর্ণ হয় না, কোনো উপায় চোখে পড়ে না। মৃত্যুর একটি দিন নির্দিষ্ট আছে, তবু ঘুম কেন সারা রাত আসে না?

৯. ইয়ে না থি হামারি কিসমত

مطلع:
یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ و□الِ یار ہوتا
اگر اور جیتے رہتے، یہی انتظار ہوتا

বাংলা হরফ: ইয়ে না থি হামারি কিসমত কে বিসাল-এ-ইয়ার হোতা / আগর আওর জীতে রহতে, ইয়েহি ইন্তেজার হোতা

ভাবানুবাদ: আমাদের ভাগ্যে ছিল না প্রিয়তমার মিলন। যদি আরও বেঁচে থাকতাম, তবু এই একই অপেক্ষাই হতো।

১০. দিল হি তো হ্যায় না সং-ও-খিশ্ত

مطلع:
دل ہی تو ہے نہ سنگ و□شت، درد سے بھر نہ آئے کیوں
روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں

বাংলা হরফ: দিল হি তো হ্যায় না সং-ও-খিশ্ত, দর্দ সে ভর না আয়ে কিঁউ / রোয়েঁগে হম হাজার বার, কোই হমে সতায়ে কিঁউ

ভাবানুবাদ: হৃদয়ই তো, পাথর বা ইঁট নয়, ব্যথায় কান্না আসবে না কেন? আমরা কাঁদব হাজার বার, কেউ আমাদের কষ্ট দিলেই বা কেন?

১১. বন্দেগী মেঁ ভি

مطلع:
بندگی میں بھی وہ آزاد و□ود بیں ہیں کہ ہم
الٹے پھر آئے درِ کعبہ سے گر وا نہ ہوا

বাংলা হরফ: বন্দেগী মেঁ ভি ওহ আজাদ-ও-খুদ-বীঁ হ্যায় কে হম / উল্টে ফির আয়ে দর-এ-কাবা সে গর ওয়া না হুয়া

ভাবানুবাদ: দাসত্বের মধ্যেও আমরা এত স্বাধীন ও আত্মদর্শী যে, কাবার দরজা থেকে ফিরে আসব, যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হয়।

১২. হম মওহেদ হ্যায়

مطلع:
ہم موحد ہیں، ہمارا مذہب ترکِ رسو□ ہے
ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

বাংলা হরফ: হম মওহেদ হ্যায়, হামারা মাযহাব তারক-এ-রসুম হ্যায় / মিল্লতেঁ জব মিট গইঁ, আজা-এ-ঈমাঁ হো গইঁ

ভাবানুবাদ: আমরা একেশ্বরবাদী, আমাদের ধর্ম রীতিনীতি ত্যাগ করা। যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিভেদ মিটে গেল, তখনই তা ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেল।

১৩. না থা কুছ তো খুদা থা

مطلع:
نہ تھا کچھ تو □دا تھا، کچھ نہ ہوتا تو □دا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

বাংলা হরফ: না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা / ডোবোয়া মুঝ কো হোনে নে, না হোতা ম্যাঁ তো ক্যা হোতা

ভাবানুবাদ: যখন কিছুই ছিল না, তখন খুদা ছিলেন; কিছুই না হলে খুদাই হতেন। অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি না থাকলে কীই বা ক্ষতি ছিল।

১৪. রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ

مطلع:
رنج سے □وگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

বাংলা হরফ: রঞ্জ সে খোগর হুয়া ইনসাঁ তো মিট জাতা হ্যায় রঞ্জ / মুশকিলেঁ মুঝ পর পরি ইতনি কে আসাঁ হো গইঁ

ভাবানুবাদ: দুঃখের সঙ্গো মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন দুঃখ মুছে যায়। আমার ওপর মুশকিল এত পড়েছে যে, তা সহজ হয়ে গেছে।

১৫. দর্দ ইতনা হ্যায়

مطلع:
درد اتنا ہے کہ سینے میں ہے اک سوراخ سا
ہر کسی سے یہ چھپاتے ہیں کہ دل ہے ابھی

বাংলা হরফ: দর্দ ইতনা হ্যায় কে সীনে মে হ্যায় এক সুরাখ সা / হার কিসি সে ইয়ে ছিপাতে হ্যায় কে দিল হ্যায় অভি

ভাবানুবাদ: ব্যথা এতটাই যে, বুকের ভেতরে যেন একটা গর্ত হয়েছে। সবার কাছ থেকে এই কথা লুকোই যে, এখনো হৃদয় আছে।

১৬. কহাঁ ময়-খানে কা দরওয়াজা

مطلع:
کہاں مے انے کا دروازہ غالبؔ اور کہاں واعظ
پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

বাংলা হরফ: কহাঁ ময়-খানে কা দরওয়াজা ‘গালিব’ আওর কহাঁ ওয়ায়েজ / পর ইতনা জানতে হ্যায় কল ওহ জাতা থা কে হম নিকলে

ভাবানুবাদ: কোথায় মদের দোকানের দরজা, হে গালিব, আর কোথায় ধর্মোপদেশক! কিন্তু এতটুকু জানি, কাল সে যাচ্ছিল যখন আমরা বেরিয়ে এলাম।

১৭. হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব

مطلع:
ہے غیبِ غیب جسے سمجھے ہیں ہم، وہ ہے دا
ہوتا ہے غیبِ غیب، وہ آکارا ہو جانا

বাংলা হরফ: হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব জিসে সমঝে হ্যায় হম, ওহ হ্যায় খুদা / হোতা হ্যায় গায়েব-এ-গায়েব, ওহ আশকারা হো জানা

ভাবানুবাদ: যাকে আমরা অদৃশ্যের অদৃশ্য মনে করি, সেই হল খুদা। হয় অদৃশ্যের অদৃশ্য, তা প্রকাশিত হয়ে ওঠা। (গজল ২-এর অংশ)

১৮. মুহব্বত মেঁ নহীঁ হ্যায় ফারাক

مطلع:
محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا
اُسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ د نکلے

বাংলা হরফ: মুহব্বত মেঁ নহীঁ হ্যায় ফারাক জীনে আওর মরনে কা / উসি কো দেখ কর জীতে হ্যায় জিস কাফির পে দম নিকলে

ভাবানুবাদ: প্রেমে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা তাকে দেখেই বাঁচি, যে কাফেরের জন্য প্রাণ বেরিয়ে যায়।

১৯. আয়না দেখ আপ্নি সি সুরত

مطلع:
آئینہ دیکھ اپنی سی □ور□ نظر آئی
تجھ کو کیا فرق ہے، جی میں ہے جو، وہی ہے باہر

বাংলা হরফ: আয়না দেখ আপ্নি সি সুরত নজর আয়ি / তুঝ কো ক্যা ফারাক হ্যায়, জি মে হ্যায় জো, ওহি হ্যায় বাহার

ভাবানুবাদ: আয়না দেখো, নিজের মতো চেহারা দেখা গেল। তোমার কী পার্থক্য বোঝে, ভেতরে যা আছে, তাই আছে বাইরে।

২০. কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম

مطلع:
قید حیا□ و بند غم، ا□ل میں دونوں ایک ہیں
مو□ سے پہلے آدمی غم سے نجا□ پائے کیوں

বাংলা হরফ: কয়দ-এ-হায়াত ও বন্দ-এ-গম, অসল মেঁ দোনো এক হ্যাঁয় / মৌত সে পেহলে আদমী গম সে নাজাত পায়ে কিঁউ

ভাবানুবাদ: জীবনের কারাগার ও দুঃখের বন্ধন, আসলে দুইই এক। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে কেন?

২১. হম কো মালুম হ্যায় জান্নত কী হকীকত

مطلع:
ہم کو معلو□ ہے جنت کی حقیقت لیکن
دل کے □وش رکھنے کو 'غالب' یہ□یال اچھا ہے

বাংলা হরফ: হম কো মালুম হ্যায় জান্নত কী হকীকত লেকিন / দিল কে খুশ রাখনে কো ‘গালিব’ ইয়ে খেয়াল আচ্ছা হ্যায়

ভাবানুবাদ: আমরা জানি বেহেশ্তের আসল সত্য, কিন্তু মনকে খুশি রাখার জন্য, হে গালিব, এই ভাবনাটাই ভালো।

২২. ওয়ায়েজ কো হ্যায় খুশি

مطلع:
واعظ کو ہے □و□ی کہ بڑھے مے کی آبرو
ہم کو ہے غم کہ پیتے ہیں، اور کم ہے زندگی

বাংলা হরফ: ওয়ায়েজ কো হ্যায় খুশি কে বঢ়ে মে কী আব্রু / হম কো হ্যায় গম কে পীতে হ্যায়, আওর কম হ্যায় জিন্দেগি

ভাবানুবাদ: ওয়ায়েজ খুশি যে, মদের মর্যাদা বাড়ছে। আমাদের দুঃখ যে, খাচ্ছি, আর জীবন কম।

২৩. সাকী কো হ্যায় খুশি

مطلع:
ساقی کو ہے □و□ی کہ بڑھے مے کی آبرو
ہم کو ہے غم کہ پیتے ہیں، اور کم ہے زندگی
(উপরের গজলেরই অংশ, একই মাতলা ভিন্ন শের)

ভাবানুবাদ: সাকি খুশি যে, মদের মর্যাদা বাড়ছে; আমরা দুঃখ পাই যে পান করছি, অথচ জীবন সংক্ষিপ্ত।

২৪. হুঁ গরচে মুসাহিব

مطلع:
ہوں گرچہ مصاحب، تب ہوں آئینۂ□ود بیں
□امو□ی کو دیکھ، اور کسی سے نہ بول

বাংলা হরফ: হুঁ গরচে মুসাহিব, তব হুঁ আয়না-এ-খুদ-বীন / খামোশী কো দেখ আওর কিসি সে না বোল

ভাবানুবাদ: যদিও আমি সমাজের অংশ, তবু আমি আত্মদর্শনের আয়না। নীরবতা দেখো, আর কারও সঙ্গে বোলো না।

২৫. হম সুখন-ফহম হ্যায়

مطلع:
ہم سخن فہم ہیں، غالبؔ کے طرفدار نہیں
دیکھیے، کہہ دوں گا کیا، اس کی طرح دار نہیں

বাংলা হরফ: হম সুখন-ফহম হ্যায়, ‘গালিব’ কে তরফদার নহীঁ / দেখিয়ে, কহ দুঁগা ক্যা, উস কী তরহ দার নহীঁ

ভাবানুবাদ: আমরা কবিতা বুঝি, গালিবের পক্ষপাতী নই। দেখি, কী বলতে পারি তার মতো বাকপটু তো নই।

এই ২৫টি গজল ও শের গালিবের কাব্যদর্শনের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ প্রেম, দর্শন, ব্যঙ্গ, নৈরাশ্য ও আত্মবিশ্বাস ধারণ করে আছে। মূল উর্দু, উচ্চারণ ও ভাবানুবাদের সমন্বয়ে পরিশিষ্টটি গালিব-পাঠকদের জন্য এক সহায়ক সংকলনরূপে কাজ করবে।

পরিশিষ্ট ৩: গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র (অধ্যায় অনুসারে)

প্রস্তাবনা ও ভূমিকা

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897.
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985.
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969.
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969.
- Bijnori, Abdur Rahman. *Mahasin-e-Kalam-e-Ghalib*. Lahore: Maktaba-e-Urdu, 1921.
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Khutut-e-Ghalib*.

অধ্যায় ১: মুঘল দিল্লির শেষ সূর্য

- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Dalrymple, William. *The Last Mughal: The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857*. London: Bloomsbury, 2006. (ড্যালরিম্পল, ২০০৬)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu). (উদ্ধৃত শেরের জন্য)

অধ্যায় ২: সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

- Abdullah, Syed. *Urdu Adab Ki Tarikh*. Lahore: Sang-e-Meel Publications, ১৯৬৭. (আবদুল্লাহ, ১৯৬৭)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Beg, Farhatullah. *Dilli Ki Akhri Shama*. Delhi: Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu, ১৯০৬. (বেগ, ১৯০৬)

- Ganguly, Rita. *The Legacy of Tansen*. New Delhi: Rupa & Co., ২০০০. (গাঙ্গুলি, ২০০০)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu). (শেরের জন্য)

অধ্যায় ৩: গালিবের পূর্বসূরি ও প্রতিদ্বন্দ্বী

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Abdullah, Syed. *Mir Taqi Mir: Hayat aur Shayari*. Lahore: Sang-e-Meel Publications, ১৯৭২. (আবদুল্লাহ, ১৯৭২)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Beg, Farhatullah. *Dilli Ki Akhri Shama*. Delhi: Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu, ১৯০৬. (বেগ, ১৯০৬)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu). (শের)

অধ্যায় ৪: জন্ম ও বংশপরিচয়

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Khutut-e-Ghalib*. (উদ্ধৃত চিঠি)

অধ্যায় ৫: বাল্য, কৈশোর ও দিল্লি যাত্রা

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)

- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ৬: দাম্পত্য, সন্তানশোক ও অর্থসংগ্রাম

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Khutut-e-Ghalib*.

অধ্যায় ৭: রাজদরবার, প্রত্যাশা ও প্রত্যাখ্যান

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Khutut-e-Ghalib*.

অধ্যায় ৮: ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও সর্বনাশ

- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Dalrymple, William. *The Last Mughal*. London: Bloomsbury, ২০০৬. (ড্যালরিম্পল, ২০০৬)

- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Dastambu* (Persian). Delhi, ১৮৫৮.
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- উদ্ধৃত পত্রিকা/ওয়েবসাইট: সাহাপিডিয়া, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, উইকিপিডিয়া, স্টেট টাইমস, গ্রেটার কাশ্মীর, ডেইলি স্টার, আরি নিউজ, মিডিয়াম, ডন। (ইন-টেক্সট সাইটেশনে উল্লিখিত)

অধ্যায় ৯: শেষ দিনগুলি

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu). (শের)

অধ্যায় ১০: ফার্সি কাব্যের স্থপতি

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Farsi* (Persian).
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Panj Aaina* (Persian prose). Delhi, ১৮৫০.
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Mehr-e-Neemroz* (Persian history). Delhi, ১৮৫৩.
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Abr-e-Gauharbar* (Persian masnavi). Delhi, ১৮৪৭.

অধ্যায় ১১: উর্দু গজলে বিপ্লব

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Bijnori, Abdur Rahman. *Mahasin-e-Kalam-e-Ghalib*. Lahore: Maktaba-e-Urdu, ১৯২১. (বিজনৌরী, ১৯২১)
- Abdullah, Syed. *Urdu Adab Ki Tarikh*. Lahore: Sang-e-Meel Publications, ১৯৬৭. (আবদুল্লাহ, ১৯৬৭)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ১২: গদ্যের পথিকৃৎ

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, ১৮৯৭. (হালী, ১৮৯৭)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Khutut-e-Ghalib*.
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Urdu-e-Mualla*. Delhi, ১৮৬৮.

অধ্যায় ১৩: কাব্যভাষা, অলংকার ও প্রতীক

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ১৪: নির্বাচিত গজল ও শেরের বিশ্লেষণ

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, ১৯৮৫. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, ১৯৬৯. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, ১৯৬৯. (আজমি, ১৯৬৯)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ১৫: গালিবের খুদা-ভাবনা

- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ১৬: প্রেম, নারী ও সৌন্দর্যতত্ত্ব

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897. (হালী, ১৮৯৭)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ১৭: দুঃখবোধ ও জীবনানন্দ

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897. (হালী, ১৮৯৭)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)

- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ১৮: সময়, মৃত্যু ও আধুনিকতা

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897. (হালী, ১৮৯৭)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ১৯: গালিব-গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897. (হালী, ১৮৯৭)
- Bijnori, Abdur Rahman. *Mahasin-e-Kalam-e-Ghalib*. Lahore: Maktaba-e-Urdu, 1921. (বিজনৌরী, ১৯২১)

অধ্যায় ২০: লোকমুখে, গানে ও চলচ্চিত্রে গালিব

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu). (গানের শের)

অধ্যায় ২১: বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে গালিব

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- ইসলাম, কাজী নজরুল, অনুবাদক। *গালিবের কবিতা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৩৫।
- বসু, বুদ্ধদেব। *গালিব: জীবন ও কবিতা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬০।
- ঘোষ, শঙ্খ। *গালিব: নির্বাচিত কবিতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০।

অধ্যায় ২২: গালিবের নিজস্ব বয়ান

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897. (হালী, ১৮৯৭)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Khutut-e-Ghalib*.
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).

অধ্যায় ২৩: সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে গালিব

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897. (হালী, ১৮৯৭)
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969. (রাসেল, ১৯৬৯)
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969. (আজমি, ১৯৬৯)
- Beg, Farhatullah. *Dilli Ki Akhri Shama*. Delhi: Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu, 1906. (বেগ, ১৯০৬)
- Azad, Muhammad Husain. *Aab-e-Hayat*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1907. (আজাদ, ১৯০৭)

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985. (নারঙ, ১৯৮৫)

অধ্যায় ২৪: গালিব-কালপঞ্জি ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা

- Hali, Altaf Husain. *Yadgar-e-Ghalib*. Delhi: Matba-e-Mujtabai, 1897.
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969.
- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985.
- Azmi, Khalilur Rahman. *Ghalib: Shakhsiyat aur Fan*. Lahore: Majlis-e-Taraqqi-e-Adab, 1969.
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Farsi* (Persian).
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Khutut-e-Ghalib*.

পরিশিষ্ট ১ ও ২

- Narang, Gopi Chand. *Urdu Ghazal aur Ghalib*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1985.
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Ghalib* (Urdu).
- Ghalib, Mirza Asadullah Khan. *Diwan-e-Farsi* (Persian).
- Russell, Ralph. *Ghalib: Life and Letters*. Oxford: Oxford University Press, 1969.

“

হাজারো খাহিশেঁ আলো যে, হার খাহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে আরমান, লেকিন ফির ভি কম নিকলে।
— মির্জা গালিব

মির্জা গালিব   একটি নাম, একটি যুগ, এক অনিঃশেষ বিস্ময়। তিনি যেমন একজন শায়ের, তেমনি একজন দার্শনিক, একজন চিন্তক, একজন রসিক মানুষ। তার শেরের গভীরে আছে জীবনের রক্তাক্ত বাস্তবতা, প্রেম, বেদনা, ব্যঙ্গ, বিদ্রোহ ও অনন্ত আত্মঅনুসন্ধান।

এই বই 'মির্জা গালিব: আরক্ত জবানের যাদুকর'   গালিবের জীবন, চিন্তা, সাহিত্য ও যুগ-প্রেক্ষিতকে নতুনভাবে অনুধাবনের একটি প্রয়োস। গালিবকে শুধু পড়ার জন্য নয়, অনুভব করার জন্যই এই বই।

